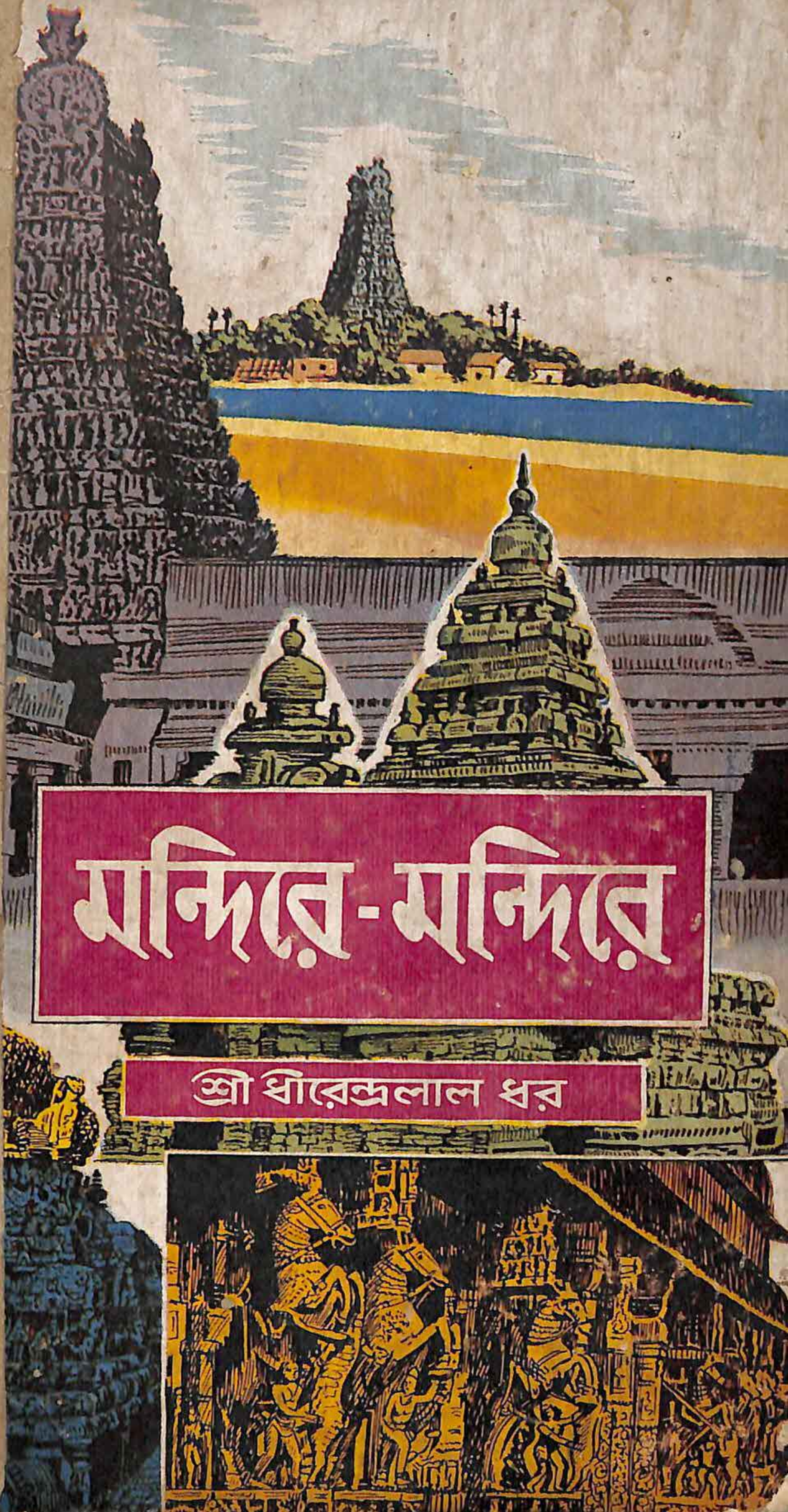
মন্দিরে-মন্দিরে

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর





মন্দিরে মন্দিরে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ
শিল্পী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম সংস্করণ ঃ
জুলাই, ১৯৫৭
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

ছেপেছেন ঃ
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস
১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

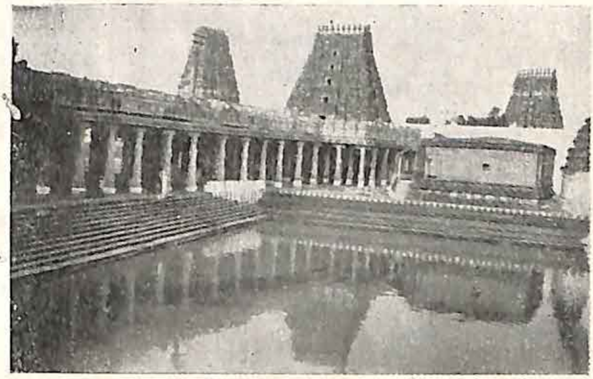
মূল্য ঃ ছয় টাকা মাত্র

ভ্রমণ স্থচী ঃ

আমাদের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের দুটি পর্ব। প্রথমবার ১৯৫৬ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯৬০ সালে। প্রতিবারেই জানুয়ারী মাসে, তিন চার সপ্তাহ। ভ্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। মানুষের সুখ-দুঃখের পরিচয় অল্প সময়ে হয় না, আমাদেরও হয়নি। এই কাহিনীর উদ্দেশ্যও ইতিহাস ও পৌরাণিক তথ্যের সঙ্গে স্থান-মাহাত্ম্যের পরিচয় দেওয়া, দর্শকদের কাছে কিছুটা 'গাইডে'র কাজ করা। সেজন্য ঘরোয়া কাহিনীর অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা বর্জন করেছি।—ভ্রমণ কাহিনী তো গল্প-উপন্যাস নয়।

কাহিনীটি দৈনিক 'জনসেবক' ও ছোটদের মাসিকপত্র 'রামধনুতে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ ছবিই রামধনু পত্রিকার সৌজন্যে ছাপা হলো, কয়েকখানি ক্যালকাটা কেমিক্যাল্‌স্-এরও আছে। ফটোগুলি তুলেছেন শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীঅমূল্যকুমার ঘোষ, শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়। মুনিঋষি ও দেবদেবীর উপাখ্যানগুলি শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, লিঙ্গ-পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি থেকে গৃহীত। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভক্তমাল থেকেও সাহায্য নিয়েছি। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের পরিচয়-পুস্তিকা ও ভারত-ইতিহাসও উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে সেজন্য উপাখ্যানগুলি সংক্ষেপ করেছি, কবিতা যা কিছু উদ্ধৃত করেছি সবই রবীন্দ্রনাথের। প্রথম সংস্করণে অল্পদিনেই বইখানি যে সমাদর পায়, তাতেই এই পরিবর্ধিত ও শোভনতর সংস্করণ করতে ভরসা পেলাম। সাময়িক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধে পূর্বকাহিনীর সঙ্গে মহীশূর-রাজ্যের ভ্রমণ-কথা যুক্ত হলো। সে-কাহিনীও পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জন করতে পারবে—এ আশা রাখি। ইতি—

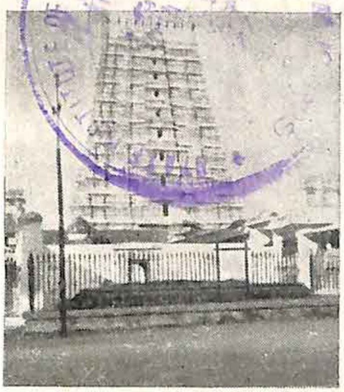
শ্রীধীরেন্দ্র [illegible] ধর



বিষ্ণুকাঞ্চী মন্দিরের অভ্যন্তর



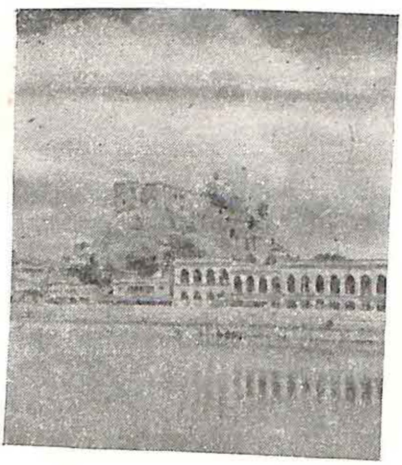
শিবকাঞ্চী মন্দিরের গোপুরম্



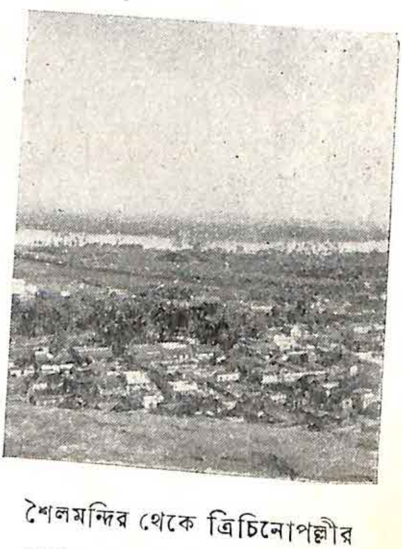
রামেশ্বর মন্দিরের গোপুরম্



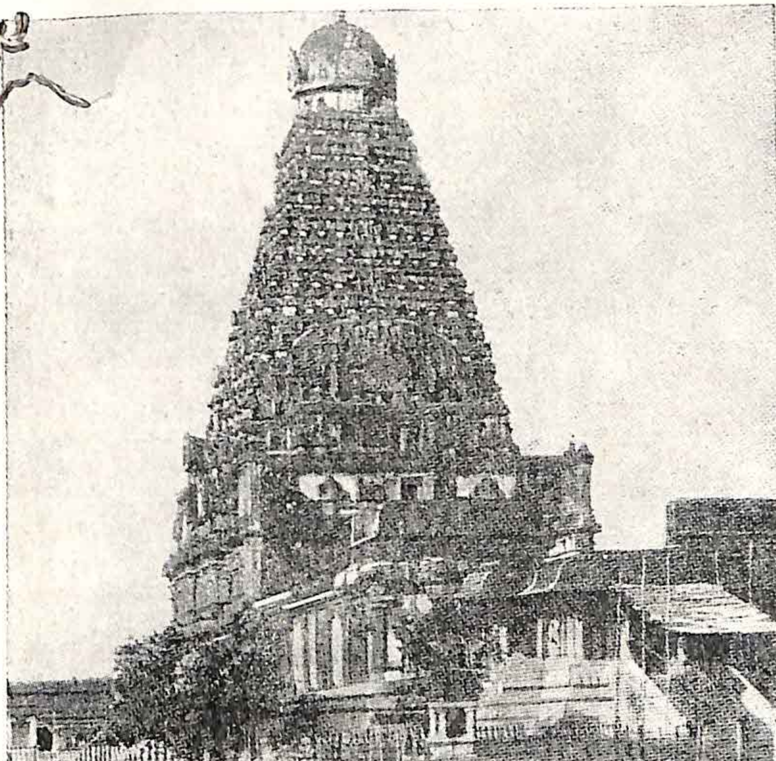
পক্ষীতীর্থে পাখীকে ভোগ দেওয়া হচ্ছে



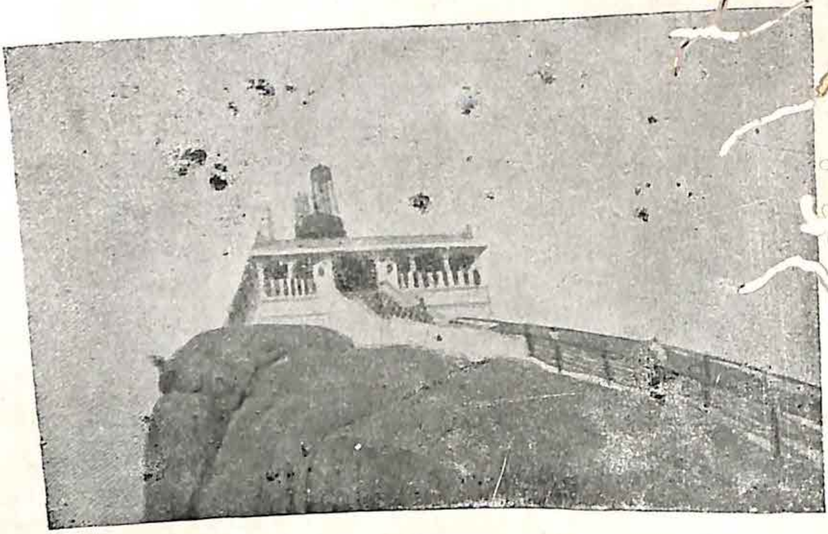
ত্রিচিনোপল্লীর শৈলমন্দির
সামনের পাহাড়টির সবটাই মন্দির



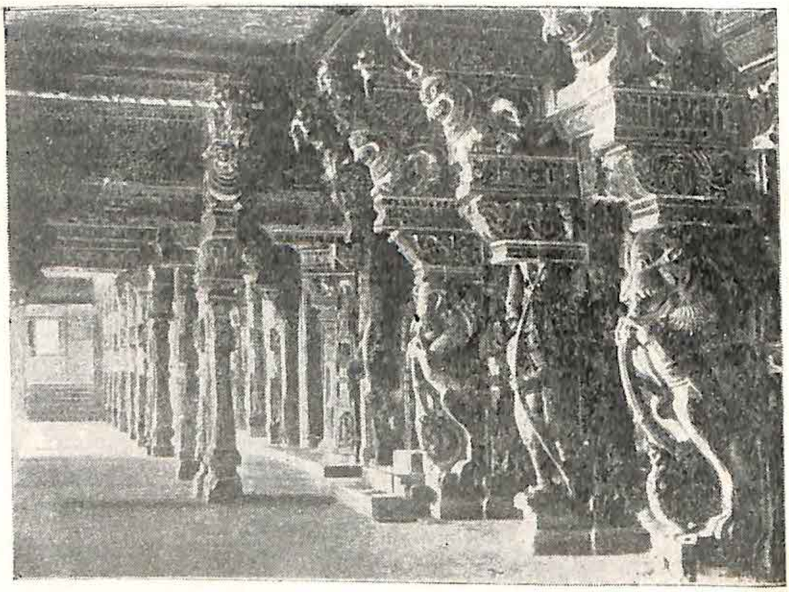
শৈলমন্দির থেকে ত্রিচিনোপল্লীর
একাংশের দৃশ্য, দূরে কাবেরী নদীর



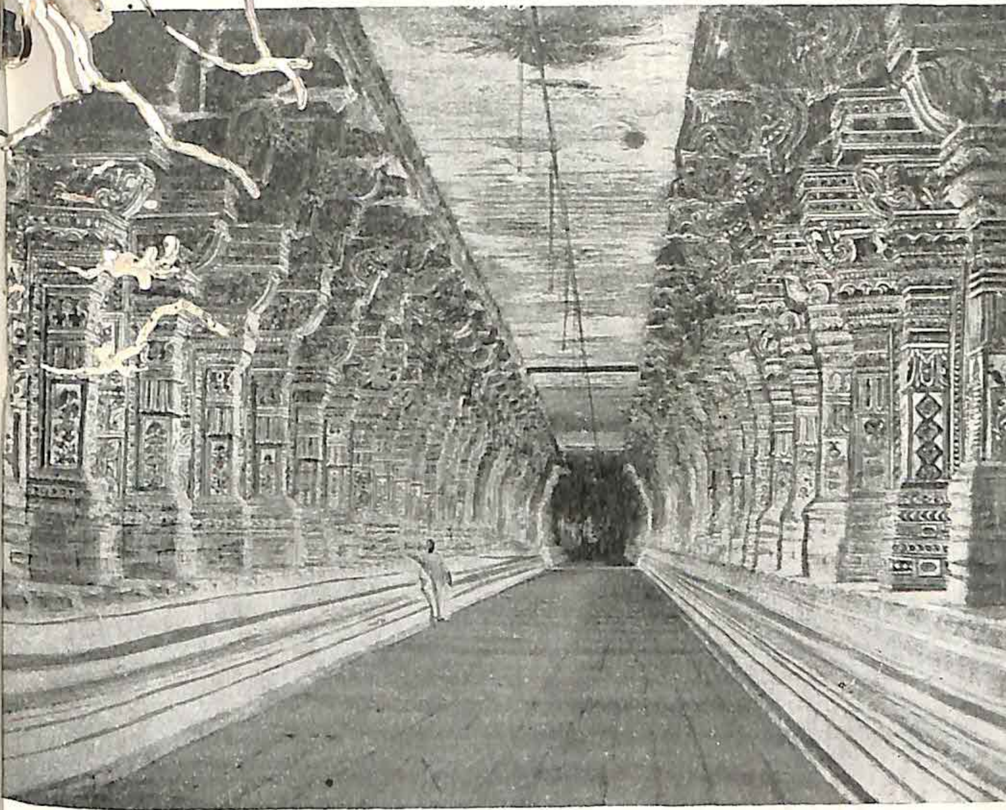
বৃহদীশ্বরের মন্দির—তাঞ্জোর



শৈলমন্দিরের শীর্ষে গণেশ-মন্দির



মীনাক্ষী মন্দিরের বারান্দা



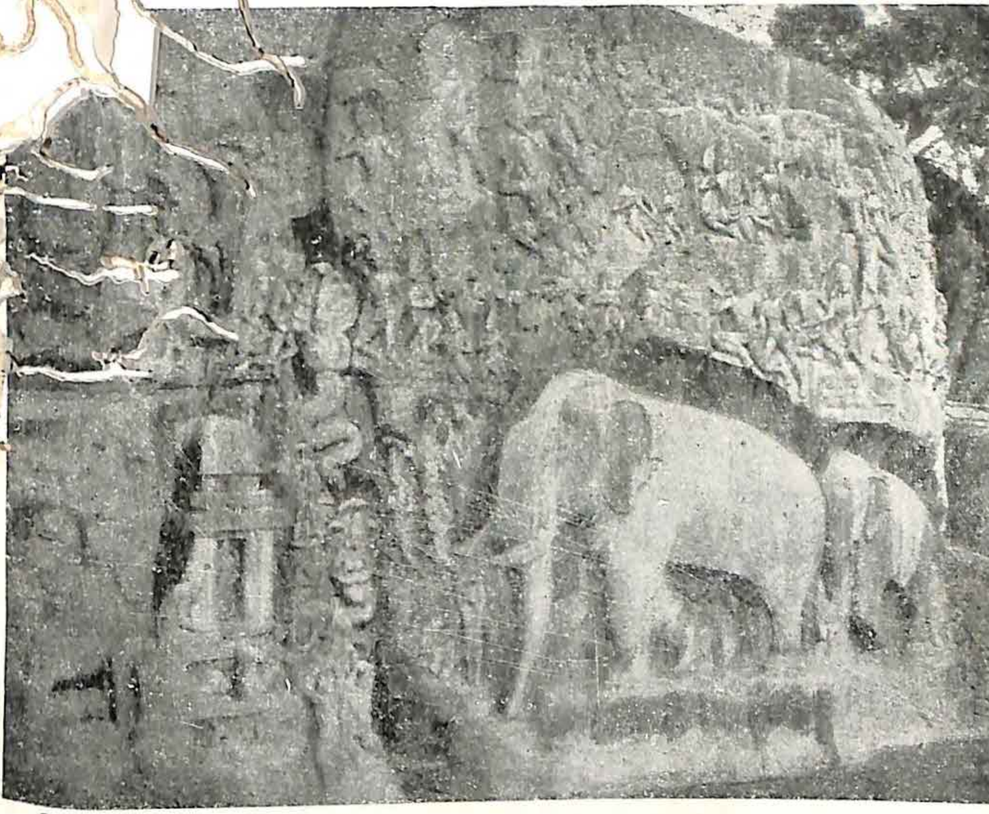
রামেশ্বরমের মন্দিরের সহস্র স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ



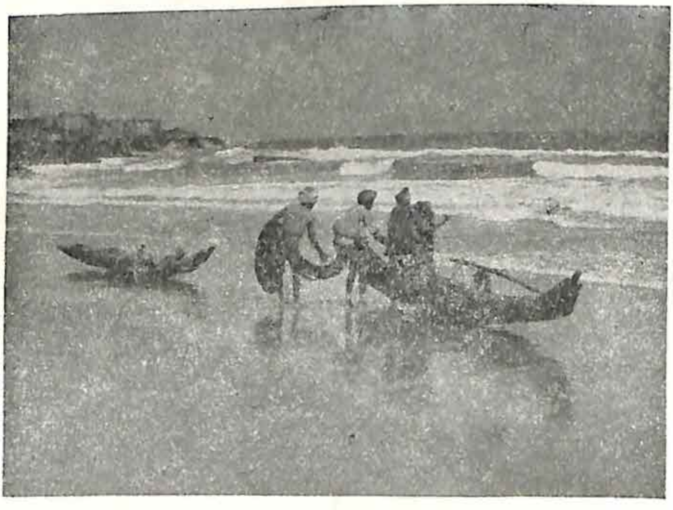
দেশের শেষ—কন্যা কুমারী



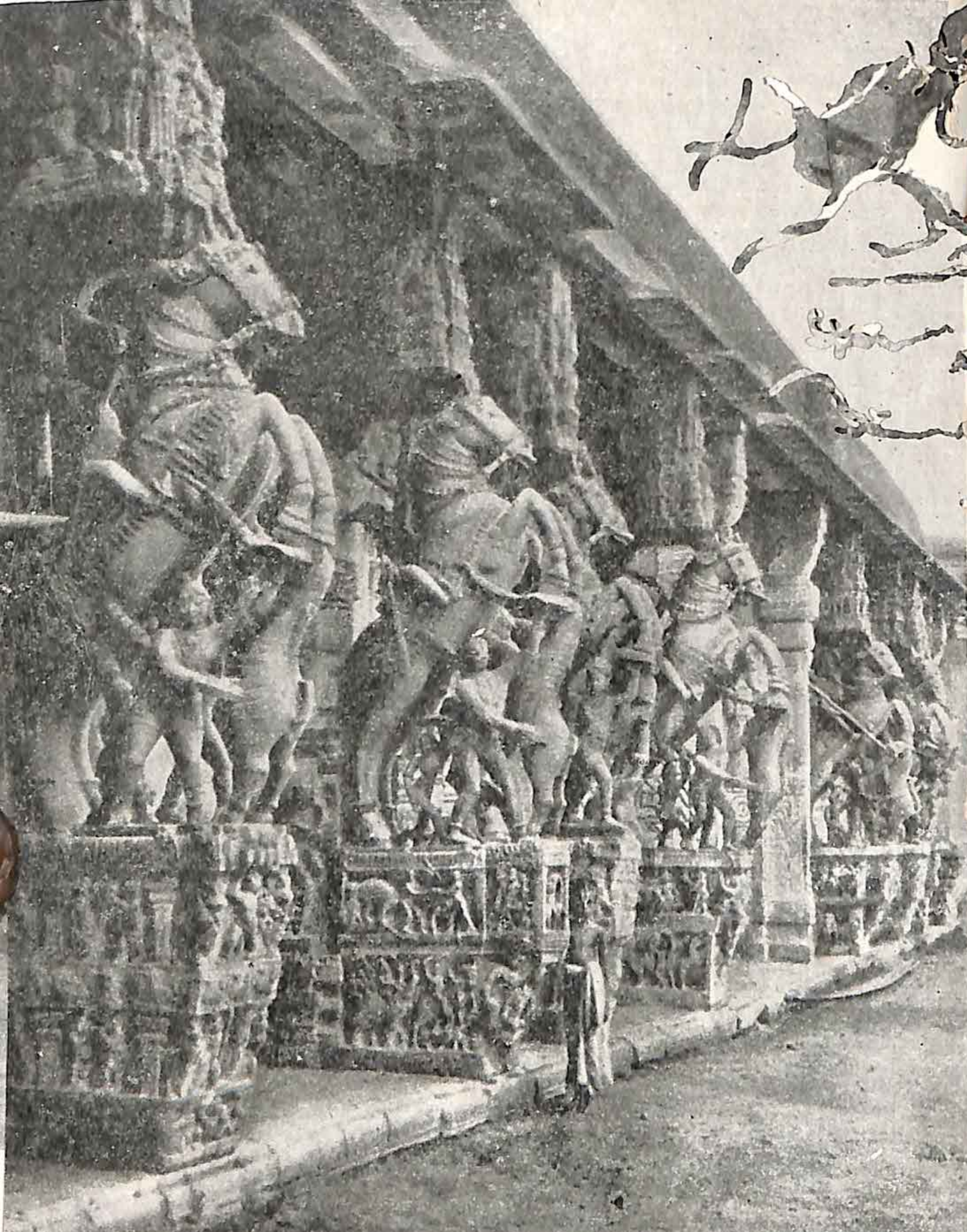
মাদুরার মন্দিরে



মহাবলীপুরমে পাহাড়ের গায় অর্জুনের তপস্থার চিত্র



সমুদ্র সৈকত—মাদ্রাজ



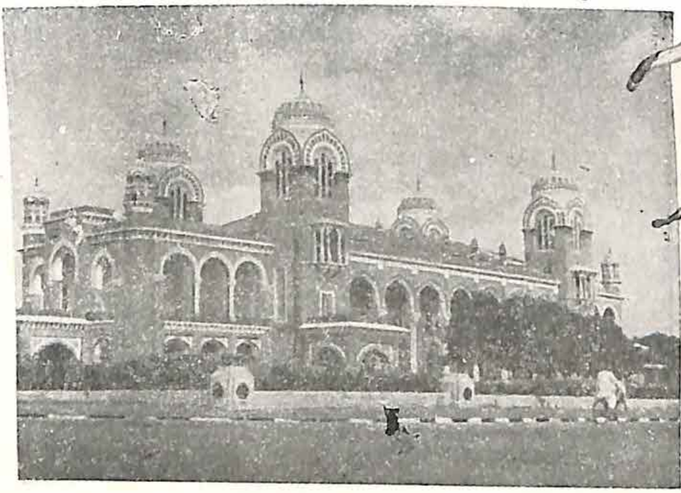
● শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের সহস্র স্ত



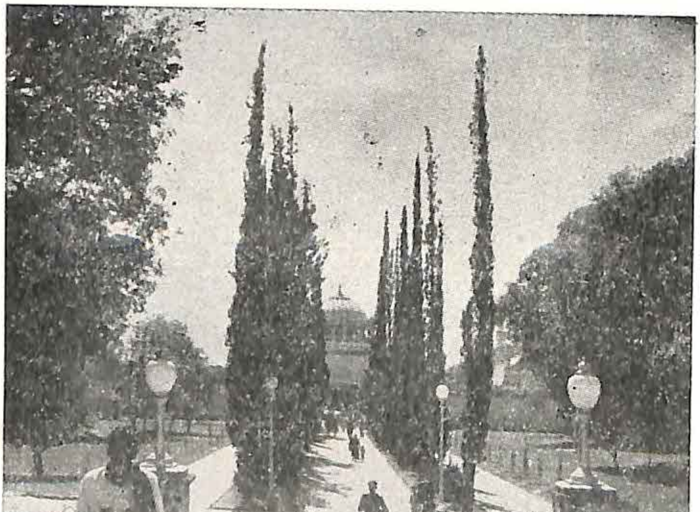
বৃন্দাবন উদ্যানের আলোক-উজ্জ্বল ফোয়ারা—মহীশূর



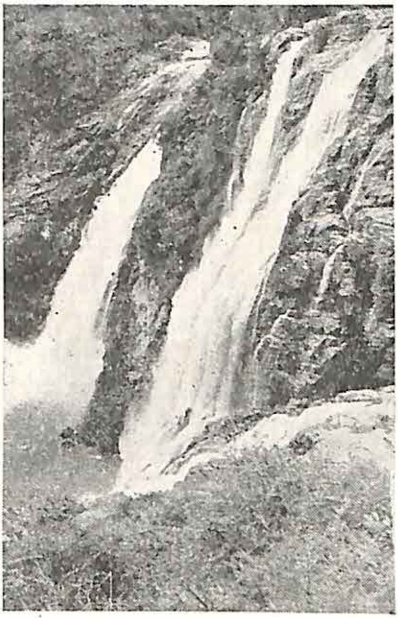
ললিতামহল—মহীশূর



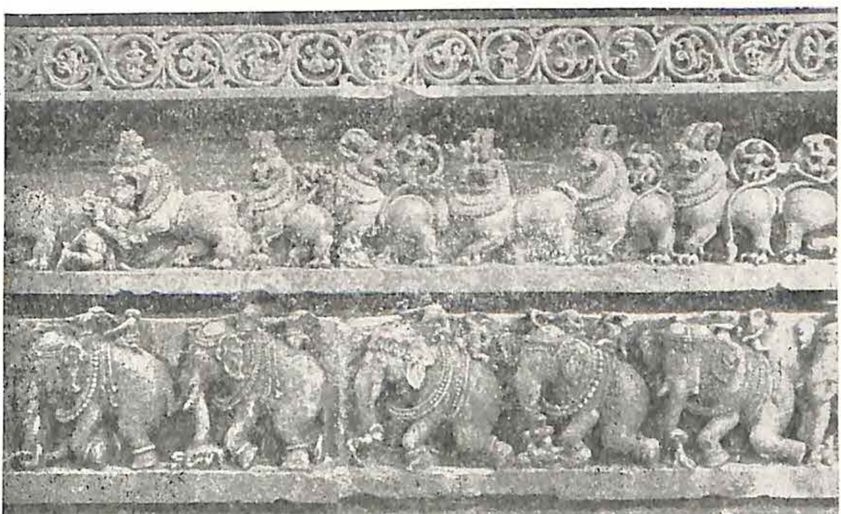
বিশ্ববিদ্যালয়—মাদ্রাজ



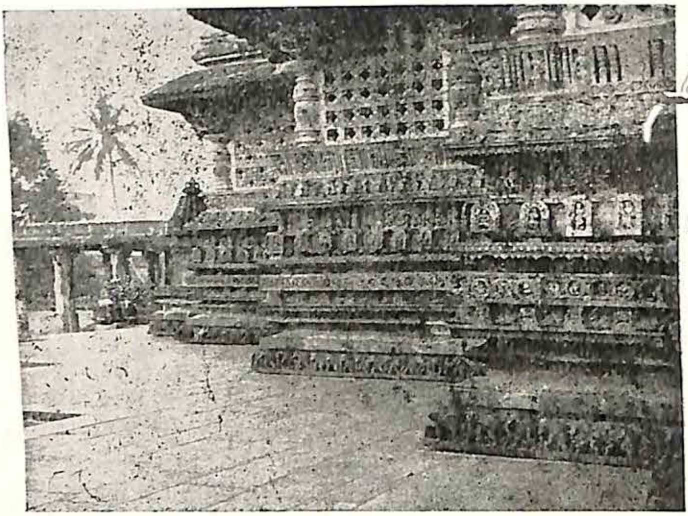
টিপুর সমাধি—শ্রীরঙ্গপত্তনম্



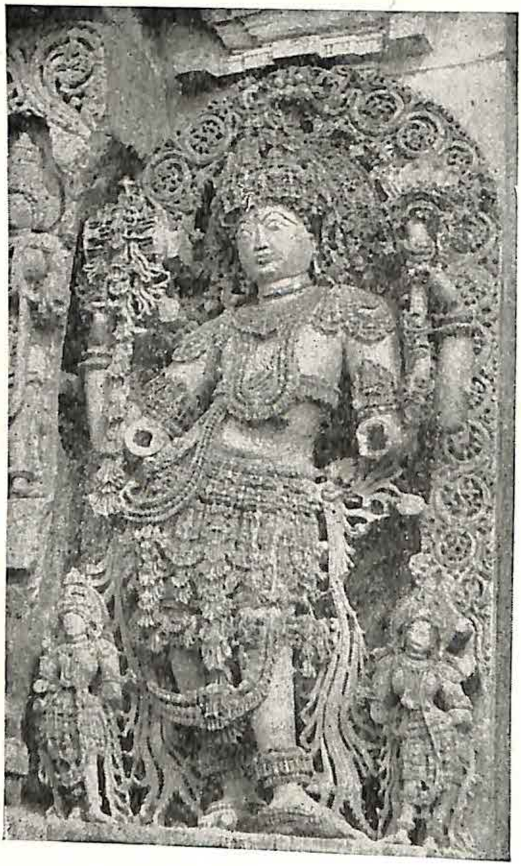
কাবেরী প্রপাত—শিবসমুদ্রম্



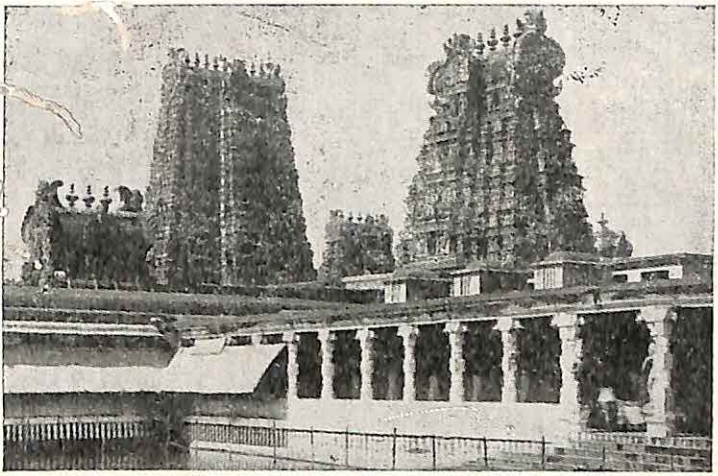
হোয়সালেশ্বর মন্দিরের দেয়াল—হালিবিদ



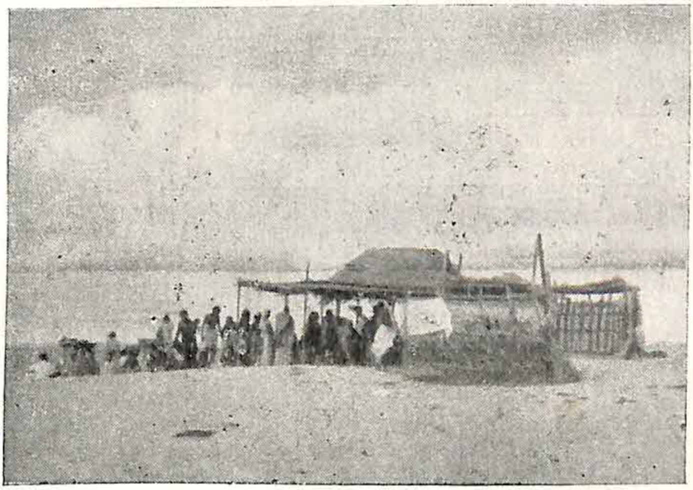
বেলুড় মন্দিরের
এক অংশ



বেলুড় মন্দিরের একটি মূর্তি



মীনাক্ষী মন্দির মধুরা



ধনুষ্কোটির তর্পণ ঘাট



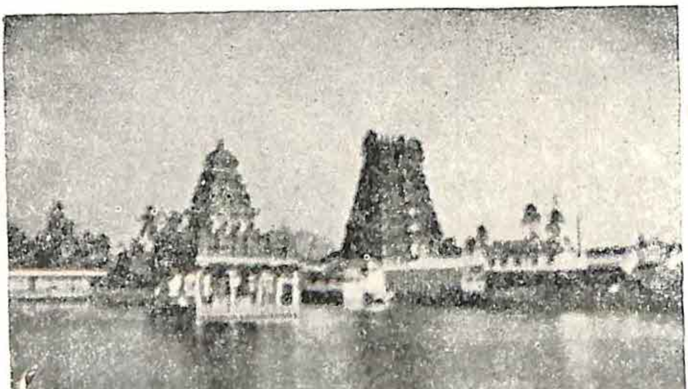
ভারত মহাসাগর—বিবেকানন্দ শৈল



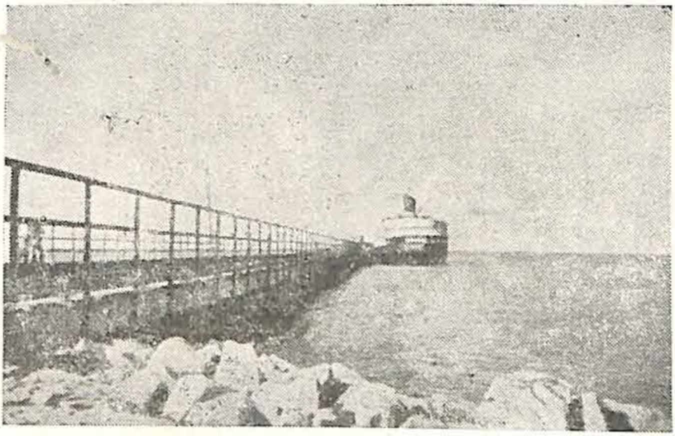
কন্যাকুমারী প্রতিমা



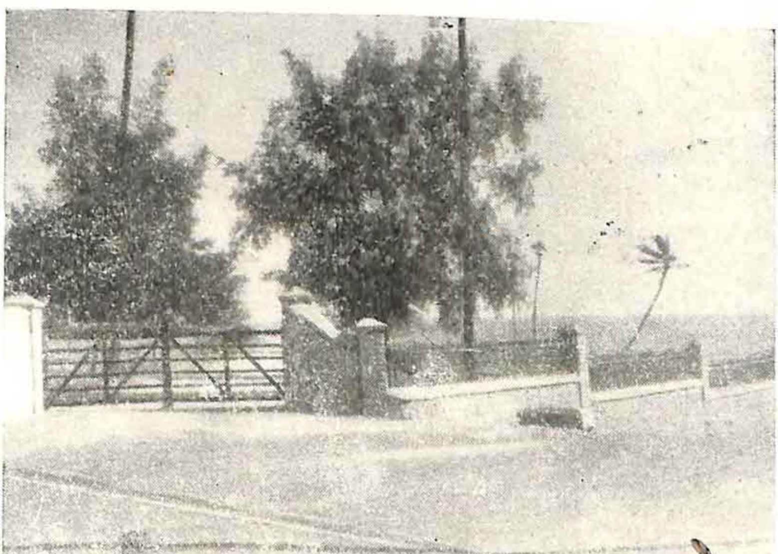
রামেশ্বরের পথে
মেয়েদের
আল্‌পনা আঁকা



শুচীন্দ্রমের মন্দির



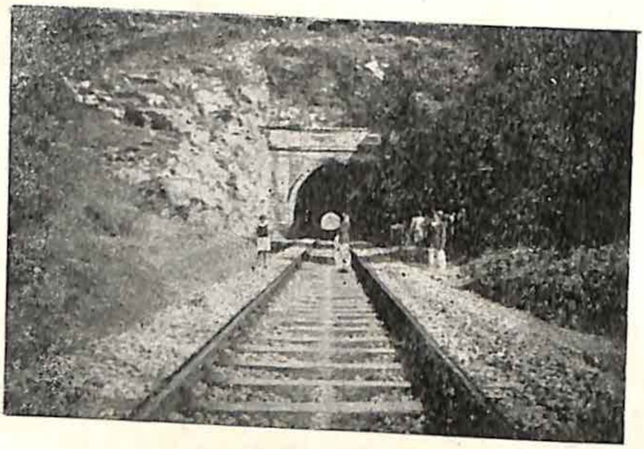
ধনুষ্কোটির জাহাজঘাট



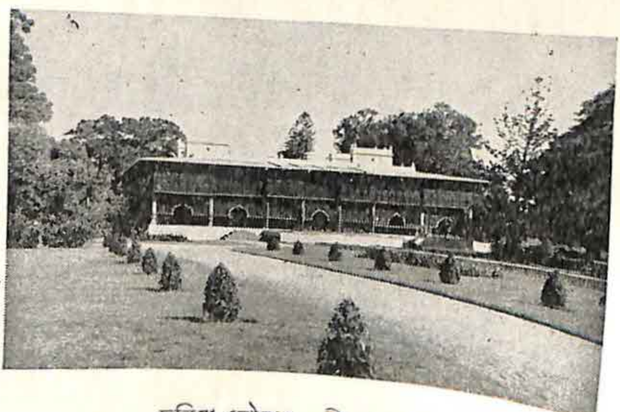
রাজপথের শেষ—কন্যাকুমারী



লালবাগ উদ্যান—বাঙালুর



বৃন্দাবন উদ্যান—মহীশূর



দরিয়া দৌলত—শ্রীরঙ্গপত্তনম্



মন্দিরে মন্দিরে

গাড়ী ছাড়লো। আমাদের কম্পার্টমেণ্টের গায়ে সাদা কাপড়ের উপর লেখাটা বাতাসের ধাক্কায় পত্‌পত্‌ করে কাঁপতে লাগলো ঃ

'প্রতিনিধি, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, মাদ্রাজ।'

নামী ও অনামী আশীজন সাহিত্য-রসিককে নিয়ে তিনখানি রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্ট ছুটলো মাদ্রাজের দিকে।

দক্ষিণভারত ঘুরে আসার আকাঙ্ক্ষা অনেক দিনের। গৈরিক পথের ধুলো মনকে বার বার তাগিদ দিয়েছে, বলেছে—মামনুসরঃ! কিন্তু সে ডাকে সাড়া দিতে পারিনি,—যখন সঙ্গী মিলেছে তখন সুযোগ মেলেনি, যখন সুযোগ পেয়েছি তখন সঙ্গী পাইনি। দিন বয়ে গেছে।

এতদিনে সে প্রতীক্ষা সার্থক হলো। ট্রেণ চলার সঙ্গে সঙ্গে একান্ত কাছের একান্ত করণীয় যা-কিছু ছিল সব দূরে সরে গেল। প্রাত্যহিক কর্মব্যস্ততা হারিয়ে গেল একান্ত অবসরের মধ্যে। ট্রেণের চাকাগুলি দুর্বার বেগে টেনে নিয়ে চলেছে অদৃশ্য ভবিষ্যতের পানে,—অযাচিত কাছে চলে আসছে, জানা-চেনা সরে যাচ্ছে দূরে।

জানালার ধারে বসে আছি। শীতের বেলা ক্রমে ধূসর হয়ে আসছে। আকাশের কোল থেকে নেমে আসছে মাঠ। রেলপথের পাশে একটানা একটা জলের রেখা, মাঠের কিনারায় কাপড়ের

পাড়ের মত রোদ পড়ে টল-মল করছে। কোথাও বা একটা পানা-ভরা পুকুর, কয়েকখানি খড়ের ঘর, দু'একটা সাধারণ মানুষ, দু-চারটে অতি সাধারণ ছেলে-মেয়ে। মানুষের দারিদ্র্য যে এমনভাবে মাটির গায়েও জড়িয়ে থাকে, তা চলন্ত ট্রেণের জানালার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে না থাকলে বোধ হয় এমনভাবে বোঝা যায় না। চুপ করে তাকিয়ে থাকি—

"মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন, শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।"

শীতের সন্ধ্যা। আকাশ থেকে ফিকা নালাভা পূব দিক থেকে গড়িয়ে আসে পশ্চিমে। দূরের ছবি ফিকা হয়ে অন্ধকারের পর্দায় ঢাকা পড়ে, মাথার উপর নীলাম্বরীতে চিক্‌মিক্ করে ওঠে তারার সল্‌মা চুম্‌কি।

আমাদের কামরাটি ছোট। একদিকে দুটি বেঞ্চি ও দুটি বাঙ্ক আমরা দখল করেছি, আর আমাদের পাশের দু'খানি বেঞ্চি দখল করেছেন এক বৃদ্ধ ও তাঁর সঙ্গের দুটি মহিলা। স্থানের তুলনায় আমাদের দলটি ভারীই বলতে হয়। আমরা আছি ছ'জন। পাঁচজনের স্থান হয়তো-বা কোন রকমে হতে পারে, কিন্তু ছ'জন অসম্ভব। তার উপর আবার পাশাপাশি কামরা থেকে মাঝে মাঝে দু'একজন ছিটকে আসছে আড্ডা জমাতে। কাজেই হাত-পা ছড়িয়ে সাচ্ছন্দ্যে বসবার পরিসর পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝপথে পাশের দু'খানি কামরা দেখে এলাম। সে দু'খানিও রিজার্ভ, কিন্তু সে দু'খানিতে ভীড় আমাদের চেয়ে কম নয়।

শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন আমাদের কর্তা, প্রতিনিধিদের হাওড়া থেকে মাদ্রাজ অবধি নিয়ে যাবার তত্ত্বাবধায়ক। এক পাশে

বসে তিনি কীর্তনের সুর ভাঁজছিলেন, বললাম—দাদা জায়গায় তো কুলুচ্ছে না।

তিনি বললেন—সত্তর জনের জন্য স্থান আছে, কিন্তু প্রতিনিধি এসেছে তার চেয়ে অনেক বেশী কুলুবে কি করে ?

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কোন দিনই ট্রেণে স্থান সঙ্কুলান হয় না, যদিও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াই রেল-কোম্পানির সব চেয়ে বড় আয়, তবু 'যারা কম ভাড়া দেবে তার বেশী সুবিধা চাইবে কেন'—এই নীতির উপরেই রেল-কোম্পানি চলে। কাজেই—

নিজের কামরায় ফিরে এলাম। আসর জমে উঠেছে। দু'জন সম্পাদক, দু'জন রিপোর্টার, দু'জন লেখক, আর তাঁদের সঙ্গে এসে জুটেছেন শিল্পী রেবতীভূষণ। রেবতীভূষণ ছবি আঁকছেন না, গান গাইছেন আর দু'জন তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন, আর বাকী ক'জন সিগারেটের আর চুরুটের ধোঁয়ায় কামরাখানি অন্ধকার করে ফেলেছেন। একটা অনাগত আনন্দ স্পর্শ দিয়েছে সবাইকার মনে। খাঁচার শিকল কেটে পাখী উড়েছে আকাশে।

সংগীতের আসর থামলো ঘণ্টা দুয়েক পরে। ট্রেণের দোলায় ঘুমের আমেজ এসেছে সবাইকার চোখে, যে যেখানে যেটুকু স্থান পেলে বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। কথা উঠলো—রাতে চিল্‌কার ধার দিয়ে গাড়ী যাবে, চিল্‌কা দেখবো! যার ঘুম ভাঙবে সে-ই যেন আর সবাইকে জাগিয়ে দেয়।

কিন্তু শেষরাতে আমাদের ঘুম যখন ভাঙলো, ট্রেণ তখন চিল্‌কার সীমা পার হয়ে গেছে। সকাল বেলা পাশের কামরা থেকে একজন বললো—আপনারা দেখতে পেলেন না, কৃষ্ণপক্ষের ম্লান চাঁদের আলোয় মনে হলো, জল তো নয়, কে যেন একখানি রূপালী মখমল বিছিয়ে দিয়েছে।

প্রভাতী আলোর ঢেউ এসে লাগলো ট্রেণের গায়। দু'পাশে দেখা দিল তাল ও নারিকেল গাছের বন। আর মাঝে মাঝে

ধান ক্ষেত। সবুজ আর হলুদের মেশামেশি। মাঠের শেষে বাঁয়ে ও দক্ষিণে পূর্বঘাট পর্বতমালার সীমাহীন প্রাচীর। সেই পাহাড়ের মাথাতেও তালগাছের সারি, দূর থেকে মনে হয় যেন একদল ঘোড়-সওয়ার ছুটে চলেছে দুর্গ-প্রাকারের উপর দিয়ে।

ক্ষেত মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়, দেখা দেয় সুবিশাল জলাশয়। আর তার কূলে কূলে জলচর পাখীর দল।

ইতিমধ্যে পৌষের শীত বিদায় নিয়েছে, গায়ে গরম জামা আর রাখা যায় না, একটা রাতের মধ্যে আমরা যেন দু'টি মাস পার হয়ে এসেছি।

ওয়ালটেয়ার—

পূর্ণবাবু সদলবলে দেখা দিলেন জানালার সামনে, বললেন—অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়াবে, স্নান কর, ভাত খাও।

আমাদের কামরা থেকে তখনই কয়েকজন সাবান-গামছা নিয়ে নেমে গেলেন। খগেনবাবু খবর দিয়ে এলেন 'বল্লভদাস'কে।

ইতিমধ্যে গাড়ীর পাশে সাড়া পড়ে গেল—ইট্‌লি, ধোসা, বোড্ডা, উপ্‌মা, মিক্‌শচার, কফি, কমলা, মুসম্‌বি, কলা, কাজুবাদাম্ চীনাবাদাম!

বড় স্টেশন, লোকের ভীড়। আমরা ভীড় বাঁচিয়ে বসে আছি, রিজার্ভ কামরার যাত্রী। দশ হাত কাপড়ের পরিচয়-পত্র ঝুলিয়ে আমরা আশীজন জনতার মাঝে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছি।

ভাত এলো। ভাতের পিছু পিছু এলো একদল ম্লানমুখ, জীর্ণবাস, শীর্ণদেহ শিশু, কিশোর ও প্রৌঢ়। রিক্ত হাত দু'খানি সামনে ধরে জানালার বাইরে থেকে তারা সাড়া তুললো—উচ্ছিষ্ট অন্নম্!

করুণ দুটি চোখ, শীর্ণ দু'খানি হাত, আর্ত একটা ধ্বনি। ওই ধ্বনি, ওই চাউনি আরো অনেক দেখেছি, হরিদ্বার থেকে

চন্দ্রনাথ অবধি। ওদের আলাদা জাত নেই, পৃথক সমাজ নেই, ক্ষুধার জ্বালা ওদের একাকার করে দিয়েছে আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত। ওরাই বোধ হয় ভারতমাতার অকৃত্রিম সন্তান। দেশ বদলায়, বেশভূষা বদলায়, ভাষা বদলায়, রাজ্য বদলায়, নীতি বদলায়, কিন্তু এরা শাশ্বত এদের অবস্থা বদলায় না। দেশের মাটির সঙ্গে এরা অবিচ্ছিন্ন।

কারও মুখে আর ভাত রুচে না, কিছু কিছু খেয়ে শালপাতা শুদ্ধ তুলে দেয় ওদের হাতে। কিন্তু আমরা আর ক'জন !

গাড়ী আবার চলতে সুরু করে।—

"ধরণী সমুখপানে চলে গেছে কোন্‌খানে,
পরাণ কেন কে জানে উদাসে।
ভাল নাহি লাগে আর আসা যাওয়া বারবার
বহুদূর দূরাশার প্রবাসে।
পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে॥"

পূরোপরি দাক্ষিণাত্য সুরু হলো এবার। মাটির রং বদলে গেছে, বদলে গেছে মানুষের বেশভূষার ধরণ। ভাষা বদলেছে অনেক আগেই। পুরুষের পরণে সাদা লুঙ্গী, গায়ে গেঞ্জি বা সার্ট, কারও অতিরিক্ত আছে ভাঁজ-করা উত্তরীয় ও কপালে চন্দন। আর মেয়েদের লাল নীল সবুজ শাড়ী, নাকের হু'দিকে নাকছবি, মাথায় দীর্ঘ বেণী, বেণীর গোড়ায় চন্দ্রমল্লিকার গুচ্ছ। কারও কারও কানে আছে প্রকাণ্ড নিরেট এক মাকড়ি, মাকড়ির ভারে কানের নীচটা ঝুলে পড়েছে হু'গাছি দড়ির মতো, মনে হয় এখনই বুঝি ছিঁড়ে মাকড়ি পড়ে যাবে।

স্টেশনে স্টেশনে দেখা দিয়েছে রঙীন চন্দ্রমল্লিকা ও রক্ত গোলাপের পসরা।

স্টেশন পার হলেই দেখা যায় বড় বড় চাকাওলা ছোট ছোট গরুর গাড়ী। গরুর শিংগুলি আবার পিতলের আংটা দিয়ে বাঁধানো।

'তমাল-তালি-বনরাজিনীলা' এমন ভাবে আর কোথাও চোখে পড়ে না।

আর তারই সঙ্গে বিশাল বিস্তীর্ণ জলরাশি, আর হাঁসের মেলা।

একটানা পাহাড়। কখনো ট্রেনখানির কাছে এগিয়ে আসে, কখনো-বা ঠেলে সরিয়ে দেয় দূরে।

এদিকে সাহিত্য নিয়ে জোরালো আলোচনা সুরু হয়েছে।

একজন বললেন—মাদ্রাজে চলেছি আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি হয়ে, কিন্তু সাহিত্যিক আমাদের মধ্যে আছেন ক'জন ?

আর-একজন মন্তব্য করলেন—সেখানেও গিয়ে দেখবেন, সবই এই রকম। সবাই নিজের অর্থগরিমা ও বেশভূষা দেখাতেই ব্যস্ত।

অপর দিকের দু'জন মহিলা সহযাত্রীর একজন সহসা মুখ ফিরিয়ে বললেন—এই যদি আপনার মনে হয়, তাহলে পয়সা খরচ করে কলকাতা থেকে এক হাজার বত্রিশ মাইল ছুটে চললেন কেন ? না এলেই ত হতো।

অপরিচিতা মহিলার কথার ঝাঁজে সবাই চুপ হয়ে গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকার মানুষ রেবতীভূষণ নয়। গুণ গুণ করে রবীন্দ্র সংগীতের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কোন এক সময় সে গলা তুললো।

গোদাবরী ও কৃষ্ণা।

গোদাবরীর সেতু যখন পার হলাম তখন বেলা পড়ে এসেছে। শোন্ নদীর পর এই গোদাবরীর পুল। ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘ সেতু।

প্রায় একশো মাইল দীর্ঘ নদী এই গোদাবরী। পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত। নাসিক জেলার এ্যাম্বক গ্রামের পিছনে এক পাহাড় থেকে এর উৎপত্তি। যত বড় পুল, জলের সে বিস্তার নেই। আছে শুধু বালি আর বালি।

গোদাবরীর আরেক নাম গোতমী গঙ্গা।

হাজার হাজার বছর আগের কথা। দেশে অনাবৃষ্টি চলছে বছরের পর বছর। যে দেশে বছরে দু'বার বর্ষা নামে, সে দেশে বারো বছর বৃষ্টি নেই। চারিপাশ শুক্‌নো খা খা করছে। দেশ মরুভূমি হয়ে গেল।

দেশ জুড়ে হাহাকার পড়ে গেছে।

গৌতম মুনির আশ্রমে কিন্তু খাদ্যাভাব নেই। যোগবলে তিনি শস্য উৎপাদন করেন। অনাহার-ক্লিষ্ট একদল ঋষি এসে উঠলেন গৌতমের আশ্রমে। গৌতম তখনই তাঁদের আশ্রয় দিলেন। তাঁদের আর অন্নাভাব রইল না। খেয়ে-দেয়ে সুখেই তাঁদের দিন কাটতে লাগলো।

গণেশ একদিন এলেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে, বললেন—এ কি! আপনারা ঋষি হয়ে অপরের গলগ্রহ হয়ে আছেন? নিজ নিজ তপোবনে ফিরে যান।

ঋষিরা বললেন—ফিরে যাব কোথায়? সর্বত্র অনাবৃষ্টি, শস্য হয় না, খাব কি?

গণেশ বললেন—আপনারা দিব্যি আরামে আছেন তাই কোন খবর রাখেন না। খাদ্যের অভাব কোথাও নেই, পৃথিবী এখন শস্যে পরিপূর্ণ।

ঋষিরা গৌতমের কাছে গেলেন, বললেন—আমাদের এবার বিদায় দিন, পৃথিবীতে আর অন্ন-কষ্ট নেই।

গৌতম বললেন—আরও কিছুদিন থাকুন।

ঋষিরা রয়ে গেলেন।

কার্তিক তখন এলেন গাভীর রূপ ধরে। গৌতমের ক্ষেতে ঢুকে গরুটি শস্য খেতে সুরু করলো। গৌতম তাড়াতাড়ি গেলেন গরুটিকে তাড়াবার জন্য। ক্ষীণ শীর্ণ দেহ গরুটিকে দেখে গৌতমের করুণা হলো। কিছু কচি ঘাস তুলে গরুটির মুখে ধরলেন তাকে শস্য খাওয়া থেকে নিবৃত্তি করবার জন্য। কিন্তু সেই ঘাসে মুখ

দিয়েই গরুটি ঢলে পড়ে গেল। গৌতম দেখেন,—গরুটি মরে গেছে।

গো-হত্যার সব দোষ গিয়ে পড়লো গৌতমের উপর।

গো-হত্যা মহাপাপ। ঋষিরা বললেন—আর আমরা এখানে থাকতে পারি না। তুমি গো-বধের পাপে লিপ্ত হয়েছ।

গৌতম বললেন—আপনারাই বিধান দিন্, কি করলে এই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি?

ঋষিরা বললেন—যদি গঙ্গা এনে মৃত গরুটিকে বাঁচিয়ে তুলতে পার তবেই তোমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

গৌতম তপস্যা সুরু করলেন।

তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব এসে দেখা দিলেন। বললেন—কি বর চাও বল?

গৌতম বললেন—গঙ্গাকে দিন। গঙ্গাদেবী যেন এই মৃত গরুটিকে বাঁচিয়ে দেন।

শিব বললেন—তথাস্তু!

সেইখান দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হলেন। গঙ্গাজলের স্পর্শ পেয়ে গরুটি বেঁচে উঠলো। অনাবৃষ্টির শুষ্কতাও আর রইল না। গঙ্গার দুই তীর আবার শস্য-শ্যামল হয়ে উঠলো।

ঋষিরা সেই নদীর নাম দিলেন গৌতমী।

গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে ব্রহ্মগিরি নামে এক পাহাড় আছে। সেইখানেই নাকি গৌতম তপস্যা করেছিলেন। তারই দু'তিন ক্রোশ দূরে কবুর গাঁয়ে ছিল গৌতমের আশ্রম।

পুলের উপর থেকে দেখা যায় নীচে বাঁধান ঘাট, নরনারীর ভীড়।

একদিন ওই ঘাটের সামনেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। গোদাবরীর জলধারার পানে তাকিয়ে তাঁর মনে উঠেছিল

যমুনার কথা। চোখে নেমে এলো অশ্রুর ধারা, ভাব ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন—

রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

এসে দাঁড়ালেন রামানন্দরায়। গৌরকান্তি জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসীর মুখের পানে তাকিয়ে বিস্মিত হলেন—

"সূর্য্যশত সমকান্তি—অরুণ বসন
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ—কোমল লোচন॥
দেখিয়া তাহার মনে হইল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥
উঠি প্রভু, কহে—উঠ, কহ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'।
তারে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥"

তারপর এই গোদাবরী তীরে বসেই সুরু হলো ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা,—মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আরম্ভ পর্ব।

এই গোদাবরী তীরেই পঞ্চবটি বনে শ্রীরামচন্দ্র একদিন কুটির বেঁধেছিলেন।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারের মাঝে আমরা কৃষ্ণা নদী পার হলাম। তরল অন্ধকারের মাঝে নিকষ কালো জলরেখা, কৃষ্ণা নামটি সার্থক করে তুললো আমাদের চোখে। খণ্ড খণ্ড পাহাড়কে ঘিরে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে এই নদীটি। পূর্বঘাট পর্বতমালা যেন কালো শাড়ীর আঁচল ছড়িয়ে দিয়েছে দিগন্তের পানে।

নদীর দু'পাশেই সহর, সারি সারি আলোর মালা দুই তট ধরে এগিয়ে গেছে দৃষ্টি-সীমার শেষ অবধি।

"পাষাণের বাধা ঠেলেঠুলে নদী অপনার মনে সিধে সে
কলগান গেয়ে দুই তীর বেয়ে যায় চলে দেশ বিদেশে।

যার কোল হতে ঝরণার স্রোতে এসেছে আদরে গলিয়া,
তারে ছেড়ে দূরে যায় দিনে দিনে অজানা সাগরে চলিয়া।
অচল শিখর ছোট নদীটিরে চিরদিন রাখে স্মরণে,
যত দূরে যায় স্নেহধারা তার সাথে যায় দ্রুত চরণে।"

সকাল থেকেই দূরে সমুদ্র দেখা গেল, আর কাছে দেখা দিল সমুদ্র থেকে এগিয়ে আসা সঞ্চিত জলরাশি।

সমুদ্র তীরেই মাদ্রাজ।

ট্রেন এসে থামতেই স্বেচ্ছাসেবকের দল এগিয়ে এল। বিছানা-পত্র তুলে নিলে ঠেলাগাড়ীতে, আমাদের তুলে দিলে বাসে।

বাস পৌঁছে দিল ট্রিপলিকেন-এ। তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ী, বিধান সভার সদস্যদের হোস্টেল। সামনে সাজানো বাগান। ঘরে ঘরে আসবাব-পত্র সাজানো। আলো, পাখা, আলমারী, টেবিল, চেয়ার, বারান্দায় টেলিফোন। স্নানঘরে কল ও ঝরণা। আরাম ও সুবিধার কোন অপ্রাচুর্য নেই।

এক একখানি ঘরে তিনজনের স্থান। আমরা চারজন একখানি ঘর নিলাম। পূর্ণ চক্রবর্তী, নরেন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন গুপ্ত আর আমি। ওপাশে আরেকখানি ঘরে উঠলেন খগেন্দ্র মিত্র, প্রসূন বসু ও দ্বীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। জিনিষপত্র রাখতে না রাখতেই আহ্বান এলো—চা খাওয়ার জন্য যেতে হবে পথের ওপারে 'এয়ার লাইন্‌স্ হোটেলে।'

তখনই ঘরে ঘরে তালা পড়ে গেল। সবাই চললো এয়ার লাইন্‌স-এ।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন।—

মাত্র তিনটি দিন। সভা, আলাপ-আলোচনা ও খোস-গল্পের মধ্যে দিয়ে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, টের পাওয়া গেল না।

সকালে বিকালে সাহিত্য-সভা বসে 'রাজাজী হলে'।
সন্ধ্যায় নাচগানের আসর বসে 'সেনেট হলে'।

দুপুর বেলা আহারাদি সেরে খানিক গড়িয়ে নেবার অবসর থাকে না। সকাল আটটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত প্রোগ্রাম চলে। মাদ্রাজ সহর দেখার ফুরসৎ মেলে না। সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধি আমরা, সাহিত্য অধিবেশনে উপস্থিত থাকা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু শেষঅবধি দু-একটা অধিবেশন থেকে পালাতে হয়।

মনোরম সহর এই মাদ্রাজ। চাঁদের মত বাঁকা, দীর্ঘ ন' মাইল জুড়ে সমুদ্রের তীরে গড়ে উঠেছে মহানগরী। কলিকাতার গঙ্গার মত সমুদ্রকে এরা অবহেলা করেনি, সমুদ্রের পাশ দিয়ে এরা তৈরী করেছে প্রশস্ত রাজপথ, রাজপথের পাশে ফুটপাত সাজিয়েছে ফুলের গাছ দিয়ে। প্রশস্ত বেলাভূমির কিনারায় এই ফুলগাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে যথেষ্ট যত্নের দরকার হয়। তা হোক্, কিন্তু কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও মানুষের মনে যে একটা স্নিগ্ধতার রুচি আছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ফুলগাছগুলির পাশেই মাঝে মাঝে সিমেণ্ট-তৈরী বসবার বেঞ্চি করা আছে। এই মেরিণ রোডের একধারে সমুদ্রের বেলাভূমি, আরেক ধারে বড় বড় বাড়ী, হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, কুইন্‌স কলেজ ইত্যাদি।

এই সুন্দর নগরটির পত্তন করেন একজন ইংরেজ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার ফ্রান্সিস্-ডে। তখন এই অঞ্চলটি ছিল বিজয়নগরের রাজ্য। রাজা ছিলেন শ্রীরঙ্গবয়ার। ব্যবসা করার জন্য ফ্রান্সিস্ রাজার কাছ থেকে জমি ইজারা নিলেন। সেখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি তৈরী হলো। দেখতে দেখতে সেই কুঠির চারিপাশ ঘিরে গড়ে উঠলো এক দুর্গ। সে সতেরো শতকের কথা।

তারপর এই দুর্গ নিয়ে অনেক বিবাদ ও লড়াই ঘটে গেছে। আওরঙ্গজীবের সেনাপতি দাউদ খাঁ দুর্গ অবরোধ করেন। মারাঠারা

দুর্গ আক্রমণ করলেন। তারপর ফরাসীদের সঙ্গে বাধলো বিবাদ। এতদিন দুর্গ থেকে ইংরেজদের কেউ হটাতে পারলো না। কিন্তু ফরাসীরা একদিন সত্যই ইংরেজদের হটিয়ে দিয়ে দুর্গ দখল করে বসলো, তবে রাখতে পারলো না। তারপর হায়দার আলি একবার সংকল্প করেন এখান থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবেন, কিন্তু শেষ অবধি সেই সংকল্প কাজে লাগাতে পারেননি।

ক্রমে ইংরেজরা দুর্গটিকে বড় করেছে, বিরাট জাহাজ-ঘাটা তৈরী করেছে, ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বসতিও বেড়েছে। এখন সহর হয়েছে ন' মাইল দীর্ঘ, সাড়ে তিন মাইল চওড়া।

মাদ্রাজ বন্দরটি তৈরী করতে খরচ পড়েছিল এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকারও বেশী। চল্লিশ ফুট চওড়া একটি বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের খানিকটা ঘিরে ফেলা হয়েছে। এই বাঁধের উপর দিয়ে গেছে রাস্তা আর রেলপথ। এই বাঁধের উপর জাহাজের মাল বোঝাই হয়, খালাস হয়।

ভোর চারটের সময় খগেনবাবু ডাক দিলেন—চলো, সূর্যোদয় দেখতে যাব।

তখনো দিনের আলো ফোটে নি, ক'জনে মিলে বেরিয়ে পড়লাম। মাইলখানেক পথ। সাগরের বেলাভূমিতে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন পূর্ব দিকটা সবে ফরসা হয়েছে। তার আগেই জেলেরা সব ডিঙ্গি নিয়ে ভেসে পড়েছে সাগরে মাছ ধরতে। আলো যত ফোটে সমুদ্রের রঙ ততো বদলায়। কালো জল নীলাভ হয়ে ওঠে, পূর্ব দিগন্তের রক্তাভা জলের বুকে সবুজ রঙের রেখা টানে। ধীরে ধীরে গোলাকার লাল সূর্য উঁকি মারে জলের আড়াল থেকে।

সমুদ্রের ঢেউ যেমন আছড়ে পড়ে বেলাভূমির উপর, তেমনি

দমকা বাতাস আছড়ে পড়ে আমাদের গায়। মনে হয় ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে বুঝি। আমরা ক'জন বসে পড়ি। ছোট ছোট কাঁকড়াগুলি বালির ভিতর থেকে উঠে খরখর করে আমাদের গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়। দূরে-দূরে মাছ-ধরা নৌকাগুলি দেখা যায়। মাথার উপর আকাশে রঙের খেলা চলে। ক'জনে চুপ করে তাকিয়ে থাকি সামনের পানে। সমুদ্রের ঢেউ যেন মনকে ছুঁয়ে যায়।

"নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রণরণি
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ।"

ক'জন জেলে সমুদ্রে একখানি বিশাল জাল ফেলে টানছিল। টেনে রাখতে পারছিল না। আমাদের ক'জন উঠে গিয়ে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেললো। জালটানা যখন শেষ হলো, তখন গরীব জেলের দল হাত পাতলো—বাবু, পয়সা দাও, আমরা বড় গরীব।

দ্বিজেনবাবু কয়েকটা সিগারেট দিল তাদেরকে।

ইতিমধ্যে রেবতীভূষণ সাড়া তুললো—আমি সমুদ্রে স্নান করবো।

রেবতী ও বিমানচাঁদ কাপড়-জামা রেখে জলে গিয়ে নামলো।

দুপুর বেলা খগেনবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম কপালেশ্বর মন্দির দেখতে।

সহরের দক্ষিণ অঞ্চলে ময়লাপুরে এই মন্দিরটি। প্রায় দু' মাইল পথ। শুনেছিলাম শৈব ও জৈন গ্রন্থে এই জায়গাটিকে বলে 'তিরুমাইলি' অর্থাৎ সুন্দর স্থান। বাস থেকে নেমে দেখলাম স্থানটি সুন্দরই বটে! সাধারণ অধিবাসী অধ্যুষিত ঘেঞ্জি পল্লী। চারিপাশে দারিদ্র্য ও অপরিচ্ছন্নতা! রাস্তার কলে গরীব মেয়েদের

ভীড়। ভিক্ষুকও আছে। যেন উত্তর কলিকাতার কোন ঘেঞ্জি পাড়ায় এসে পড়লাম।

কালো পাথরের প্রকাণ্ড মন্দির। সামনে একটি পুকুর। মন্দিরের ভিতরে শিবমূর্তি।

দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির গঠন উত্তর ভারতের মন্দির থেকে ভিন্ন। প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ জমি, চারিপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। চারিদিকে চারিটি প্রবেশ দ্বার। এই দ্বারগুলিকে বলে 'গোপুরম্'। গোপুরম্ বহু তলায় ক্রমশঃ ছোট হয়ে আকাশে উঠেছে। গোপুরমের দেয়ালে নানা দেবদেবীর মূর্তি ও পৌরাণিক কাহিনী খোদাই করা আছে। সবার উপরে কয়েকটি সোণার কলসী স্থাপিত। গোপুরমের ভিতর দিয়ে সিঁড়ি আছে, উপরে শেষ অবধি ওঠা চলে। গোপুরম্ পার হয়ে ভিতরে আবার একটি চত্বর। তার চারিপাশে নানা দেবদেবীর মন্দির। কেন্দ্রে প্রধান দেবতার মন্দির। এই মন্দিরটির চূড়া কিন্তু গোপুরম্গুলির মত উঁচু হয় না, চূড়াটি হয় ছোট, স্বর্ণ মণ্ডিত ও কারুকার্যখচিত। একে বলে 'বিমান'।

মূল মন্দিরের সামনেই থাকে একটি পাথরের থাম, সেই থামের উপর দেবতার ধ্বজা তোলা হয়। আর থাকে দেবতার বাহনের প্রস্তরমূর্তি। শিবমন্দিরের সামনে থাকে বৃষ, অর্থাৎ নন্দিকেশ্বর আর বিষ্ণুমন্দিরে থাকে গরুড়।

মন্দিরের পাশেই থাকে এক একটি পাথর-বাঁধানো পুকুর—টেপ্পাকুলম, অর্থাৎ দেবতাদের জলবিহারের স্থান। পুকুরের মাঝে থাকে একটি দ্বীপ, আর তার উপর একটি ছোট মন্দির।

কপালেশ্বরের মন্দিরে অনেকগুলি সন্ন্যাসীর পাথরের মূর্তি আছে। এঁদের মধ্যে সন্ন্যাসী সম্বন্দর প্রসিদ্ধ।

সম্বন্দর বাল্যকালেই গৃহত্যাগ করেন। সন্ন্যাসী হয়ে নানা তীর্থ পর্যটন করে দেশে ফিরলেন। হাতে একটি মন্দিরা আর

মুখে শান্ত মৌনভাব। মন্দিরে বসে বসে তিনি নাম গান করেন। যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়। সাধক বলে সম্বন্দরের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

এক দিন এক সন্তানহারা মা এসে তাঁকে ধরলেন—মৃত কন্যাকে বাঁচিয়ে দিতে হবে।

সম্বঁন্দর মন্দিরা বাজিয়ে নাম গান স্থরু করলেন। একান্ত তদ্‌গত চিত্তে তিনি নাম গান করে চলেছেন। কতক্ষণ যায়, সহসা সামনে শায়িতা মৃতা কন্যার দেহে জীবনের স্পন্দন দেখা দিল, মেয়েটি চোখ মেললো।

সম্বন্দরের অলৌকিক শক্তির কথা ছড়িয়ে পড়লো লোকের মুখে মুখে। সে আজ কতদিনের কথা কে জানে।

মন্দির দেখে তো বেরুলাম। বাস ধরবো। শুনেছিলাম মাদ্রাজের সব লোকই নাকি ইংরেজি জানে, কিন্তু পথে বাসের কথা জিজ্ঞাসা করতেই ঠকে গেলাম। আমাদের কথা বোঝে না কেউই। শেষে যিনি বুঝলেন, তিনি বললেন—আইস-হাউস থেকে বাস ধরুন, এক ফার্লং পথ।

এখানে সবাই ফার্লং হিসাবেই পথ ধরে। ফার্লং মানে ২২০ গজ। কিন্তু হাঁটতে গিয়ে দেখি এক ফার্লংএর শেষ নেই। আবার 'আইস হাউস' জিজ্ঞাসা করার এক ঝামেলা, ভাষা কেউ বুঝে না।

পথ চলতে চলতে একটা বিশেষত্ব চোখে পড়লো, প্রায় প্রতি গৃহের দ্বারে ঝুলছে একটি করে চাল-কুমড়া। কালি দিয়ে তার নাক মুখ চোখ গোঁফ আঁকা হয়েছে। কোথাও-বা বাড়ীর সামনে ন্যাকড়ায় তৈরী মানুষের প্রমাণ-সই মূর্তি। পরে শুনেছিলাম, ওই মূর্তিগুলি গৃহস্থের অকল্যাণ দূর করা ও ভূত-প্রেত তাড়াবার জন্য।

শেষ পর্যন্ত আইস হাইস পেলাম, তবে সে পথের হিসাব এক ফার্লং নয়।

পরদিন সকালে গেলাম পার্থসারথী মন্দিরে। মন্দিরের মধ্যে চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্তি। এরও গঠন কারুকার্য সেই একই ধারায়।

মন্দিরের সামনে একটি পুকুর আছে। এই পুকুরটির নাম তিরুইল্লিকেনী। এই নামটিই বোধ হয় সাহেবদের উচ্চারণ-দোষে ট্রিপ্লিকেন হয়েছে। এই অঞ্চলটির নাম ট্রিপ্লিকেন।

পূর্ণবাবু ও নরেনবাবু ছিলেন আমাদের সঙ্গে, সঙ্গে নিয়েছিলেন ছবির সরঞ্জাম। মন্দিরের দু'পাশে দু'জনে বসে ছবি আঁকতে সুরু করলেন। আর দ্বিজেনবাবু ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতে লাগলেন চারিপাশে।

ইতিমধ্যে সাহিত্যসভা চলছে,—অধিবেশনের পর অধিবেশন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধিবেশন হলো তামিল ও তেলেগু সাহিত্যিকদের সম্মেলন। প্রত্যেক বক্তাই বাংলা সাহিত্যের প্রশংসা করলেন। বললেন,—'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়।

এক তামিল লেখক বক্তৃতার শেষে বাংলায় বললেন—

এবার লইনু বিরাম,
তোমাদের করিনু প্রণাম !

আরেক কবি বললেন—

অন্ধ্র বঙ্গ প্রাণের বন্ধু
একই বিধাতার সৃষ্টি,
দু'জনের একই কৃষ্টি।

অন্ধ্রমন্ত্রী শ্রীরেড্ডী শুনিয়ে দিলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত—

"হে ক্ষণিকের অতিথি !..."

একখানি শেষ করে তিনি ধরলেন আরেকখানি—

"কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ..."

সন্ধ্যায় আসরে শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর গান, ভারতলক্ষ্মণম্ ও গোপীনাথের নাচ অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করে।

তিনটি দিন কি ভাবে যে কেটে যায়, তার হিসাব থাকে না।

শেষ সন্ধ্যায় 'বাঙালী-সমিতি' আমাদের সম্বর্ধনা জানান তাঁদের সমিতি-গৃহে। সামান্য কয়েক শত বাঙালী এখানে থাকেন, তাঁরা সবাই এসে মিলেছেন এই সমিতিতে, নিজেদের পাঠাগার করেছেন, 'হল্' তৈরী করেছেন। প্রবাসী বাঙালী নিজেদের কৃষ্টি সম্বন্ধে বড় সজাগ, এক জোট হয়ে নিজেদের ধারা তাঁরা রক্ষা করে চলেন। বাংলার বাইরে বাঙালীর এই রূপটাই চোখে পড়ে। অন্য রাজ্যের লোকেরা ঠিক এমনভাবে নিজেদের সঙ্ঘ গড়ে তুলতে পারে না, তাই তারা বাঙালীর ঈর্ষা করে।

আমাদের নিয়ে রিজার্ভ বাস ছাড়লো সকাল ছ'টায়। সেই জন্য প্রতিনিধি-মহলে প্রস্তুতি চলছিল রাত চারটে থেকে। যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছিলেন নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা। আজ সারাদিন বাসে ঘুরিয়ে তাঁরা আমাদের তিনটি জায়গা দেখিয়ে দেবেন—কাঞ্চীপুরম্, পক্ষীতীর্থ ও মহাবলীপুরম্।

বাসেই তাঁরা আমাদের চা ও প্রাতরাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। সূর্যোদয়ের আগেই ছ'খানি রিজার্ভ বাস শ'-দেড়েক প্রতিনিধি নিয়ে ছুটলো পথের ধুলো উড়িয়ে।

ছে-চল্লিশ মাইল পথ পার হয়ে এসে পড়লাম মন্দিরদ্বারে।

কাঞ্চীপুরম্—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী।

শিবকাঞ্চী।—

বিরাট মন্দির-চত্বর, আকাশস্পর্শী গোপুরম্, বহু দেবদেবীর মূর্তি। গোপুরম্ পার হয়ে মণ্ডপ, মণ্ডপ পার হয়ে প্রাঙ্গণ, তারপর একাম্রনাথ শিবের মূর্তি।

প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন আমগাছ আছে। এক সময় নাকি এই আমগাছটিতে চার রকমের চারটি ফল হ'ত—অম্ল, মিষ্ট, কটু ও তিক্ত।

এখানে শিবলিঙ্গ বালির। প্রবাদ আছে, এখানে নাকি প্রলয়-কালে বিধাতা বালির শিব তৈরী করে পূজা করেছিলেন, সেইজন্যই এখানকার শিব বালির। এই শিবের মাথায় জল দেওয়া চলে না, শুধু বেলপাতা দিয়ে এঁর পূজা হয়।

দক্ষিণ ভারতে শিবের পঞ্চমূর্তি আছে—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্। শিবকাঞ্চীর শিব ক্ষিতি-মূর্তি, জম্বুকেশ্বরে অপমূর্তি, তিরুবল্লমলয় তেজোমূর্তি, কাল হস্তীতে বায়ুমূর্তি আর চিদাম্বরমে ব্যোমমূর্তি।

শিবকাঞ্চী সম্পর্কে পুরাণে একটি গল্প আছে।—

মহাদেব তপস্যা করছেন। স্থির, অচঞ্চল, ধ্যানসৌম্য মহাদেব। হঠাৎ পার্বতীর কি খেয়াল হলো, ধ্যানী মহাদেবের ধ্যান ভাঙাবার জন্য তিনি পিছন থেকে এসে মহাদেবের চোখ টিপে ধরলেন। ধ্যান ভেঙে গেল। মহাদেব বিরক্ত হলেন, কুপিত হলেন, শাপ দিলেন পার্বতীকে।

শাপ মোচন করার জন্য পার্বতী এলেন তপস্যা করতে। দেখে-দেখে স্থান পছন্দ করলেন কাবেরী নদীর তীরে। পার্বতী তপস্যা সুরু করলেন।

শাপ দেবার পর শিবের কেমন যেন মনে হলো—কাজটা ঠিক হয় নি, লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে গেছে। তিনিও নেমে এলেন এই মর্ত্যে। শিব ছিলেন এই কাঞ্চীপুরে, এই আমগাছতলায়। এই আমগাছে দিনে একটি করে আম ফলতো, শিব সেই আম খেতেন, আর পার্বতীর তপস্যা শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করতেন।

ছ'মাস পরে পার্বতীর তপস্যা শেষ হলো শিব তখন পার্বতীকে নিয়ে কৈলাসে চলে গেলেন।

সেই জন্যই এখানকার শিবের নাম এক-আম্র-নাথ।

এখানে যে পার্বতীমূর্তি আছে তাঁর নাম কামাক্ষী দেবী।

চৈত্র মাসে পনেরো দিন ধরে এখানে একটি মেলা বসে। পঞ্চধাতুর একটি আলাদা শিবমূর্তি আছে, তাঁকে বলা হয় ভোগমূর্তি। সেই মূর্তিকে তখন সোনার তৈরী এক বৃষের উপর চড়িয়ে মন্দিরের সামনে রাখা হয়। ক'দিন ধরে নাচ-গান চলে, স্তব পাঠ হয়। তারপর শেষ দিনে কামাক্ষী দেবীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। এই দিন নাকি পার্বতীর শাপমোচন হয়েছিল এবং পার্বতীকে মহাদেব নিয়ে গিয়েছিলেন কৈলাসে।

এখানে কামাক্ষী দেবীর কাছে আগে নরবলি হ'ত, শঙ্কর আচার্য সেই প্রথা বন্ধ করেন।

জগৎ-গুরু শঙ্কর আচার্য ছিলেন শৈব। তিনি ছিলেন এই অঞ্চলের মানুষ। সারা ভারত পরিক্রমা করে তিনি এখানে ফিরে আসেন। এখানেই তিনি প্রথম জীবনে সাধনা করেছিলেন। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি এখানে এসে শিব ও পার্বতীর পূজা-অর্চনা করেছিলেন। এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে শঙ্কর আচার্যের সমাধি আছে।

মন্দিরের মধ্যে আট-দশ হাত প্রশস্ত একখানি ঘর, ঘরের মধ্যে শঙ্কর আচার্যের এক মূর্তি। ছাদের উপর একখানি গেরুয়া রঙের পতাকা। এই গৃহতলেই শঙ্করের নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা আছে।

সমাধির পাশেই আছে ছ'জন প্রধান শিষ্যের মূর্তি।

মহাজ্ঞানী আচার্যের নশ্বর দেহ আজ অবলুপ্ত। কিন্তু ভক্ত ভগবানের সামনেই নিজের স্থান স্থায়ী করে রেখেছেন। ভগবানের সঙ্গে ভক্তেরও পূজা হয়, আরতি হয়। ভক্ত ও ভগবান্ যে অবিচ্ছেদ্য, তা উপলব্ধি করা যায় এই সমাধি-মন্দিরের পানে তাকিয়ে। মর্মর মূর্তি, পরণে গৈরিক বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কানে লৌহবলয়, কপালে চন্দন, হাতে লাঠি, অদ্বৈতবাদের মহাসন্ন্যাসী চিরন্তন ভক্ত

হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই ঘরখানির মধ্যে, তাকিয়ে আছেন কামাক্ষী দেবীর মন্দিরের পানে। ভক্তকে নিয়েই তো ভগবান! না হ'লে ভগবানের মহিমা প্রচার করতো কে?

শঙ্কর আচার্য জন্মেছিলেন সপ্তম শতকের শেষের দিকে। কালণ্ডি গ্রামে নম্বরী-ব্রাহ্মণ বংশে। কত বছর বয়সে তিনি গুরুগৃহে গিয়েছিলেন তা জানা নেই, তবে সাত বছর বয়সে তিনি শাস্ত্রপাঠ শেষ করেছিলেন। গৃহে ফিরে আসার কিছুদিন পরে নদীতে স্নান করতে গিয়ে তাঁকে কুমীরে ধরে। উপস্থিত লোকজনদের চেষ্টায় তিনি রক্ষা পান।

আট বছর বয়সেই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। নর্মদার তীরে ওঙ্কারনাথে মহাযোগী গোবিন্দপাদের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তারপর রামেশ্বর থেকে বদরিকাশ্রম পর্যন্ত তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করেন।

এই সময় তিনি হৃষীকেশে যজ্ঞেশ্বর বিগ্রহ, বদরিকাশ্রমে নারায়ণ বিগ্রহ এবং পুরীতে জগন্নাথ বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। দেশ বিখ্যাত বহু পণ্ডিতকে তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যায় পরাজিত করেন। হিন্দু সন্ন্যাসীদের তিনি ঐক্যবদ্ধ করেন। অনেক রাজা-মহারাজা তাঁর শিষ্য হ'ন। জ্ঞানচর্চার জন্য তিনি ভারতের চারিদিকে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন—মহীশূরে শৃংগেরী মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, এবং বদরিকাশ্রমে যোশীমঠ।

শঙ্কর ছিলেন অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদের মূল কথা হলো—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।' অনেক দেশবিখ্যাত পণ্ডিতকে তিনি নিজের মতে নিয়ে আসেন। জৈন ও বৌদ্ধ আচার্যেরা বেদ মানতেন না। তিনি তাঁদের মতকে খণ্ডন করেন। ধর্মের আচার ও নীতিতে নানা রকম দুর্বলতা ও কলুষতা দেখা দিয়েছিল, তিনি যুক্তি ও বিচার দিয়ে সেই সব দোষকে নির্মূল করেন। এতে একদল লোক তাঁর শত্রু হয়,

এবং বার বার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কিন্তু যোগবলে প্রতিবারেই তিনি রক্ষা পান।

শঙ্কর আচার্যের যোগবল এমনই ছিল যে প্রবাদ—দক্ষিণ ভারতের মূকাম্বিকায় একটি মরা ছেলেকে তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন এবং শ্রীবেলীতে তেরো বছরের একটি বোবা ছেলের মুখে তিনি কথা ফুটিয়েছিলেন। এই ছেলেটি পরে তাঁর শিষ্য হয়। নাম হস্তামলকাচার্য।

আচার্য শঙ্কর জাতিভেদ মানতেন না। তিনি বারাণসীতে এক চণ্ডালকে প্রণাম করে বলেছিলেন—যিনি সবাইকে সমভাবে দেখেন এবং সেই মতো ব্যবহার করেন, তিনি চণ্ডালই হোন আর ব্রাহ্মণই হোন, তিনি আমার গুরু, তাঁকে আমি প্রণাম করি।

শঙ্কর আচার্য বাংলা দেশেও এসেছিলেন। তখন আদিশূর ছিলেন এখানকার রাজা।

শিবকাঞ্চীর মন্দির পঁচাত্তর বিঘা জমির উপর অবস্থিত।

মন্দিরের প্রাঙ্গণের পাশে এক প্রকাণ্ড মণ্ডপ আছে। এক হাজার থামের উপর এই মণ্ডপটি ছিল, এখন আছে মাত্র সাড়ে ছ'শো। মণ্ডপের পাশেই আছে একটি পুকুর।

হিন্দুমন্দিরের উপর বিধর্মীদের একটা জাত-ক্রোধ আছে। এই মন্দিরের গায়েও হায়দার আলীর কামানের গোলার চিহ্ন আছে। হায়দার আলীর এক সময় দৃষ্টি পড়েছিল এই মন্দিরটির উপর। সেই সময় পুরোহিতেরা একাম্রনাথ ও কামাক্ষী দেবীকে মন্দির থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। একাম্রনাথকে নিয়ে গিয়েছিলেন মাদ্রাজে, আর কামাক্ষী দেবীকে রেখে এসেছিলেন তাঞ্জোরে।

পরে, দুর্যোগ যখন কাটলো, তখন লর্ড ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে একাম্রনাথ আবার এখানে ফিরিয়ে আনেন।

কিন্তু গোলযোগ বাধলো কামাক্ষী দেবীকে নিয়ে। তাঞ্জোরের

পুরোহিতেরা কামাক্ষী দেবীকে আর ফেরৎ দিলেন না। এখানে নতুন করে কামাক্ষী দেবীর মূর্তি গড়ে, প্রতিষ্ঠা করা হলো।

বাস ছুটলো কাঞ্চীপুরমের আর এক প্রান্তে। সহরের দুই প্রান্তে দুই মন্দির। একদিকে শিবকাঞ্চী, আর একদিকে বিষ্ণুকাঞ্চী। আশেপাশে ছোটখাটো আরো অনেক মন্দির আছে। কিন্তু এই দু'টি বড় মন্দির নিয়েই কাঞ্চীপুরের খ্যাতি।—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তেতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

অর্থাৎ, অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী, পুরী, হরিদ্বার বা দ্বারকা এই সাতটি তীর্থে দেবদর্শন করলে মানুষকে আর এই পৃথিবীতে জন্মে দুঃখ ভোগ করতে হয় না।

সংস্কৃতে আর একটি কথাও আছে—

"পুষ্পেষু জাতি, নগরেষু কাঞ্চী, স্ত্রীষু রম্ভা, নরপেষু রামঃ।"

রাজাদের মধ্যে যেমন রাম, নগরের মধ্যে তেমনি কাঞ্চী।

এক সময় যে এই নগরীর বিশেষ সমৃদ্ধি ছিল তা এই তিন-চার মাইল পথ যেতে যেতেই বোঝা যায়। প্রশস্ত সরল পথ, পথের দু' পাশে নারিকেল গাছের সারি। বাড়ী-ঘর বাজার ঘনসন্নিবিষ্ট, তবে চারিপাশেই প্রাচীনতা ও পরিচ্ছন্নতা পরিস্ফুট।

বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দির শিবকাঞ্চীর চেয়ে বড়। মন্দিরের মধ্যে প্রথম মহলে আছে নৃসিংহদেবের মূর্তি। ভিতরে মূল মন্দিরে আছে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। এই মূর্তির নাম শ্রীশ্রীবরদরাজস্বামী।

বরদরাজ নামটির সঙ্গে এক পৌরাণিক কাহিনী জড়িয়ে আছে।

ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী। সরস্বতী বড় গর্বিতা। তাঁর আচরণে ব্রহ্মা একদিন বেজায় ক্ষুণ্ণ হ'লেন, রাগ করে বললেন—তোমারই তো বোন লক্ষ্মী, তিনি কিন্তু তোমার চেয়ে অনেক ভাল!

আর যায় কোথায়? সরস্বতী রাগ করে চলে গেলেন।

ঘরে স্ত্র নেই, ব্রহ্মাকে আর ঘর-সংসারের কথা ভাবতে হয় না। তিনি এবার পূজা-অর্চনায় মন দিলেন। কাঞ্চীতে একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল হয়, তাই ব্রহ্মা কাঞ্চীতে এসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে সুরু করলেন।

সরস্বতীর রাগ তখনও পড়ে নি। তিনি ব্রহ্মার যজ্ঞের সব খবরই রাখেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ শেষ করে আহুতি দিবেন, এমন সময় যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য সরস্বতী নদী হয়ে বইতে সুরু করে দিলেন। এখনি বুঝি সব ভেসে যায়! ব্রহ্মা বিপদ বুঝে তখনই বিষ্ণুর শরণ নিলেন। বিষ্ণু ছুটে এলেন সরস্বতীকে থামাতে। কিন্তু সে জলোচ্ছ্বাসকে সহজে রুখতে পারলেন না। তখন বিষ্ণু শুয়ে পড়লেন সেই জলস্রোতের সামনে। বিষ্ণুকে লঙ্ঘন করে সরস্বতী এগোতে পারলেন না। এবার জলস্রোত থামলো।

বিষ্ণু সন্তুষ্ট হ'লেন। ব্রহ্মার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলো।

বিষ্ণু সরস্বতীকে আশীর্বাদ করলেন—এই সরস্বতী নদী ভাগীরথীর চেয়েও পুণ্যসলিলা বলে গণ্য হবে।

সেই যজ্ঞকুণ্ডের উপরেই ব্রহ্মা এক বিষ্ণুমন্দির তৈরী করে দেন। এইটিই সেই বিষ্ণু মন্দির।

মন্দিরটি বিরাট। মন্দিরের মধ্যেই একটি সরোবর আছে। এই সরোবরের সামনেই আছে একশো স্তম্ভের একটি সভামণ্ডপ। প্রতিটি থাম এক একখানি পাথর দিয়ে তৈরী, প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু। থামগুলির গায়ে একটি করে অপূর্ব কারুকার্য-মণ্ডিত সিংহমূর্তি খোদাই করা আছে। এই মণ্ডপের মাঝে আছে একটি প্রকাণ্ড পাথরের কূর্ম। কূর্মের পিঠের উপর একটি বৃহৎ শতদল পদ্মাসন। উৎসবের সময় দেবতার ভোগমূর্তি এইখানে এনে বসানো হয়। উৎসব হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে—ব্রহ্ম উৎসব।

বিজয় নগরের রাজারা এই মণ্ডপটি তৈরী করে দিয়েছিলেন ষোল শতকে।

এইখানে বিজয় নগরের রাজা অচ্যুত রায় 'তুলা পুরুষ' যজ্ঞ করেছিলেন। দাঁড়ি-পাল্লায় বসে মুক্তা দিয়ে নিজেকে ওজন করে, তারপর সেই মুক্তা দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদের দান করেন। তার সঙ্গে সহস্র গাভীও দান করেছিলেন।

এর পর আরও অনেক রাজা সোনা ও রূপা দিয়ে নিজেকে ওজন করে এখানে দান করে গেছেন, কিন্তু রাজা অচ্যুৎ রায়ের দানকে কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি।

সাত-শো বছর আগে এই মন্দিরে দারুময় মূর্তি ছিল। সেই মূর্তি সরিয়ে এই পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দারুময় মূর্তি ডুবিয়ে রাখা হয় ওই সরোবরের জলে। বছর কুড়ি আগে ওই সরোবরের জল ছেঁচে পঙ্কোদ্ধার করা হয়। তখন সেই দারুময় মূর্তিও তোলা হয়। দেখা যায়, সাত-শো বছরেও সেই দারুময় মূর্তির কোন রকম বিকৃতি হয় নি। সেই মূর্তির ফটো তুলে নিয়ে আবার তাকে সেই সরোবরের জলেই ডুবিয়ে রাখা হয়। সেই ফটো দেখলে মনে বিস্ময় জাগে যে কি করে এটা সম্ভব হলো? এ কাঠ কী কাঠ? বোধ হয় হাজার হাজার বছর ধরে লাখ লাখ মানুষের ভক্তিতে ভিজে এই দারুময় মূর্তি অক্ষয় হয়ে উঠেছে।

বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দির রামানুজের সাধনার ক্ষেত্র।

আচার্য রামানুজ জন্মেছিলেন গ্রামে। মাদ্রাজের সমুদ্র-উপকূলে ছোট একখানি গ্রাম, সেই গ্রামের নাম পেরেম্বুদুর। বাপ-মা তাঁর নাম রেখেছিলেন লক্ষ্মণম্। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। তখন থেকে তাঁর নতুন নাম হয় রামানুজম্।

সন্ন্যাসী হয়ে রামানুজ ভারতের সকল তীর্থ পর্যটন করেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। তিনি আচার্য শঙ্করের মতই জাতিভেদ মানতেন না। সকল জাতির লোককেই তিনি শিষ্য করতেন।

রঙ্গনাথের মন্দিরের সামনে পথের উপর সকল পথচারাকে ডেকে তিনি মন্ত্র দিতেন—ওঁ নমো নারায়ণায় !

দক্ষিণ ভারতে জাতিভেদ প্রবল। রামানুজের তাই বহু শত্রু হয়েছিল। শত্রুরা বার বার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কিন্তু কোন ক্ষতি তারা করতে পারে নি।

রামানুজেরও অলৌকিক শক্তি ছিল বলে প্রবাদ আছে। ভক্তি-বলে তিনিও নাকি এক বোবা ছেলের মুখে কথা ফুটিয়েছিলেন। রাজা তাঁর এক শিষ্যের চোখ উপড়ে নিয়েছিলেন, রামানুজম্ আবার তাকে দৃষ্টি দান করেন।

রামানুজম্ বলতেন—অহঙ্কার ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা ক'রো না। কর্তব্য করে যাও, কর্তব্য করাই ভগবানের সেবা করা। ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা, মন্দিরে গিয়ে দেবতার পূজা করা, জ্ঞানী ভক্তের উপদেশ শোনা এবং শান্ত ও সন্তুষ্ট চিত্তে থাকাই হলো ভগবানের সেবা করা।

তখন এক শূদ্র বরদরাজস্বামীর সেবা করতেন। তাঁর-নাম কাঞ্চীপূর্ণ। আচার্য রামানুজম্ জানতে পেরেছিলেন যে কাঞ্চীপূর্ণ একজন মহাসাধক। তিনি এসে কাঞ্চীপূর্ণকে ধরে বসলেন, বললেন—আমাকে দীক্ষা দিতে হবে।

আগেই বলেছি দাক্ষিণাত্যে জাতিভেদ অতি প্রবল। শূদ্র স্পর্শ করলে যে দেশে ব্রাহ্মণকে স্নান করে পবিত্র হতে হয়, সেখানে একজন শূদ্র কোন সাহসে একজন ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দেবে ? কাঞ্চীপূর্ণ রাজী হলেন না।

রামানুজম্‌ও ছাড়বেন না। সাধকের কাছে জ্ঞানই বড়, সংস্কার তো কিছু নয়।

কাঞ্চীপূর্ণ কি করবেন ভেবে পেলেন না। বরদরাজকে তিনি মনের কথা জানালেন—প্রভু, কি করবো বলে দাও !

বরদরাজ স্বপ্নে বললেন—আচার্য রামানুজকে তুমি এই শ্লোকটি বলো—

'অহমেব পরম ব্রহ্ম জগৎকারণকারণম্।
দেহবসানে ভক্তনাং দদামি পরমং পদম্॥'

[আমিই ব্রহ্ম। আমিই জগৎ সৃষ্টি করেছি। আমার প্রতি যার ভক্তি আছে, মৃত্যুর পর আমিই তাকে মুক্তি দেব।]

পরদিন আচার্য আসতেই কাঞ্চীপূর্ণ তাঁকে সেই শ্লোকটি বললেন। রামানুজমের মনে তখন ভক্তি সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছিল, কাঞ্চীপূর্ণের কথা শুনেই তাঁর সন্দেহ দূর হলো, তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

বরদরাজস্বামীর মন্দিরের পিছন দিকে একখানি ঘর আছে, এইখানে রামানুজম্ থাকতেন এবং গুরুর কাছে শাস্ত্রচর্চা করতেন।

বরদরাজের মাহাত্ম্য সম্পর্কে রামানুজমের এক শিষ্যের একটি কাহিনী আছে। সেই শিষ্যটির নাম কুরেশস্বামী।

কৃমিকণ্ঠ ছিলেন তখন সেখানকার রাজা। তিনি ছিলেন শৈব, বৈষ্ণবদের তিনি সইতে পারতেন না, কুরেশস্বামীকে তিনি আদেশ করলেন—তুমি শৈব হও!

কুরেশস্বামী ছিলেন পরম বৈষ্ণব। রাজার হুকুম তিনি শুনলেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হলেন, নানাভাবে কুরেশের উপর অত্যাচার সুরু করলেন। কুরেশস্বামী কিন্তু অটল—নির্বিকার।

শেষে রাজা আদেশ দিলেন—কুরেশস্বামীর চোখ উপড়ে নাও!

জল্লাদ কুরেশস্বামীর চোখ উপড়ে নিলে।

কুরেশস্বামীর কিন্তু এজন্য দুঃখিত হলেন না। বললেন,—তুমি বেশ করেছ রাজা! চোখ দিয়ে শুধু বাইরেটাই দেখতাম, ভিতরের কিছুই দেখতে পেতাম না। এখন বাইরের দেখাটা ঘুচলো, অন্তরটা এবার দেখতে পাব। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

কুরেশস্বামীর কোন ভাবান্তর হলো না।

রামানুজম্ কিন্তু বিচলিত হলেন। কিন্তু শিষ্যকে কি বলবেন, ভক্ত শিষ্যটি তো সব-কিছুই বরদরাজের আশীর্বাদ বলে ধরে নিয়েছেন। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে আচার্য রামানুজ একদিন কুরেশকে ডেকে বললেন—গুরুকে সুখী করাই তো শিষ্যের কর্তব্য। তাই না?

কুরেশ বললেন—অবশ্য।

—তোমার চোখ দু'টির পানে তাকালে আমার বড় দুঃখ হয়। তুমি প্রভু বরদরাজের কাছে থেকে চোখ দু'টি ফিরে চাও। তোমার দৃষ্টি ফিরে এলে আমি সুখী হবো।

গুরুর আদেশ, কুরেশস্বামী আর 'না' বলতে পারলেন না। বরদরাজস্বামীর কাছে প্রার্থনা জানালেন,—প্রভু, আমার দৃষ্টি ফিরে দাও!

জনশ্রুতি শোনা যায়, বরদরাজস্বামী প্রসন্ন হয়ে কুরেশস্বামীর দৃষ্টি ফিরে দিয়েছিলেন।

শঙ্কর ও রামানুজ এখানে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। তার আগে এখানে ছিল বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র। এক সময় তথাগত বুদ্ধ এখানে এসে কিছুদিন ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তারপর সম্রাট্ অশোক এখানে মঠ ও মন্দির তৈরী করে দেন। ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত ভিক্ষু ধর্মপাল এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং যখন এ দেশে আসেন তখন কাঞ্চীপুর ছিল বৌদ্ধদের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। ভারতের নানা স্থান থেকে এখানে ভিক্ষুরা আসতেন। কাঞ্চীপুরের সমৃদ্ধিও ছিল খুব। এখানকার লোকেরা তখন বিশেষ ভাবে ধর্মচর্চা করতেন, জ্ঞানে ও বিদ্যায় তাঁরা শ্রেষ্ঠ, বিক্রমেও কম ছিলেন না। কাঞ্চীপুরই তখন ছিল দ্রাবিড় রাজ্যের রাজধানী।

তারপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য গেল। এলেন রামানুজম্, এলেন শঙ্কর আচার্য। বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের কেন্দ্র হলো কাঞ্চীপুর।

তারপর কতদিন চলে গেছে,—কত শতাব্দী, কত যুগ। এখন কাঞ্চীপুরের সে গৌরবের দিন অতীতের স্মৃতি মাত্র। সেই স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কাঞ্চীপুরের শিল্পীরা। মন্দিরে মন্দিরে পাথরের গায়ে গায়ে তাঁরা রেখে গেছেন অপূর্ব শিল্পকলা। নিজেদের নাম তাঁরা কোথাও রেখে যান নি. দেবতার নামে তাঁরা শিল্পকে নিবেদন করে গেছেন—একটা জাতির, একটা যুগের সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসাবে। প্রতিটি মূর্তি যেন বলছে—শিল্পীকে জানার দরকার নেই, জেনে রাখো সেই জাতিকে, যার মাঝে এই শিল্পী জন্মেছিলেন। সেই জাতির সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞানকে দেখো, তার রুচি-বোধকে চেনো। জাতির সংস্কৃতি কত বড় হলে এত ভাল শিল্প গড়ে উঠতে পারে তা ভেবে দেখো। মনে রেখো, এ সবই দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত, শিল্পী নিজেকে নিঃস্ব করে নিবেদন করে গেছেন দেবতার চরণে। এখানে শিল্পী তাঁর এই সৃজনের চেয়ে অনেক বড়।

এক এক ঘণ্টায় এক একটি মন্দির দেখে তো আমরা শেষ করলাম। কিন্তু সত্যিই সে মন্দির এত শীঘ্র দেখে শেষ করার মত মন্দির নয়। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে দেখলেও এর শিল্পকলা ফুরাবার নয়। যা একবার দেখা হয়েছে তার কাছে আবার ফিরে এলে আগের চেয়েও মুগ্ধ হতে হয়। থামের পর থাম, শত শত থাম। থামগুলি যেন হাতে করে ছেনি দিয়ে কাটা হয় নি, যেন কেউ পাথরকে ঢালাই করেছে, থামের গায় প্রতিটি পদ্ম একই মাপে, একই ধারায় আঁকা, নিখুঁত—অপূর্ব। দেয়ালে খোদিত এক একটি মূর্তির ভঙ্গিমা না দেখলে কথায় বোঝানো যায় না। পাথরের মূর্তি থেকে ফুটে উঠেছে ক্রোধ, করুণা, সৌম্যভাব। শিল্পী শুধু হাত দিয়ে গড়েন নি, শিল্পী অন্তর দিয়ে গড়েছেন। সেই জন্যই বুঝি এই চারুকলার পানে তাকালে অন্তরে ছোঁয়া লাগে। মনে পড়ে—

"বাঁধনে যারে বাঁধিতে নারে, বন্দী করি তারে
তোমার হাসি সমুচ্ছ্বাসি উঠিছে বারে বারে।
অমর আলো হারাবে না যে
পালিছে তারে আঁধার মাঝে,
নিশীথ-নাচে ডমরু বাজে, অরুণদ্বার খোলে
জাগে মূরতি পুরানো জ্যোতি নব উষার কোলে।"

ভাল লাগলেও সময় নেই। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক বললেন— তাড়াতাড়ি চলুন, পক্ষীতীর্থে পৌঁছতে দেরী হলে সেখানকার আসল ব্যাপারই দেখতে পাবেন না।

সভ্য মানুষ আমরা, ঘড়ি হাতে বেঁধে চলি, সময়ের নিরিখে জীবনকে হিসাব করে যাই; মনেরও ওজন মাপা হয় ঘড়ি দিয়ে। অনুভূতির চেয়ে সময়সূচী বড়। কাজেই সকলে তাড়াহুড়া করে বাসে গিয়া উঠি। ছ'খানি বাস্ কাঞ্চীপুরম্ পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে। তাল-বনের আড়ালে হারিয়ে যার গোপুরমের চূড়াগুলি।

পক্ষীতীর্থ।—

পক্ষীতীর্থে শিল্প নেই। আছে পাহাড়ের মাথায় একটি সাধারণ মন্দির। আর আছে দু'টি পাখীর খ্যাতি।

দু'টি পাখী প্রত্যহ বেলা বারোটার সময় এখানে ভোগ খেতে আসে। পাখী দু'টি নির্দিষ্ট সময়ে উড়ে আসে, পুরোহিতের হাত থেকে ভোগ খায়, তারপর আবার উড়ে চলে যায়। কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, তাই নিয়ে নানা জনে নানা কথা বলে। পুরোহিতেরা বলেন—দু'জন যোগীপুরুষ দেবতার শাপে শকুনি হয়ে জন্মেছেন। তাঁরা জাতিস্মর, তাই সাধারণ শকুনির মত পচা মাংস খান না, প্রত্যহ আসেন এই পাহাড়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে আর প্রসাদ খেতে। এঁরা আসেন বারাণসীতে গঙ্গায় স্নান করে, আর প্রসাদ খেয়ে চলে যান রামেশ্বরে রাত্রিবাস করতে। কিন্তু যদি কেউ প্রশ্ন

করে যে, 'এঁরা যে যোগীপুরুষ তা জানলে কি করে বাপু? ঠিক বেলা বারোটার সময়েই এরা আসবে আর এদেরকে ভোগ খেতে দিতে হবে, এ কথাই বা তোমাদের বললো কে?'—এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না।

তবে পক্ষীতীর্থের এই ব্যাপারটা বহুকালের, অনেক বিদেশীও এই ব্যাপারটা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে গেছেন।

যাক্ সে কথা, আমরাও চলেছিলাম এই বিস্ময়কর ব্যাপারের দর্শনেচ্ছু হয়ে।

পাহাড়ের নীচেই একটি নগর। নগরটির নাম ত্রিকুলকুণ্ডরম্।

আমাদের বাস এসে থামলো পাহাড়ের নীচে। সামনেই খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে পাহাড়ের মাথা অবধি। এই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। পাহাড়ের মাথায় পাখী আসবে প্রসাদ খেতে।

সিঁড়ির মুখেই এক ফটক। ফটকে পাণ্ডা রুখলো,—টিকিট আছে?

দেখলাম, একজন টিকিট বিক্রী করছে বটে! সবাই ছুটলো তার কাছে। সবাই তাড়াতাড়ি টিকিট চায়। শ'-দেড়েক লোক হুড়োহুড়ি করে। যে টিকিট বেচছে সে হাঁপিয়ে ওঠে। আমরা বাঙালী, শৃঙ্খলা বজায় রাখার বালাই আমাদের কোনখানে নেই, এখানেও সবাই একসঙ্গে হেঁট হয়ে টিকিট কিনতে গিয়ে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি বেধে গেল। মহিলারা তো ভীড় দেখে এগোতেই সাহস করলেন না। শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তী মশাইও ব্যাপার দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন, বললেন—আমার পক্ষে তো অসম্ভব!

বন্ধুবর দ্বিজেন গুপ্ত কিন্তু এত সহজে হটবার পাত্র ন'ন। বলেলেন—হবে না কী!

ভীড়ের মধ্যে তিনি ঢুকে গেলেন, একটু পরেই দেখি কয়েকখানি টিকিট নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। বললেন—দু' পয়সা করে টিকিট, কিন্তু দিতে হলো এক আনা করে, ওর কাছে নাকি খুচরা নেই!

যাক্, প্রবেশপত্র দেখিয়ে আমরা উঠতে সুরু করলাম।

কিন্তু যতখানি উৎসাহ নিয়ে উঠতে সুরু করেছিলাম, সে উৎসাহ বেশীক্ষণ রইল না। খাড়াই সিঁড়ি, একটির পর একটি উপরে উঠে গেছে। খানিকটা উঠলেই হাঁটু কন্‌কন্ করে, বুকে হাঁপ ধরে। তবে মাঝামাঝি ওঠার পর খানিকটা চত্বরের মত আছে, সেখানে খানিক জিরিয়ে নিলাম। খগেন মিত্র মশাই বললেন,—তোমরা ওঠো, আমি পিছনে যাচ্ছি।

পূর্ণ বাবু ও নরেন বাবু তার আগেই পিছিয়ে পড়েছেন।

সময় আর হাতে নেই, পাখী দেখবই। কাজেই দ্বিজেন বাবু ও আমি আবার উঠতে সুরু করলাম।

পাঁচশ'-সাঁইত্রিশটি সিঁড়ি অতিক্রম করে বরাবর গিয়ে উঠলাম পাহাড়ের মাথায়। সেখানে তখন রীতিমত ভীড় জমে গেছে। পাখী এসে গেছে প্রসাদ খেতে। একটি চত্বরের উপর বসে আছেন একজন পুরোহিত, তাঁর পাশে প্রসাদ ও জলের পাত্র। হু'টি চিলের মত শাদা পাখা সেই পাত্র থেকে ঠুক্‌রে ভোগ খাচ্ছে। মিনিট খানেকের মধ্যেই খাওয়া শেষ করে পাখী হু'টি আকাশে উড়লো, চক্রাকারে পাহাড়টির উপর এক পাক ঘুরেই তারা উড়ে চলে গেল দূরে।

তারপর সুরু হলো পাখীর ভোগ বিতরণের পালা।

আমরা চারিপাশে তাকিয়ে দেখলাম। মাথার উপর মেঘমুক্ত নীল আকাশ। নীচে নগরকে ঘিরে দিগন্তবিস্তারী তাল আর নারিকেল গাছের সারি। দূরে ঘন নীল সাগরের রেখা। তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে, মনে হয় অনন্ত করুণাময়ের স্নেহ যেন স্পর্শ করে যাচ্ছে বাতাসের প্রতি ঝাপ্‌টায়।

কয়েকটি সিঁড়ি নেমে এলেই মন্দির। শিব-মন্দির। বেদগিরীশ্বর। আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। বড্ড অন্ধকার। সহজে কিছুই ঠাহর করা যায় না। ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে, কিন্তু সে আলো নয়। ভিতরে কালো পাথরের একটি শিবলিঙ্গ। মন্দিরের গায়ে

নানা মূর্তি খোদাই করা আছে, কিন্তু অন্ধকারে সে সব আর ঠাহর হলো না। মন্দিরে একটি জানালা আছে, সেখান থেকে দিগন্ত অবধি দেখা যায়।

এই মন্দির সম্বন্ধে একটি গল্প আছে ঃ

এক সময় দেবাদিদেব মহাদেব এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন, নন্দী পাহারা দিচ্ছিলেন। সেই সময় গরুড় এলো। নন্দী বললেন—এখন দেখা হবে না।

গরুড় বললেন—বিষ্ণু আমাকে পাঠিয়েছেন।

নন্দী সে কথা শুনলেন না।

গরুড় তখন সেইখান থেকেই মহাদেবকে ডাকতে লাগলেন। ভক্তের ডাক, মহাদেবের কানে গিয়ে পৌঁছালো। মহাদেব বেরিয়ে এলেন। গরুড় তখন মহাদেবকে সব কথা নিবেদন করলেন— মহাদেব ক্রুদ্ধ হলেন, নন্দীকে শাপ দিলেন।

নন্দী তখন শাপমোচনের জন্য সেইখানে তপস্যা সুরু করলেন। দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করে তিনি শাপ মুক্ত হলেন।

সেই থেকে এই পাহাড়ের নাম বেদগিরি।

প্রবাদ আছে যে এখানে ইন্দ্রও নাকি এক সময় তপস্যা করতে এসেছিলেন এবং তাঁর মনস্কাম সিদ্ধ হয়েছিল। সেই থেকে প্রতি বারো বছর অন্তর তিনি নাকি একবার করে আসেন এখানে বেদগিরীশ্বরের পূজা করতে। সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখতে পায় না বটে, কিন্তু তাঁর আগমন জানা যায় ঘন ঘন মেঘের গর্জনে ও বার বার বজ্রপাতে।

এবার আমরা নামতে সুরু করলাম।

ওঠার চেয়ে নামা অনেক সহজ।

নামতে নামতে দেখি আমাদেরই দলের একজন সিঁড়ির উপর

শুয়ে পড়েছেন। উঠতে তিনি পারেন নি, বুকে কষ্ট হচ্ছে। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে হাওয়া করছেন। একটু জল পান করলে তিনি সুস্থ হতে পারতেন, কিন্তু জল সেখানে কোথায়? আমাদের সঙ্গে কয়েকজন নীচে ছুটলেন,—তাঁকে নামিয়ে নেওয়ার জন্য একটা ডুলি চাই।

আমরা নীচে নেমে এলাম। একটু পরেই আমাদের বাস ছাড়লো।

কিছু দূর যাবার পর হঠাৎ খগেন বাবু বললেন—দেখ তো, ওই পাখীটার পানে!

বাইরে জঙ্গলের কোলে পথের পাশে একটি শাদা পাখী, চিলের মত। আমরা অবাক হয়ে গেলাম। ওই রকম পাখীকেই তো দেখে এলাম পক্ষীতীর্থে প্রসাদ খেতে। বারানসী থেকে রামেশ্বর অবধি যিনি যাতায়াত করেন, তাঁর তো এখানে নামার কথা নয়! তবে?

খগেন বাবু বললেন—ওগুলো সী-গল্। আমরা সমুদ্রতীর ধরে চলেছি, অমন পাখী এখানে আরও অনেক দেখবে।

কথাটা মিথ্যা বলেন নি, ওই জাতের পাখী পরে পথে আরও অনেক দেখেছিলাম—অসংখ্য বলা চলে।

আর, যথাসময়ে পক্ষীতীর্থে দু'টি মাত্র পাখী এসে প্রসাদ খাওয়ার রীতি সম্পর্কে পরে এক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনি বলেন—ওই পাখীকে খাওয়াবার পাণ্ডা আলাদা, ওরাই ভোগ তৈরী করে। আমাদের ধারণা ওই ভোগে আফিম দেওয়া হয়, আফিমের নেশায় পাখী দু'টি নিয়মিত ছুটে আসে। ওদের আসার ঘড়ি-ধরা নিয়ম-কানুন কিছু নেই। মন্দিরের কাছেই থাকে, ভোগ নিয়ে পুরোহিত এসে বসে, ওদের চোখে পড়লেই ওরা ছুটে আসে। অন্য পাখী আসে না, কারণ তারা মানুষকে ভয় করে। যে দু'টি আসে, আফিমের নেশা তাদের ভয় কাটিয়ে দিয়েছে।

ভদ্রলোকের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু ভক্তির ব্যাপারে বিশ্বাস

ও যুক্তি কোন দিনই মেলে না। ভক্তেরা বলেন—বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।

এবার গন্তব্য মহাবলীপুরম্।

পক্ষীতীর্থ থেকে আমরা বরাবর এলাম চিংলিপেট। বড় স্টেশন। স্টেশনের হোটেলটিও বড়। সেইখানে আমাদের আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল।

কিন্তু যত বড় হোটেলই হোক্, দেড়শো লোককে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ানোর মতো স্থান সঙ্কুলান করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাই দু'বারে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হলো। তবু প্রথম বারে কারা বসবে তাই নিয়ে আবার সেই তাড়াহুড়া দেখা দিল আমাদের মধ্যে। শৃঙ্খলাহীনতা ও শালীনতার অভাব একান্ত দৃষ্টিকটু হ'য়ে উঠলো। মনে হলো, আমরা যেন একটী প্রতিযোগিতায় নেমেছি,—যে আগে বসতে পারবে তারই জিত্। আমরা ক'জন এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। অর্ধেক লোককে পরের বারে খেতে হবে, আমরা না-হয় সেই অর্ধেকের সঙ্গেই রইলাম, একটা বিসদৃশ হুড়োহুড়ির সৃষ্টি করি কেন। বাংলার বাইরে বাঙালীর এই বিশৃঙ্খল প্রকাশটা যে বড়ই দৃষ্টিকটু!

এইখানেই এই প্রথম আমরা খেলাম মাদ্রাজী খানা। তিনদিন আমরা ছিলাম মাদ্রাজে, আহার্যাদি তৈরী হ'য়েছিল বাঙালীর তত্ত্বাবধানে, বাঙালা রীতিতে। এখানে তো আর সে ব্যবস্থা নেই। এখানে আমরা খেলাম ভাত, ডাল, আনাজ-দিয়ে-রাঁধা ডাল, ভাজি, পাঁপড়, দই আর চাট্‌নি—সবেতেই তেঁতুল দেওয়া। নারিকেলও দেওয়া আছে। আর দইকে ঘন ঘোল বললেই ভাল হয়। পাঁপড় নারিকেল-তেলে ভাজা, তবে স্বাদে কি গন্ধে তা বোঝা যায় না। খেতে আমাদের একটু কষ্ট হলো বটে, কিন্তু খিদের মুখে কিছুই পাতে পড়ে রইল না।

পরে অবশ্য মাদ্রাজী খাদ্যের সঙ্গে আমরা রীতিমত রপ্ত হ'য়ে গিয়েছিলাম।

চিংলিপেটে আর বিশ্রাম করা চললো না, একেবারে আমরা বাসে গিয়ে উঠলাম। তাল, নারিকেল, তেঁতুল গাছের ছায়া দিয়ে, কখনো পাহাড়ের পাশ দিয়ে, কখনো বা গ্রামকে পাশ কাটিয়ে বাস্ ছুটলো।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছুলাম সাগরের তীরে—মহাবলীপুরমে।

মহাবলীপুরম্ দৈত্যরাজ বলির রাজধানী ছিল। এখানকার সমুদ্রতীরে ঋষি পুণ্ডরীক দীর্ঘকাল বিষ্ণুর তপস্যা করেন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হয়ে শায়িত অবস্থায় তাঁকে দেখা দেন। বলিরাজ সেই শয়ান-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে এখানে মন্দির তৈরী করেন। এখানেই বলিরাজার রাজধানী গড়ে ওঠে।

বলিরাজা ছিলেন খুব দানশীল। যে যা চাইত তাকে তাই দিতেন। তাঁর দানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল স্বর্গ মর্ত্য পাতালে। এজন্য তাঁর অহঙ্কার হ'য়েছিল খুব।

এই অহঙ্কারই তাঁর কাল হলো।

তাঁর এই অহঙ্কার খর্ব করার জন্য একদিন এক বামন এলেন তাঁর রাজসভায়। বললেন,—মহারাজ, আপনি প্রবল পরাক্রান্ত, আপনি অতি দানশীল, আপনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর! আমি আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করি।

বলিরাজ হাসলেন, বললেন,—আপনার কি চাই?

—আমাকে ত্রিপাদ ভূমি মাত্র ভিক্ষা দিন।

—মাত্র তিন পদ জমি! নিশ্চয়ই দেব। যেখানে ইচ্ছা তোমার পদ রাখো, সেই জমিই তুমি পাবে।

বামন হাসলেন। দেখতে দেখতে বামনের পা দু'খানি বিরাট

হ'য়ে গেল। এক পা তিনি রাখলেন মর্ত্যে, মর্ত্য ঢাকা পড়ে গেল। আরেক পা তিনি রাখলেন স্বর্গে, স্বর্গ ঢাকা পড়ে গেল। বামন বললেন,—মহারাজ, আরেক পা কোথায় রাখি ?

বলিরাজ দেখলেন, ত্রিপাদ-ভূমি দিতে হবে, দ্বি-পাদ তো হ'য়েছে, আরেক পদ রাখবার স্থান কোথায় ? কিন্তু সত্য তো ভঙ্গ করা যায় না! বলি তখন মাথা পেতে দিলেন, বললেন,—আরেক পদ আমার মাথায় রাখুন।

বামন বলির মাথার উপর এক পা রাখলেন। সে পায়ের ভার বলি সইতে পারলেন না, বরাবর নেমে গেলেন পাতালে।

নারায়ণ বামনের রূপ ধরে বলির দর্প চূর্ণ করলেন।

বলির তো শেষ হলো, তাঁর ছেলে বাণ হলেন এই মহাবলী-পুরমের রাজা। সে মহাভারতের যুগের কথা।

দৈত্যরাজ বাণের এক কন্যা ছিল, উষা। উষার রূপ-গুণের খ্যাতি ছিল। সেই খ্যাতি শুনে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ তাঁকে বিয়ে করবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি জানতেন যে বাণ অসুর কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের নাতির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হবেন না। তাই অনিরুদ্ধ ছদ্মবেশে এলেন মহাবলীপুরমে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সুবিধা বুঝে উষাকে চুরি করে নিয়ে যাবেন দ্বারকায়; সেখানে বিয়ে হবে। সে যুগে এই রকম অনেক হতো।

কিন্তু বাণাসুর কেমন করে যেন টের পেয়েছিলেন। তিনি অনিরুদ্ধকে ধরে ফেললেন। কিন্তু অনিরুদ্ধ সহজে ধরা দিলেন না। তুমুল লড়াই হলো। কিন্তু বাণাসুর লড়াই করতেন হাজার হাতে, অনিরুদ্ধ তাঁর সঙ্গে পারবেন কেন ? বাণ তাঁকে কারারুদ্ধ করলেন।

খবর গিয়ে পৌঁছালো শ্রীকৃষ্ণের কাছে, পূর্বের সমুদ্রতীর থেকে পশ্চিমের সমুদ্রতীরে। দ্বারকা থেকে শ্রীকৃষ্ণ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ছুটে এলেন নাতিকে উদ্ধার করতে। যাদব-সেনা মহাবলীপুরম অবরোধ করলো।

বাণাসুর ছিলেন শিবভক্ত। শিবের পূজা করে তিনি যুদ্ধে নামলেন। তুমুল যুদ্ধ হলো। কিন্তু শেষ অবধি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাণ পেরে উঠলেন না। চক্রবাণে শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের ৯৯৮ খানি হাত কেটে ফেললেন, হাজার হাতের দু'খানি মাত্র হাত রইল—শিব-পূজার জন্য।

এই সব পৌরাণিক কাহিনী থেকে এই কথাটুকু বেশ বোঝা যায় যে মহাবলীপুরম্ আজকের নগর নয়, বহুপ্রাচীন।

এই নগরীর সমৃদ্ধি সম্পর্কেও আর এক পৌরাণিক কাহিনী আছে।—

বলিরাজার বংশে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম মালতি। পাহাড়ের কোলে রাজার একটি বাগান ছিল। একদিন রাত্রে রাজা বাগানে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় দেখেন কি, ঝর্ণার ধারায় দু'টি মেয়ে স্নান করছে। অবাক্ হ'য়ে গেলেন,—এরা তো রাজবাড়ীর কেউ নয়, এরা তবে কে ?

রাজা তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা কে ? তোমাদের তো এর আগে কখনও দেখি নি ?

মেয়ে দু'টি বললো—আমরা স্বর্গের অপ্সরা, আপনার এই উদ্যানটি আমাদের খুব ভাল লাগে, তাই এখানে আমরা মাঝে মাঝে আসি স্নান করতে।

সেই থেকে অপ্সরাদের সঙ্গে রাজার প্রায়ই দেখা হতো সেই উদ্যানে।

একদিন অপ্সরা দু'জন স্বর্গের এক সিদ্ধপুরুষকে নিয়ে এলেন রাজার উদ্যান দেখাবার জন্য। অপ্সরারা সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে রাজার পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাজা তাঁকে প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে ধর্মকথা আলোচনা সুরু করলেন। কথায় কথায় সিদ্ধপুরুষ স্বর্গ সম্পর্কে অনেক কথাই রাজাকে বললেন। রাজা সব শুনে সিদ্ধপুরুষকে ধরে

বসলেন—আমি একবার নিজের চোখে স্বর্গ দেখতে চাই, আপনি কৃপা করুন।

সিদ্ধপুরুষ রাজার অনুরোধ ফেলতে পারলেন না, রাজাকে লুকিয়ে নিয়ে গেলেন স্বর্গে। বিশ্বকর্মার তৈরী স্বর্গ, দেবরাজ ইন্দ্রের পুরী। দেবতারা সব থাকেন। সেই নগরীর সৌন্দর্য আর সেই পুরীর কারুকার্য দেখে রাজা তো অবাক্।

স্বর্গ দেখে রাজা তো ফিরে এলেন। তার পর নিজের রাজধানী মহাবলীপুরম্‌কে তিনি গড়ে তুললেন স্বর্গের আদর্শে—নকল করে। পাহাড়ের কোলে সমুদ্র-তীরে অপূর্ব নগরী গড়ে উঠলো।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রের কয়েকজন অনুচর একদিন আকাশপথে যেতে যেতে মহাবলীপুরম্ দেখে অবাক হয়ে গেলেন। একেবারে হুবহু নকল স্বর্গ! ফিরে গিয়ে ইন্দ্রকে বললেন,—দেবরাজ, আপনার স্বর্গের সৌন্দর্য নিয়ে আর গর্ব করবেন না। মর্ত্যে মহাবলীপুরম্ এখানকার চেয়ে অনেক ভাল হ'য়েছে।

দেবরাজ ইন্দ্র সব শুনলেন, তখনই ঈর্ষা জাগলো মনে। তখনই তিনি বায়ু, বরুণ ও বজ্র পাঠালেন মহাবলীপুরমকে ধ্বংস করতে। মহাবলীপুরমের উপর দেখা দিল উদ্দাম ঝড়, অবিশ্রান্ত বর্ষণ ও ঘনঘন বজ্রপাত। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে এলো নগর ভাসিয়া দিতে। দেখতে দেখতে স্বর্গসম মহানগরী ধ্বংসশেষে পরিণত হলো। এখন আমরা যা দেখি তা সেই ধ্বংসাবশেষ।

এই পৌরাণিক কাহিনীটি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, মহাবলীপুরম্ এক সময় একটি শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল, পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা ধ্বংস হ'য়ে যায়।

বাস থেকে নেমে আমরা গেলাম সমুদ্র-তীরে। পাহাড় কেটে অপূর্ব কারুকার্যময় মন্দির তৈরী করা হ'য়েছে। কথিত আছে, পঞ্চ-

পাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের সময় এখানে এসে কিছুকাল বাস করেছিলেন, এবং এই মন্দিরগুলি তাঁদেরই বাস করার ঘর। এইগুলিকে রথ বলা হয়ঃ অর্জুনের রথ, ভীমের রথ, ধর্মরাজের রথ, নকুলের রথ ও সহদেবের রথ। চারটি রথ একদিকে, আর অর্জুনের রথ একটু তফাতে। সামনেই একটি ভগ্নপ্রায় খিলান, তার নাম দ্রৌপদীঘাট। আরও দুটি মন্দির ছিল—শিব ও বিষ্ণুমন্দির, কিন্তু সমুদ্র তাদের গ্রাস করেছে। জলের উপর দুটি পাথর মাথা উঁচু করে আছে, ওই দুটিই নাকি সেই মন্দিরের শেষ নিদর্শন—মন্দির দুটির চূড়া।

দেখলে মনে হয় এক-একখানি পাহাড় কেটে যেন এই এক-একটি মন্দির তৈরী হ'য়েছে। প্রত্যেকখানি রথের গঠনভঙ্গী আলাদা, কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, কারুকার্যেরও পার্থক্য আছে।

সামনেই আছে একটা পাহাড়। পাহাড়টিকে দূর থেকে দেখায় মানুষের মত। লোকে বলে—এইটিই নাকি এক সময় বলিরাজার প্রস্তর মূর্তি ছিল। এই পাহাড়টির মাথায় একটি মন্দির আছে, কিন্তু সেটি অসম্পূর্ণ। সেই পাহাড়ের উপর থেকে সামনের সমুদ্র ও পিছনের মন্দিরগুলি অপূর্ব দেখায়।

মহাবলীপুরমের মনোরম মন্দিরটি হচ্ছে জলায়তন মন্দির। একেবারে সমুদ্রের উপর এই মন্দিরটি। ষাট ফুট উঁচু কালো পাথরের মন্দির, যোলো-শো বর্গ ফুট ব্যেপে প্রকাণ্ড চত্বর। এই চত্বরের চারিপাশ থেকে সমুদ্র-তরঙ্গ অবিরাম আছড়ে পড়ছে। সেই তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসকে প্রতিহত করার জন্য তিনদিকে বড় বড় পাথরের চাঁই ফেলা হ'য়েছে। ইতিপূর্বেই চত্বরের খানিকটা অংশ সমুদ্রগর্ভে চলে গেছে। মন্দিরের দীপস্তম্ভের চূড়াটি এখনও সাগরের বুকে মাথা উঁচু করে আছে দেখা যায়। বেলাভূমির উপর এই বিশাল মন্দির হিন্দু স্থাপত্যের চরম নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

এই মন্দিরটির মধ্যে শিবলিঙ্গ ও নারায়ণের অনন্ত-শয্যার মূর্তি আছে। অনেকে বলেন,—বাণাসুর ছিলেন শিবের উপাসক,

নারায়ণের কাছে পরাজিত হবার পর তিনি এই মন্দির নির্মাণ করেন। তাই শিব ও বিষ্ণু দুই মূর্তিই আছে এখানে।

এই মন্দিরের চত্বর সমুদ্রের বালিতে ঢাকা পড়ে গেছে। সেই চত্বরের শেষ প্রান্তে সাগরের কিনারায় এসে দাঁড়ালে অতি বড় মুখর লোকও মূক হ'য়ে যায়। সামনের দিগন্ত-বিস্তরী সাগরের পানে তাকিয়ে, পিছনে মানুষের অসামান্য কীর্তির পানে তাকিয়ে শুধু মনে হয়,—কি যেন হারিয়ে গেছে, কি যেন নেই, তাঁকে বোধ হয় এখানে খুঁজলে পাওয়া যায়, এখানে যেন তাঁকে ছোঁয়া যায়, সে কে, সে কী? মনে যেন কিসের একটা ঔদাসীন্য জাগে। অবচেতন মনের অন্তরে অন্তর্যামীর অস্পষ্ট অনুভূতি সাড়া জাগায়, বাইরের যে প্রকাশকে নিয়ে জীবনের এই চাঞ্চল্য সে প্রকাশকে আর বাস্তব বলে মনে হয় না।

"সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হ'তে মৃত্যুর আঁধারে
চলে যাই ভেসে,
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন্ নিরুদ্দেশে।"

বেলা শেষ হয়ে আসে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে। সমুদ্র-সৈকত ছেড়ে উঠে আসতে ইচ্ছা হয় না। মানুষের সৌন্দর্যবোধ কি অপূর্ব রূপ দান করেছে সাগর-তীরে এই কঠিন কালো পাথরের গায়। দেবতাকে উপলক্ষ করে শিল্পকলার পরিপূর্ণভাবে বিকাশ হ'য়েছে। পাথরের গায় শুধু ছবি আর ছবি। শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন ধারণের ছবি, বরাহ অবতারের ছবি, বামন অবতারের ছবি, অর্জুনের তপস্যার ছবি, অনন্ত-শয্যার ছবি, মহিষমর্দিনীর ছবি, গোষ্ঠবিহারের ছবি, পদ্মাসনা লক্ষ্মীর ছবি,—প্রতিটি ভাস্কর্য এতকাল পরেও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। রং নেই শুধু রেখার পর রেখা রঙের চেয়ে দীপ্তিমান হয়ে আছে। কঠিন পাষাণকে রূপময় করে গেছে শিল্পীর রূপদৃষ্টি ও সৌন্দর্যবোধ।

এই মহাবলীপুরম্‌ই ভারতের প্রাচীনতম মন্দির। কেউ বলেন—ষষ্ঠ শতকে এটি তৈরী হয়েছিল, আবার কেউ বলেন—তারও আগে। এখানে নাকি শিল্পের দু'টি ধারা এসে মিশেছে,—দ্রাবিড় ও আর্য। দেবতা ও অসুর, আর্য ও অনার্য শিল্পবোধ এক সঙ্গে এসে মিশেছে সৌন্দর্যের সাধনায়।

মন ছুটি পেয়েছিল কিন্তু সময় ছুটি দেয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক আমাদের ডাকতে এলেন,—আর দেরী করলে ফিরতে রাত হবে। ছ'টার মধ্যে ফিরে যাবার কথা।

আমরা বাসে এসে উঠলাম। বাস্ একটি পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হলো। এই পাহাড়টির গায়ে নানা মূর্তি খোদাই করা আছে। মূর্তির ভীড়। অনেক মূর্তি সম্পূর্ণ, অনেক আবার অসম্পূর্ণ। মনে হয় মূর্তিগুলি যেন সেদিনের খোদাই করা—এইমাত্র শিল্পী কাজ করতে করতে বুঝি উঠে গেছেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী বললেন,—এখানে পাহাড়ের গায় অসম্পূর্ণ মূর্তি অনেক আছে। তা দেখে অনেকে অনুমান করেন যে এখানে এক সময়ে হয়তো ভাস্কর-শিল্পীদের শিক্ষালয় ছিল, তাঁরা এখানে হাতে-কলমে কাজ শিখতেন। নতুন শিল্পী যখন প্রথম ছেদনী ধরতে শিখতেন তখন অনেক-কিছু শিল্পকর্ম সুরু করে তিনি আর শেষ করতেন না, নিত্য নতুন পাষাণে নতুন মূর্তি আঁকার পরীক্ষা করতেন, নিত্য-নতুন কাজে হাত দিতেন,—এগুলি তাই অসম্পূর্ণ।

হয়তো পণ্ডিতদের অনুমানই ঠিক।

বাস এগিয়ে চললো। পথের উপরে নেমে এলো রাত্রির অন্ধকার।

এবার তাঁবু তোলার পালা।

কে কোথায় যাবে এবার তারই সূচী নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কলিকাতা থেকে দু'দিন দু'রাতের পথ মাদ্রাজ। মাদ্রাজ

অবধি এসে দাক্ষিণাত্য না দেখে অনেকেই ফিরবেন না। আমাদের আগে থেকেই দেখ্য-সূচী তৈরী করে রেখেছিলেন খগেন বাবু। পরদিন সকাল থেকেই সেই সূচীমত আমাদের এগিয়ে চলার কথা। আমরা যাব রামেশ্বর হয়ে কুমারিকা অবধি।

কেউ কেউ আবার আগেই কুমারিকা অবধি ঘুরে এসে তারপর সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। 'সংহতি'র সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্র নিয়োগী তাঁদেরই একজন। রাতে তাঁর কাছ থেকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ পথের খবর জেনে নিলাম।

মুস্কিল বাধলো পূর্ণবাবু ও নরেনবাবুকে নিয়ে। পৌষ মাসে কলিকাতার বাইরে শীত একটু বেশীই হবে ভেবে তাঁরা দু'জন লেপ-তোষক শাল-আলোয়ান কোট-ওভারকোট টুপি—কিছু আনতেই বাকী রাখেন নি। এক এক জনের সঙ্গে এসেছে প্রকাণ্ড এক একটি হোল্ড-অল আর বিরাট এক একটি সুটকেশ। আর তারই সঙ্গে এসেছে ছবি-আঁকার যত সাজ-সরঞ্জাম রঙ, তুলি, বোর্ড, কাগজ। সুরেনবাবু বললেন—এসব জামা কাপড় বিছানাপত্তর কি হবে, এখানে শীত কোথায়? একখানি সতরঞ্চি, একখানি চাদর, আর গোটাদুয়েক সাদা জামাকাপড় হলেই যথেষ্ট। অনর্থক এসব বইবেন কেন? মাদ্রাজ স্টেশনে 'লেফ্‌ট্ লাগেজে'র ব্যবস্থা আছে। চাবি দিয়ে সুটকেস হোল্ড-অল সব সেখানে রেখে দিয়ে যান, ফিরে এসে নেবেন, দৈনিক এক-আনা করে মাল পিছু ভাড়া লাগবে, তবে অনর্থক কুলিভাড়া বাঁচবে অনেক।

পরদিন সকালে সুরেনবাবুর কথা মতই কাজ করা হলো। দুটি সুটকেশ জমা দিয়ে আসা হলো সেণ্ট্রাল স্টেশনের লেফ্‌ট্‌লাগেজ-এ।

সেণ্ট্রাল স্টেশন থেকে আমাদের ছুটতে হলো এগ্‌মোরে। এগমোর থেকেই দক্ষিণের গাড়ী ছাড়ে।

স্টেশনে কিন্তু মুস্কিল বাধলো ট্যাক্‌সি ভাড়া নিয়ে। মিটারে উঠলো আট আনা, ড্রাইভার চাইল—দেড়-টাকা। পুলিশ ডাকবো

বলতে, ড্রাইভার আর কিছু বললো না। শুনলাম, মাদ্রাজে নাকি ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে এই গোলযোগ হামেসাই হয়। পুলিশেরও এদিকে সজাগ দৃষ্টি আছে—ড্রাইভাররা সবসময় সুবিধা করতে পারে না, কলিকাতার মত নয়।

যাক্ সে কথা, এবার আমরা হলাম ছ'জন। আমাদের নতুন সঙ্গী হলেন 'পরিচয়' পত্রিকার দ্বীপেন বাঁড়ুয্যে, বয়স কম, কিন্তু মুখখানি সবসময়েই জ্ঞান-গম্ভীর, আর ঠোঁটে আছে সবসময় প্রকাণ্ড এক পাইপ।

এবার আমরা বরাবর যাব ধনুষ্কোটি।

পূরা একদিন একরাতের পথ।

মিটার গেজের ছোট গাড়ী। বেঞ্চি ও বাঙ্কের পরিসর কম। কিন্তু গাড়ী ছোট হলেও ভীড় তো কম হবে না। তবে আমরা ভিন্‌দেশী বলে ভীড়ের ধাক্কাটা আমাদের কম সইতে হয়।

আমাদের মুস্কিল বাধলো খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে, আমাদের ভাষা ওরা বোঝে না, ওদের ভাষা আমরা বুঝি না। শুনেছিলাম মাদ্রাজীরা নাকি সকলেই চলনসই ইংরেজি জানে, কিন্তু মাদ্রাজেই তার পরিচয় পেয়েছি।—

মাদ্রাজে একদিন ইচ্ছা হয়েছিল 'স্কুটার' চড়ার। স্কুটার হলো অটো-রিক্‌সা, অর্থাৎ সাইকেল-রিক্‌সা পেট্রলে চলে। মাইল পিছু ভাড়া চার আনা। আমি আর দ্বিজেনবাবু একদিন বিকালে একখানি স্কুটার ডেকে উঠে পড়লাম, বললাম—সেনেট হল চল।

স্কুটার ড্রাইভার তখনই গাড়ী ছুটিয়ে দিলে।

সেনেট হল সেখান থেকে হাঁটা-পথে দশ মিনিটের বেশী হবে না, কিন্তু স্কুটার দশ মিনিট চলার পরেও সেনেট হল আমাদের চোখে পড়লো না। বললাম—এ কি, কোথায় চলেছ? আমরা সেনেট হল যাব।

ড্রাইভার মাথা নেড়ে বুঝালো—ঠিক আছে!

আবার সুরু হলো স্কুটার চলা।

ছু-মিনিট চলে গেল,—সেনেট হল কোথায়?

পথের একটা লোককে ডেকে বললাম,—সেনেট হল যাব, ড্রাইভারকে পথটা বলে দাও।

সে তাদের মাতৃভাষায় কি যেন বললো, আমরা তার কিছুই বুঝলাম না, তবে এটুকু বুঝলাম যে সে ইংরেজি বোঝে না।

আর একজনকে ডাকলাম, তারও সেই অবস্থা।

এবার এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা, হাতে বই খাতা। তাকে বলতেই সে ড্রাইভারকে দেশী ভাষায় বুঝিয়ে দিলে। ড্রাইভার এক গাল হেসে বললে—ইয়েস ইয়েস, সিনেথল্—ইয়েস সিনেথল!

বুঝলাম 'সেনেট হল', সন্ধি করে দেশী ভাষায় 'সিনেথল' হয়েছে।

এক মিনিটে পথের একটা মোড় ঘুরেই ড্রাইভার আমাদের সেনেট হলের দরজায় পৌঁছে দিলে।

তখন ভাড়া উঠেছে আট আনা, বুঝলাম এক মাইলের জায়গায় আরও এক মাইল আমাদের বেশী ঘুরতে হয়েছে। ছাত্রটীর সঙ্গে, পথের মাঝে দেখা না হলে 'সিনেথলে'র জন্য আরও কত মাইল আমাদের ঘুরতে হতো কে জানে। তবে স্কুটার চাপা হলো, একথা বলতে পারি।

সেই থেকে মাদ্রাজী মাত্রেই যে কাজ-চলা-গোছ ইংরেজি জানে সে বিশ্বাস আর নেই।

মনের মত এক সহযাত্রী মিলে গেল ভেলুপুরমে। শ্রী রেড্ডী। মানুষটি রীতিমত শিক্ষিত। তাঁর কাছ থেকে কথায় কথায় জেনে নিলাম কয়েকটি বাংলা শব্দের মাদ্রাজী পরিভাষা। অন্ততঃ শব্দটা শুনে সাধারণ লোকে যেন বুঝতে পারেঃ

জল—জলম্, তান্নীড়। ভাত—স্বাদম্। রুটি—বালাই পালেন।

ডাল—পারুপু। আলু—উরলেক কেরাংগু। নুন—উপু। চিনি—সর্করম্। মিঠাই—তিতিপু। দই—তায়ের। নেবু—এলিমিচান পালম্। ফল—ফলম্। নারিকেল—তাঙ্গাই এনাই। তেঁতুল—পুলাই। স্নান—স্নানম। ভোজন—সাপড়। ফুল—পুষ্পম্। পথ—ওয়েলি। ভাড়া—চার্জ। নস্যি—পোডে।

রেড্ডী আমাদের সঙ্গে দিব্যি গল্প জমিয়ে তুললেন। স্টেশনে গাড়ী থামলেই আমরা যখনই যা কিনতে চাই, তিনি মাঝে পড়ে দেশী ভাষায় দর-দাম করে কিনে দেন। একটি স্টেশন থেকে আমরা কয়েকগাছি আখ কিনলাম। ছুরী দিয়া মোটা আখ কাটা মুস্কিল, তার উপর খাব পাঁচ জন, ছুরী একখানি। এক কৃষাণী বসেছিল সামনের বেঞ্চে, ভাষা না বুঝলেও সে আমাদের মনোভাব বুঝলো, আখগুলি নিয়ে সে এমন ভাবে গোড়াগুলি ঠুকে দিলে যাতে সহজেই দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে আমরা খেতে পারি। খগেনবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বললেন—দেখ, আমরা বুড়ীর ছেলের মত, সে ঠিক বুঝেছে আমাদের কোথায় বাধছে, সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে মায়ের মত। মানুষের মন সর্বত্রই এক রকম।

রেড্ডী কিন্তু এতটা উৎফুল্ল হলো না। নীচ জাতের মানুষ আমাদের ভোজ্যে হাত দিয়েছে দেখে তিনি ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। মুখখানি গম্ভীর হয়ে গেল।

খগেনবাবু বললেন—আমাদের পক্ষ থেকে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিন।

রেড্ডী তেমন উৎসাহ দেখালেন না, বললেন—মূর্খ স্ত্রীলোক, ওসব বুঝবে না।

আমরা বুঝলাম রেড্ডীর সংস্কার মানুষকে যোগ্য মর্যাদা দিতে চায় না। শিক্ষা তাঁর সংস্কারকে জয় করতে পারে নি। বিভেদবোধ মনুষ্যত্বকে খর্ব করেছে।

ট্রেন চলছে। পূর্ণবাবু ও নরেনবাবু অবিরাম এঁকে চলেছেন

পেন্সিল-স্কেচ। যারা এসে সামনের বেঞ্চে বসছে, তাদেরই মুখের ছবি উঠছে দু'জনের স্কেচ-বুকে।

স্কেচ করার ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণবাবুর মুখ চলছে। যখনই কোন স্টেশনে গাড়ী এসে থামছে পূর্ণবাবু একবার দেখে নিচ্ছেন, সেখানে স্থানীয় খাদ্য কিছু পাওয়া যায় কি না—ফেরিওয়ালা কি ফিরি করছে তার ঝুড়িতে। দু'চার আনা কিনে ফেলছেন তখনই। আমাদেরকে কিছু কিছু দিয়ে নিজে চিবুতে সুরু করছেন। ঠোঙ্গা খালি করে বলছেন—বাইরের জিনিষ কিছু না খাওয়াই ভাল, বিদেশ-বিভূঁয়ে একটা অসুখ-বিসুখ হলো কে দেখবে?

কিন্তু দু-একটী স্টেশন পরে আবার তিনি গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন জানালার ধারে,—সেখানকার নতুন খাদ্য কি আছে ডাকবেন।

সকাল থেকেই দেখা গেল ঘন তাল ও নারিকেল গাছের সারির মধ্যে বড় বড় প্রজাপতির ঝাঁক! কালো ডানায় শাদা চক্র—সব রঙের গোড়া ও শেষ এসে মিলিছে বুঝি তাদের ডানায়, তাই অন্য হাল্কা রঙের বাহার নেই। সামনে নীলাভ জলরেখা। আর তারই কোলে সবুজ আগাছার বন।

ক্রমশঃ দু'পাশ থেকে সমুদ্র এগিয়ে এলো, একেবারে সামনে। আর পথ নেই।

ট্রেন এসে থামলো মণ্ডপম্ স্টেশনে। ভারত মহাদেশের ভূখণ্ড এখানেই শেষ।

ছোট স্টেশন। দু'পাশে লাল টালির ঝক্ঝকে-তক্তকে বাড়ী, ছড়ানো তালগাছ, আর নীলাভ সমুদ্র। মনে হয়, বিলাতের কোন গ্রামের ছবি যেন বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এবার সুরু হলো সেতু। সেতুবন্ধের সেতু। সমুদ্রের উপর দিয়ে দীর্ঘ প্রায় দু' মাইল সেতু। এই সেতু ভারতের সঙ্গে রামেশ্বর দ্বীপকে যুক্ত করেছে। দু'পাশে অনন্ত সমুদ্র, মাঝে দু'সারি থামের উপর দু'টি লোহার রেল-লাইন পাতা, মনে হয় জলের উপরেই যেন

ট্রেনখানি ভাসছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করলেই দেখা যায় লাইনের আট-দশ হাত নীচে লাইনের তলা দিয়ে চলেছে একটী প্রশস্ত পাথরের পথ দুর্গপ্রাকারের মত। কোন রকমে জল যদি আট-দশ হাত কমিয়ে ফেলা যায়, তাহ'লে সেই পথের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে যাওয়া যায় ওদিকের দ্বীপে। এখান থেকেই নাকি শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা যাবার সেতু বাঁধা হয়েছিল। ভাল করে ঠাহর করলে মনে হয় এ যেন সত্যিই কেউ তৈরী করেছে—পাথরের এক ফালি ক্রোশখানেক পথ, প্রকৃতির সৃষ্ট কোন যোজক নয়।

দু'পাশের অনন্ত জলরাশির পানে তাকালে বিস্ময় জাগে—ট্রেনের নীচ দিয়ে ছল ছল করে এ-সাগরের ঢেউ চলে যায় ও-সাগরে। মনে শঙ্কা জাগে, যদি এখনি একটা বড় ঢেউ এসে ধাক্কা দেয়, যদি সামনের লাইনটাকে ভাসিয়ে দেয়, তা হলে এই অনন্ত জলরাশির মধ্যে আমরা কোথায় হারিয়ে যাব!

সাগরে তখন রঙের খেলা চলেছে। একদিকে সাগর ঘন সবুজ, আরেক দিকে ঘননীল। সাদা পাল তুলে নৌকার সারি চলেছে বকের ঝাঁকের মত। সী-গল উড়ছে তীরের কাছে, মাঝে মাঝে ছোঁ মারছে জলের উপর। কয়েকটি প্রজাপতি উড়ে উড়ে চলেছে ট্রেনের পাশ দিয়ে, কামরার এক জানালা দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে যাচ্ছে আরেক জানালা দিয়ে।

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে, সুন্দর!
পুণ্য হোলো অঙ্গ মম, ধন্য হোলো অন্তর;
সুন্দর হে, সুন্দর!
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি
হৃদ্‌গগনে পবন হলো সৌরভেতে মন্থর;
সুন্দর হে, সুন্দর!"

ওপারে পামবান স্টেশন।

তারপর গাড়ী ছুটলো কেয়াবনের মাঝ দিয়ে। সাগরের বাতাসে

ভেসে আসতে লাগলো মৃদু মধুর কেয়াফুলের গন্ধ। দু'পাশে শুধুই বালি। কখন বা বিস্তীর্ণ অগভীর জলাশয়। মনে হয়, সমুদ্র যেন রেলপথের পাশে পাশে ছুটছে। হাজার হাজার সামুদ্রিক পাখীর মেলা সেই জলাশয়গুলির ধারে। জলাশয় যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে লতায় ঢাকা ছোট ছোট বালিয়াড়ি। লতাগুলি নীল রঙের ফুলে ফুলে ফুলময়। সেই ফুলের কোল দিয়ে উড়ে যাচ্ছে প্রজাপতির ঝাঁক। সমুদ্রের কোলে শান্ত স্বপ্নময় অনুভূতিপ্রবণ পরিবেশ।

গাড়ী এসে থামলো ধনুষ্কোটিতে।

ছোট স্টেশন। স্টেশনের চারিপাশে অল্প কয়েকখানি বাড়ী, তারপরেই দীর্ঘ ক্রোশ খানেক ব্যেপে বালুকাময় সৈকতভূমি।

স্টেশনে লাগেজ রাখবার ব্যবস্থা আছে। কুলিরা সবাই বিশ্বস্ত, তারাই এখানকার লাগেজের জিম্মাদার। এক কুলির কাছে লাগেজগুলি জমা করে দিয়ে, গামছা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্র-স্নানে।

স্টেশনের বাঁধানো প্ল্যাটফর্মটুকু পার হয়েই বালি। গভীর বালি। ভারত মহাসাগরের যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত বালুকারাশির সৈকতভূমি। প্রতি পদক্ষেপে পাঁচ-ছ' ইঞ্চি করে পা বসে যায়। কোন মতেই তাড়াতাড়ি যাওয়া চলে না। তাড়াতাড়ি চলতে গেলে পায়ে ব্যথা ধরে। মাইল খানেক পথ যেতে লাগে আধ ঘণ্টারও বেশী।

সমুদ্রতীরে গোটা চারেক 'ঝোপ্‌ড়ি' আছে। ছিটে-বেড়ার ঘর, মাথার উপর এক একখানা দরমা ফেলে ছাদ করা আছে। দু'টি ঘরে আছে দু'খানি কফির দোকান। আর দু'খানি ফাঁকা, যাত্রীদের আশ্রয় শিবির হয়তো। সামনে বসে আছে পাণ্ডা, নারিকেল কলা আর কিছু ফুল নিয়ে। তর্পণ করে সাগরে নারিকেল ও পয়সা অর্ঘ দিয়ে তারপর স্নান করতে হয়। আনা পাঁচেক পয়সা লাগলো ডাব ও কলা কিনতে। পাণ্ডা সেগুলির সঙ্গে দিল একটি খেলা-ঘরের তীরধনু। মন্ত্র পড়ে অর্ঘ দিলাম। শিব ও রামচন্দ্রের পূজা এক

সঙ্গেই হলো। তারপর সেই নারিকেলটি হাতে নিয়ে সাগরের জলে অর্ঘ দিয়ে স্নান করলাম।

জলের গভীরতা কম। কোন উচ্ছ্বাস নেই। অনেকখানি এগিয়ে তবে বুক অবধি জলে পৌঁছানো যায়। ঢেউও কম। যেন একখানি নীল চাদর বিছানো আছে দিগন্ত অবধি, চাদরখানি একটু কাঁপছে, সামান্য দুলছে। তবে সামনে বিপুল অসীমতার পানে তাকিয়ে মনটা ছম্ ছম্ করে ওঠে। বিরাট নীলিমার মাঝে হারিয়ে যাবার শঙ্কা জাগে। তবু সমুদ্র, কেন জানি না, কেমন যেন আকর্ষণ করে। স্তব্ধ নিঃসীম সমাহিত শান্তি দেহ-মনকে আবিষ্ট করে, সম্মোহনের আবেশ প্রতি পদক্ষেপে যেন ডাকে—এসো এসো, নেমে এসো গভীরে, ডুব দাও অতলে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম অনেকখানি। দেখি পিছনে কেউ নাই। ধীরে ধীরে ডুব দিলাম। অনন্তের বিশালতা যেন ছুঁয়ে গেল, মহান্ বিরাটের নিবিড় স্পর্শ পেলাম বুঝি!—একটি মুহূর্ত বিশ্বনিয়ন্তার নীরব পারাবারের মধ্যে সব চিন্তা সব চঞ্চলতার সমাপ্তি-বোধ জাগিয়ে গেল, সে এক বিশেষ মুহূর্ত—আনন্দ ভয় চিন্তা ও দুঃখের সর্ব মুক্তির মহা মুহূর্ত।

"একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক তব ভবনদ্বারে॥
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে॥"

স্নান শেষ করে তীরে এসে, একখানি দোকানের সামনে বালির উপর বসে আমরা এক এক বাটি কফি খেলাম। ইতিমধ্যে অসংখ্য ভিখারী ছেলেমেয়ে আমাদের ঘিরে ধরলো। প্রথমে দু'-চার জনকে দ্বিজেনবাবু দু'-এক পয়সা দিয়েছিলেন, তাতেই বাধলো মুস্কিল। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন বালকবালিকা সমস্বরে চীৎকার তুলে আমাদের সামনে হাত পেতে দাঁড়ালো, আর তাদের পিছনে এলো এক একটি

ছেলে কোলে করে এক একজন রমণী। ভাষা বুঝি না, চীৎকারে কানে তালা লাগার অবস্থা হলো। প্রথমে মনে হয়েছিল সবাই বুঝি একটা করে পয়সা পেলেই চলে যাবে। কিন্তু দেখা গেল যাকে দেওয়া হয় সে সামনে থেকে চলে যায়, তারপরেই ঘুরে এসে দাঁড়ায় ভীড়ের পিছনে—দেবার মানুষ আর ফুরায় না। কাজেই আমাদের স্থান ত্যাগ করতে হলো।

শিল্পী নরেনবাবু একটি ফাঁকা ঝোপ্ড়ির মধ্যে বসে ছবি আঁকছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। সেখানেও নিষ্কৃতি পেলাম না। তখন আরেকটু দূরে গিয়ে বসলাম শিল্পী পূর্ণ বাবুর কাছে। পূর্ণবাবু ছবির উপর তখন সমুদ্রের রং ফুটিয়ে তুলছেন। ভিখারীর দল ঘাটের যাত্রীদের ছেড়ে এতটা দূরে আর এলো না, আমরা রেহাই পেলাম।

পূর্ণবাবু যেখানে বসেছিলেন সেটিও একটি ঝোপ্ড়ি। তবে বড় ঝোপ্ড়ি। ঝোপ্ড়ির মধ্যে রামসীতা-ঠাকুর আছেন। ভিজে ছোলা দিয়ে এই ঠাকুরের ভোগ হয়। আমরা এক আনার ভিজে ছোলা কিনে পূজা দিলাম। সেই ভোগের ভিজে ছোলা চিবুতে চিবুতে পুরোহিত রামদাসের সঙ্গে আলাপ হলো। রামদাসজী বললেন—তিনি 'বালাজী শ্রীসম্প্রদায়ের' সন্ন্যাসী। এই মন্দিরে সেবায়েৎ হয়ে আছেন অনেক দিন। শ্রীরামচন্দ্রের একটি ভাল মন্দির ছিল সমুদ্রের আরো অনেক কাছে। আট বছর আগে সমুদ্র এগিয়ে এসে সেই মন্দিরটিকে গ্রাস করেছে। তারপর দেবতাকে রাখার কোন আশ্রয় ছিল না। শেষে এক ধনী মাড়োয়ারী এই ঝোপ্ড়িটি বানিয়ে দিয়েছেন, সেই থেকে এইটিই হয়েছে মন্দির। দৈনিক এখানে তীর্থযাত্রী আসে প্রায়-আড়াই শো, তাদের মধ্যে মাড়োয়ারীরাই অনেক-কিছু দিয়ে যায়।

দর্শনার্থী আসে, রামদাসজী তাদের ভিতরে নিয়ে যান।

পূর্ণবাবু ছবির উপর রঙের পোঁচ দিতে থাকেন।

আমরা সত্যকারের রঙের খেলা দেখি দিগন্তের পানে তাকিয়ে।

কোন এক সময় শিল্পী রেবতীভূষণ এসে দাঁড়ালো, হাতের রুমালখানি মেলে ধরলো আমাদের সামনে, বললো—দেখুন, কত স্পঞ্জ কুড়িয়ে এনেছি বালির ভিতর থেকে। দেখুন, কেমন রঙীন কড়ি কিনেছি একটা ছেলের কাছ থেকে।

সব-কিছুর পানে তাকিয়ে দেখি, কোন আকর্ষণ খুঁজে পাই না।

"সারাটা বেলা সাগর ধারে কুড়ালি যত নুড়ি,
নানা রঙের শামুক-ভরে বোঝাই হল ঝুড়ি,
লবণ পারাবারের পারে প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায়—
ঢেউয়ের দোলা তুলিল রোল অকূলতল জুড়ি,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায়॥"

বলি—রেবতীবাবু, এখান থেকে কিছু সংগ্রহ করতে ইচ্ছা হয় না, এ যে সব-কিছু ফেলে দিয়ে যাওয়ার জায়গা!

রেবতী হেসে বললো—বাড়ীতে দেখাবো না? এতদূরে এলাম! তারপর পোঁট্‌লা বেঁধে বললেন—বেলা অনেক, স্টেশনে চললাম।

তখন সবে দশটা বেজেছে, দু'টোর সময় ট্রেন। কোন ব্যস্ততা ছিল না আমাদের।

সাগরের পানে দু' চোখ মেলে বসে রইলুম।

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে—
উদার ছন্দে, পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর ঐ যে ভূধর, নদী জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥"

এইখান থেকেই সুরু হয়েছিল লঙ্কা পর্যন্ত নয় ক্রোশ এক সেতু।

জলের উপর পাথর ভাসিয়ে এই সেতু তৈরী করেছিলেন তখনকার দিনের এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদেরা—জাম্ববান, নীল, গবাক্ষ। এই সেতুর উপর দিয়েই লঙ্কায় গিয়েছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ মানব শ্রীরামচন্দ্র। সাধারণ বানর-সেনা নিয়ে বনবাসী যুবক বলদর্পী দিগ্বিজয়ী সম্রাট্‌ রাবণকে চূর্ণ করে এলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রথম দাম্ভিক শক্তিমান অত্যাচারী বিনষ্ট হলো নিঃস্ব গণশক্তির কাছে।

শ্রীরামচন্দ্র ফিরছেন। সঙ্গে লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী। সহসা শ্রীরামচন্দ্রের চোখে পড়লো,—মানুষের একটা ছায়া পড়ে জমিতে তাঁর দু'টি ছায়া পড়ছে। ঋষিরা এসেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র ঋষিদের জিজ্ঞাসা করলেন—আমার যুগল ছায়া কেন?

ঋষিরা বললেন—রাবণ পুলস্ত্য মুনির পুত্র, ব্রাহ্মণসন্তান। তাঁকে বধ করে আপনার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছে। একটি ছায়া সেই পাপের ছায়া। ধনুষ্কোটির এই সাগরে আপনি স্নান করুন, তর্পণ করুন, পাপমুক্ত হবেন।

শ্রীরামচন্দ্র স্নান করলেন, তর্পণ করলেন, একটি ছায়া আর দেখা গেল না।

তখন এখানকার কি নাম ছিল কে জানে! শ্রীরামচন্দ্র স্নান শেষ করে উঠতেই, সমুদ্র বললেন—প্রভু, আমার উপর দিয়ে সেতু বেঁধে চিরদিনের জন্য আমায় বেঁধে রেখে যাচ্ছেন কেন? আমায় মুক্ত করুন।

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন। লক্ষ্মণ ধনুক দিয়ে স্থানে স্থানে সেতুর পাথর সরিয়ে দিলেন, দু'পাশের জলধারার মাঝের বন্ধন মুক্ত হলো। সেই থেকে জায়গাটির নাম হলো—ধনুষ্কোটি।

তারপর মহাভারতের যুগ।—

পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সুদূর হস্তিনাপুর থেকে এখানে

এসেছিলেন। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বধ করে যে পাপ তাঁদের হয়েছিল, সেই পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য তাঁরা এখানে স্নান করেন, তর্পণ করেন।

কংস ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মামা, কংসকে বধ করে মাতুলবধের পাপে পাপী হ'ন শ্রীকৃষ্ণ। নারদ তখন বলেন, ধনুষ্কোটিতে এসে স্নান করতে। এখানে এসে স্নান করে, তর্পণ করে শ্রীকৃষ্ণ পাপমুক্ত হন।

প্রবাদ যে এই তীর্থ মহাপবিত্র, এখানকার এক একটি বালুকণা এক একটি শিবলিঙ্গের সমতুল্য।

দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য রাত্রির অন্ধকারে পাণ্ডবদের শিবিরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত পাঁচটি পাণ্ডবশিশুকে হত্যা করেন। তাতে তাঁর মহাপাপ হয়। অনেক তীর্থে ঘুরেও সে পাপ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারলেন না। তখন বেদব্যাস বললেন—ধনুষ্কোটিতে গিয়ে স্নান-দান-তর্পণ কর গে।

অশ্বত্থামা ধনুষ্কোটিতে স্নান-দান-তর্পণ করে পাপমুক্ত হ'ন।

বেলা বেড়ে চলে। বেলাভূমি জনশূন্য হয়ে আসে। আমরা তখনও বসে থাকি। সেখান থেকে উঠে আসতে মন চায় না।

কোন এক সময় পূর্ণবাবু সাড়া তোলেন—ক'টা বাজলো?

ঘড়ি দেখি,—বারোটা বেজে গেছে।

পূর্ণবাবু তাঁর ছবির উপকরণ গুছিয়ে নেন। নরেনবাবুও এসে পড়েন। আমরা স্টেশনের দিকে হাঁটতে সুরু করি। মাথার উপর রোদ তখন তীব্র হয়েছে কিন্তু সাগরের উদ্দাম বাতাসে সে রোদ গায়ে লাগে না। তবে বালি বেশ উত্তপ্ত। জুতো পায়ে আছে বটে, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে চারিপাশের বালি যখন পায়ে উঠছে তখনই টের পাচ্ছি যে জুতো না থাকলে এই গরম বালির উপর দিয়ে এক পা-ও চলতে পারতাম না।

স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। স্টেশনের পিছনেই ভাল হোটেল ছিল। রেলের হোটেল। মাদ্রাজী খানা, মায় প্যাঁড়া অবধি মিলে গেল সেখানে। খেয়ে এসে প্রত্যেকেই বসে গেল এক একখানি চিঠি লিখতে।

চিঠি লেখা শেষ করেই দ্বীপেন উঠে পড়লো, বললো—এখনও ঘন্টাখানেক সময় আছে, ওদিকে জেলেদের কয়েকখানি ঝোপ্‌ড়ি দেখলাম, দেখে আসি ওদের অবস্থাটা।

আমরা এক একখানি চেয়ার দখল করে বসলাম প্রতীক্ষা-ঘরে। ওপাশে 'পায়ার,' অর্থাৎ জাহাজঘাটা। একখানি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। মাল বোঝাই হচ্ছে। তারও ওদিকে সাগর পারে সারি সারি গরীব জেলেদের ঝোপড়ি। কোন রকমে মাথা গুঁজবার যোগ্য এক একখানি ছিটে-বেড়ার ঘর। বালির উপর দিয়ে দ্বীপেন চলেগেলো সেইদিকে।

ক্রমে সময় হয়ে এলো। আমরা টিকিট কাটলাম, ট্রেনে উঠে বসলাম। কিন্তু দ্বীপেন কোথা? চারিপাশে কোথাও তার চিহ্ন মাত্র নেই। এই সুদূর বিদেশে তাকে কি আমরা একা ফেলে যাব? অথচ এই গাড়ীতে না গেলে আর গাড়ী নেই, আজ তো এখানেই থেকে যেতে হয়! তা হলে?

আমাদের গাড়ী ছেড়ে দিল।

গাড়ী কিন্তু একেবারে ছাড়লো না। অন্য লাইনে ঘুরে এগিয়ে গেল পায়ারের কাছে। জাহাজঘাটা থেকে মাল নিয়ে ছাড়বে। মিনিট দশেকের ব্যাপার। দেখতে দেখতে সে দশ মিনিটও কাটলো, দ্বীপেন কই? ঠিক সেই মুহূর্তে কামরার দরজার পাশে দ্বীপেনের মাথাটি দেখা গেল—খগেনবাবু!

দ্বীপেন উঠে এলো। কিন্তু টিকিট? দ্বিজেনবাবু তখনই একবার নেমে গিয়ে বলে এলেন গার্ডকে। গাড়ী ছেড়ে দিল। দু'পাশের বালি ঠেলে আমরা এগিয়ে চললাম। পিছনে বালির

ধূসরতাকে ঘিরে নীল সাগরের বেষ্টনী, তার উপর রৌদ্রতপ্ত ফিকে নীল আকাশ।

ধনুষ্কোটি ও রামেশ্বর একই দ্বীপের দু'টি দিক। ধনুষ্কোটি থেকে আমরা ফিরে এলাম পামবান অবধি, সেখানে গাড়ী বদলে পৌঁছলাম রামেশ্বরে।

রামেশ্বর একটি গণ্ডগ্রাম, কিন্তু অধিবাসীর সংখ্যা অনেক। বাড়ী-ঘর, দোকান, বাজার, হোটেল—কিছুরই অভাব নেই। দোতলা পাকা বাড়ীর পাশেই আছে দরিদ্রের কুঁড়েঘর। ঘন তাল-নারিকেলের গাছগুলিকে ছাড়িয়ে মাথা তুলেছে মন্দিরের গোপুরম্। এই ভারতবিখ্যাত প্রাচীন মন্দিরটিকে কেন্দ্র করেই এখানকার সব-কিছু সমৃদ্ধি।

স্টেশনের কাছেই এক 'ছত্রমে' গিয়ে তো আমরা উঠলাম।

এখানে কল ও ইলেক্‌ট্রিক আছে। তবে কলের জল খাবার জন্যই নেওয়া হয়,—স্নান করা, কাপড় কাচা প্রভৃতি ব্যাপারে ইঁদারার ব্যবস্থা। ইঁদারা থেকে জল তুলতে মোটেই কষ্ট হয় না, সমুদ্র-সমতল দেশ, ইঁদারার জল আছে হাতের কাছেই।

দোতলায় বড় একখানি ঘর পাওয়া গেল, ভাড়া দৈনিক মাত্র এক টাকা। তক্তপোষ, চেয়ার, টেবিল—সবই আছে। ম্যানেজার বললেন—খবর দিলে সামনের হোটেল থেকে দু' বেলা খাবার অয়োজন করে দেবেন।

তখনই এক ঝাঁক বড় বড় ডাব নিয়ে একটি ডাবওয়ালা দেখা দিল। পূর্ণবাবু বললেন,—কাটো, সবাইকে একটা করে দাও।

এখানকার ডাবগুলি সত্যিই উপাদেয়। কম করে এক সের জল তো আছেই, তার সঙ্গে আছে পুরু শাঁস। জলটুকু খাওয়া হয়ে গেলেই ডাবওয়ালা তখনই ডাবটিকে দু'খানা করে দেবে,

শাঁসটুকু ছাড়িয়ে খেতে কষ্ট হচ্ছে দেখলে ছাড়িয়েও দেবে। মানুষকে খাইয়েই যেন ওদের আনন্দ।

পৌষ মাস হলেও দাক্ষিণাত্যের সমুদ্র-সৈকতে সূর্যাস্তের তখনও দেরী ছিল, আমরা বেরিয়ে পড়লাম সূর্যাস্ত দেখতে। মাইল খানেক হেঁটে গিয়ে গ্রামের বাইরে সাগর তীরে এক বালিয়াড়ির উপর আমরা উঠে পড়লাম। সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া একটা বালির পাহাড় সৃষ্টি করেছে। দু'-তিনতলা উঁচু একটা বালির স্তূপ। বিঘা দশ-বারো জমি জুড়ে আছে,—কি আরও বেশী হবে। উপরটা সমতল। উপরে বালির উপর জলস্রোতের মত ঢেউয়ের রেখা। ওঠার সময় পা বালির মধ্যে বসে যায়। শন্ শন্ করে দখিনা বাতাস বইছে। খুব জোর কথা বললেও দু-তিন হাত তফাতে যে আছে সে-ও শুনতে পায় না, বাতাস সব স্বরকে ডুবিয়ে দেয়। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, বাতাসের ঝাপ্‌টা এখনি বুঝি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। শুধুই শনশন—শনশন—শনশন।

বালিয়াড়ির উপর থেকে সমস্ত দ্বীপটি দেখা যায়। নারিকেল-কুঞ্জের পিছনে সমুদ্রের নীল রেখা। নারিকেলকুঞ্জের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে যায়। তা যাক্, কিন্তু বালিয়াড়ির মাথায় উঠে জীবনের এক অভিনব অপ্রকাশ্য অভিজ্ঞতা আমরা আস্বাদ করি। আমাদের চারিপাশ ঘিরে ধীরে ধীরে নেমে আসে অন্ধকার।

এবার সমুদ্রের তীর ধরে আমরা অগ্রসর হই মন্দিরের দিকে।

পথে দেখি, বালির মাঝে গর্ত করে লম্বা কাঠের হাতা দিয়ে জেলেদের মেয়েরা পানীয় জল তুলে কলসী ভরছে। গরীব মানুষ, কল নেবার সামর্থ্য তাদের নেই। কলের জল তারা পায় না। নির্মম দারিদ্র্য জীবনকে বঞ্চিত করতে কোথাও রেহাই দেয়নি।

জেলেরা মাছ ধরছে। কয়েকখানি বড় বড় নৌকা তীরে তোলা আছে। সেই দুর্দান্ত বাতাসে একটি করে নেংটি পরে জেলেরা সমুদ্রের জলে নেমে জালের দড়ি টেনে আনছে। চাঁদের মত বেঁকে

গেছে সমুদ্রের বেলাভূমি। সমুদ্রের উপর মন্দিরের গোপুরম্ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঘন তাল ও নারিকেলকুঞ্জের উপরে, একটি উজ্জ্বল আলো জ্বলছে তার মাথায়।

আমরা বরাবর এলাম মন্দিরে। চারিপাশ জমজমাট। তোরণ থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীতের আলাপ। শুনলাম, এই নাকি এখানকার রীতি। এক একজন বড় বড় ওস্তাদ প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দির তোরণে বসে রামেশ্বরকে গান শোনান্। গোপুরম্ পার হয়ে গেলাম, ভিতরে দীর্ঘ অলিন্দ। অলিন্দে বসেছে বাজার। শাঁখা, কড়ি, ঝিনুক, মালা, খেল্না, পট আর তালপাতার তৈরী নানা জিনিষের সমাবেশ। বড় কড়ির উপর এরা নাম লিখে দেয়ে, মূর্তি খোদাই করে দেয়, শাদা শাঁখের উপর পালিশ তোলে। শাঁখ ও কড়ির কারবার এখানকার একটা বড় ব্যবসা।

বিপণির সারি পার হয়ে আমরা অগ্রসর হলাম। স্তব্ধ মন্দির থম্ থম্ করছে। দু'পাশে শুধুই চলেছে সারি সারি অপূর্ব কারুকার্য-ক্ষোদিত থাম। প্রতিটি থাম আকারে, কারুকার্যে অপরটি থেকে অভিন্ন। মাথার উপর ছাদে বিভিন্ন রঙের আল্‌পনা আঁকা।

একটি ছড়িদার জুটেছিল। সে আমাদের নিয়ে গেল মন্দিরের আপিসে, রামেশ্বরকে পূজা করতে হ'লে সেখানে পয়সা দিয়ে টিকিট করতে হয়। গঙ্গাজল কিনতে পাওয়া যায়,—এক ছটাকের দাম পাঁচ সিকে। বাইরে থেকে ফুল, নারিকেল, কর্পূর প্রভৃতির ডালা কিনে এনেছিলাম, গঙ্গাজল ও টিকিট নিয়ে এলাম মূল মন্দিরের সামনে। বাইরের চত্বরে বসে পুরোহিত মন্ত্র পড়ালেন, তারপর মন্দির-দ্বারে গিয়ে টিকিট ও ডালা প্রধান সেবায়েতের হাতে দিলাম। মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। সেবায়েৎ, গঙ্গাজল ও নারিকেলের জল শিবের মাথায় দিলেন, মালাটা পরিয়ে দিলেন, তারপর ধুনুচির মধ্যে কর্পূরটুকু দিলেন জ্বালিয়ে। সেই আলোয় দীপালোকে-প্রায়-অন্ধকার গর্ভগৃহ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দেখলাম

রামেশ্বর শিবকে। মাত্র ফুট খানেক উঁচু, কালো পাথরের লিঙ্গমূর্তি। আমরা প্রণাম করলাম। সেবায়েৎ এনে দিলেন নির্মাল্য আর প্রসাদ হিসাবে কলা ও নারিকেলের মালা দু'টি।

রামেশ্বরের এই লিঙ্গমূর্তি তিন যুগের। রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করে শ্রীরামচন্দ্র তো ফিরে এলেন, কিন্তু মন তাঁর বিমর্ষ। মনে পড়ছে মন্দোদরীর অশ্রুসজল চোখ, মনে পড়ছে পতিপুত্র-হারা রাক্ষস-রমণীদের কাতর ক্রন্দন। মন অশান্ত হয়ে উঠছে। শ্রীরামচন্দ্র মনকে শান্ত করার জন্য ঋষিদের জিজ্ঞাসা করলেন—কি করা কর্তব্য ?

ঋষিরা বললেন—সর্ব পাপ-তাপহারী শিবের প্রতিষ্ঠা করুন।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বললেন—একটি শিবলিঙ্গ নিয়ে এসো হিমালয় থেকে।

হনুমান চলে গেলেন।

তারপর কেটে গেল অনেক সময়, হনুমান তবু ফেরেন না। শেষে শ্রীরামচন্দ্র আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, নিজেই একটি শিবলিঙ্গ এনে প্রতিষ্ঠা করলেন।

তারপরেই হনুমান ফিরে এলেন হিমালয় থেকে। ইতিপূর্বে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেছে দেখে তিনি ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। কিন্তু রামভক্ত অনুমান মুখে কিছু বললেন না। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে তাঁর মনের কথাটা বুঝতে পারলেন, বললেন —তোমার শিব আমি প্রতিষ্ঠা করবো, তুমি আমার প্রতিষ্ঠিত শিবটি তুলে ফেল।

হনুমান তখনই লেজ দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি, তারপর মারলেন টান। কিন্তু শিবলিঙ্গ উঠলো না। হনুমান অনেক চেষ্টা করলেন, শিবলিঙ্গ তবু অচল, অটল, অনড়। হনুমান এবার কেঁদে ফেললেন। শ্রীরামচন্দ্র বললেন— দুঃখ করো না, তোমার শিবলিঙ্গটিও আমি এখানে প্রতিষ্ঠা করবো।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের আনা শিবলিঙ্গটিও প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর নাম হ'লো বিশ্বেশ্বর। সেই থেকে এখানে আগে বিশ্বেশ্বরের পূজা হয়, তারপর রামেশ্বরের পূজা।

পাণ্ডারা বলেন, রামেশ্বরের গায়ে এখনও নাকি হনুমানের লেজের সেই দাগ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য বাইরে থেকে কর্পূরের আলোয় চন্দনলিপ্ত রামেশ্বরকে দেখে আমরা তার কিছুই বুঝতে পারি নি।

রামায়ণে কিন্তু এই মূর্তিপ্রতিষ্ঠা নিয়ে আর এক কাহিনী আছে। সীতা দেবীকে উদ্ধার করতে যাবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র যখন সেতু তৈরী করলেন লঙ্কা অবধি, তখন যত বার সেতু তৈরী করেন রাবণ এসে তত বারই সেতু ভেঙে দিয়ে যান। বিভীষণ তখন বললেন—মহাদেব রাবণের ইষ্ট দেবতা, সেতুর উপর শিব প্রতিষ্ঠা করলে রাবণ আর সে সেতু ভাঙতে পারবেন না।

শ্রীরামচন্দ্র তখন এই রামেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করলেন সেতুমুখে। রাবণ আর সেতু ভাঙ্গলেন না। এবার শ্রীরামচন্দ্র বানর-সেনা নিয়ে নির্বিঘ্নে লঙ্কার পৌঁছলেন।

এই দুইটী কাহিনীর মধ্যে একটি সত্য আছে যে শ্রীরামচন্দ্রই এই শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা, তা সে লঙ্কায় যাবার পথেই হোক্ বা ফেরার পথেই হোক্। তা হলে এই লিঙ্গ বহু প্রাচীন, হাজার হাজার বছর আগের, ত্রেতা যুগের ব্যাপার।

মন্দিরের সামনেই পনেরো ফুট বৃহৎ একটি বৃষমূর্তি। বৃষ শিবের বাহন। একখানি মাত্র পাথর কেটে এমন প্রকাণ্ড বৃষমূর্তি দক্ষিণ-দেশে আর কোথাও দেখি নি।

সামনেই একটি সোনার তালগাছ, অর্থাৎ ধ্বজা-স্তম্ভ। শুনলাম, লঙ্কার কাণ্ডিরাজ এই ধ্বজা-স্তম্ভটি তৈরী করে দিয়েছেন।

এবার মন্দিরটী ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দিনের পর দিন দেখলেও

এ মন্দিরের কারুকার্য দেখে শেষ করা যায় না, ছু-তিন ঘণ্টায় আমরা আর কতটুকু দেখবো !

একান্ন বিঘা জমি নিয়ে এই মন্দির, কুড়ি ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ভিতর চারিপাশ ঘিরে ছু'টী পর পর প্রশস্ত পথ। একটীর ভিতরে আর একটী। প্রথম পথটী পূর্ব-পশ্চিমে ৬৯০ ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ৪৩৫ ফুট। তার ভিতরের পথটী পূর্ব-পশ্চিমে ৩৮৬ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ৩১৪ ফুট। তার মধ্যে ১৯০ ফুট লম্বা ও ৩০৭ ফুট চওড়া প্রশস্ত মণ্ডপের মধ্যে আসল মন্দিরগুলি আছে। এই পথগুলি মন্দিরেরই বারান্দা। বারান্দার ছু'পাশে সারি সারি থাম। প্রতিটি থামে অপূর্ব কারুকার্য। সেই থামের মাথায় কারুকার্য খচিত ছাদ।

রামেশ্বর মন্দিরের এই দরদালান জগতের মধ্যে অদ্বিতীয়। এই দালানটি সর্বসমেত চার হাজার ফুট লম্বা। পৃথিবীর সর্বপ্রধান গির্জা সেণ্ট-পিটার্স চার্চের দরদালান মাত্র ছ' শো ফুট লম্বা। তবে মিশরের রেমেসিস্ মন্দিরের রচনানৈপুণ্য নাকি অনেকাংশে এইরূপই রমণীয়।

পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই মন্দিরটি প্রথমে তৈরী হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। তবে এত বড় মন্দির কত বছর ধরে তৈরী হয়েছিল তা বলা শক্ত। লঙ্কা অবধি সেতু তৈরী করতে যে পাথর লেগেছিল তাতে এই দ্বীপে বা কাছাকাছি কোথাও আর এমন পাথর ছিল না যে এই মন্দিরের একটী কক্ষ তৈরী হতে পারে। সেইজন্য দূর দেশ থেকে পাথর এনে এই মন্দির তৈরী হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন যে সিংহল থেকে এই সব পাথর আনানো হয়। তবে প্রথমে মন্দির এত বড় ছিল না। পঞ্চাদশ শতকে সেতুপতি রাজারা প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন, এবং বহু রাজাকে পরাজিত করে বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। চারিপাশ থেকে অতুল ঐশ্বর্য আহরণ করে তাঁরা এই মন্দির সংস্কারে মন দেন। লঙ্কার রাজার সঙ্গে যোগা-

যোগ করে ত্রিকোণামালি পর্বত থেকে পাথর আনিয়ে তাঁরা মন্দিরকে নতুন করে বড় করেন। দু-এক পুরুষে কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি। সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল এর সংস্কারে—১৪০০ সালে সুরু হয়, শেষ হয় ১৭৬৯ সালে।

মন্দিরের মধ্যে একটা থম্‌থমে শান্ত সমাহিত ভাব। আমরা নির্বাক্ বিস্ময়ে এক দিক্ থেকে আর-এক দিকে শুধু ঘুরে ঘুরে দেখছি। অজস্র মূর্তি, অপরূপ কারুকার্যের মধ্যে আমাদের মন হারিয়ে গেছে। অসংখ্য দীপশিখার পানে তাকিয়ে আমরা কথা বলতে ভুলে গেছি। বিরাট বিপুল মন্দির আমাদের স্তব্ধ করে দিয়েছে।

রামেশ্বরের মূল মন্দিরের দক্ষিণ ভাগে হনুমানের-আনা বিশ্বেশ্বর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আর একদিকে রামেশ্বরী দেবীর মন্দির। চারিপাশে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতাদেবী, হনুমান, বিভীষণ, প্রভৃতির মূর্তি আছে। একখানি কালো পাথরে খোদাই করা এক একটি মূর্তি, প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ। শিল্পী মূর্তিগুলির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছেন।

মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে আমরা এলাম পশ্চিম দ্বারে। এখান থেকে একটি সরু গলি সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই সমুদ্রতীরেই সীতার অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করতে করতে রামেশ্বরে এসে পৌঁছলেন, তখন রামভক্ত এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। মন্দিরের মধ্যেই একটি পুষ্করিণী আছে—শিবকুণ্ড, সেই কুণ্ডের ঘাটে ব্রাহ্মণ বসে আছেন, বসে বসে কাঁদছেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কাঁদছেন কেন?

“বিপ্র কহে, মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥

জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কানে শুনি ॥
এ শরীর ধরিবারে প্রভু না বুঝায়।
ঐ দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায় ॥"

মহাপ্রভু বললেন—আপনার এ ধারণা ভুল। কূর্মপুরাণে আছে—

"রাবণ আনিতে সীতা অন্তর্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল।"

মহাপ্রভু মন্দির থেকে কূর্মপুরাণ এনে ব্রাহ্মণকে দেখালেন—

"রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতা আবরণ ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্বতীর স্থানে।
মায়া সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল।
অগ্নি পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল ॥
তবে মায়া সীতা অগ্নি কৈল অন্তর্ধান।
সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মহাপ্রভু বললেন—আসল সীতাকে রাবণ হরণ করতে পারেন নি। অতবড় রামায়ণের যুদ্ধটাই হয়ে গেল নকল সীতাকে নিয়ে।

"সীতা-আরাধিত বহ্নিশ্ছায়সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া সীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্ত জননীয়ৎ ॥" —কূর্মপুরাণ

রামভক্ত ব্রাহ্মণের মুখে এবার হাসি ফুটলো।

রামেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে আছে একটি পুষ্করিণী, তার নাম শিবকুণ্ড। আর আছে একুশটি কূপ। এর প্রত্যেকটিকে কুণ্ড বলে। ভক্তেরা এই প্রতিটি কুণ্ডের জল স্পর্শ করে।

রাত তখন ন'টা। সঙ্গীত, বাজনা ও আলোর জৌলুষ বেরুলো। সেদিন শুক্রবার। প্রতি শুক্রবার রাত্রে রামেশ্বরী দেবী আসেন রামেশ্বর দর্শনে। আসল প্রস্তরমূর্তিকে মন্দির থেকে বের করা যায় না। একটি করে সোনার ভোগমূর্তি আছে। সেই সোনার পার্বতীকে সোনার পাল্কীতে চড়িয়ে বাজনা বাজিয়ে, মহাধূম করে রামেশ্বরের মন্দিরের সামনে নিয়ে আসা হলো। রামেশ্বরকে দেখে, প্রদক্ষিণ করে পার্বতী ফিরে গেলেন। বিরাট জৌলুষ—বাজনা, আলো, আসাসোঁটা ও ধ্বজাধারীদের এক দীর্ঘ মিছিল। পিছনে ব্রাহ্মণ ও ভক্তদের ভীড়। অত বাজনা, অমন জৌলুষ, গম্ভীর কণ্ঠের সমবেত স্তোত্রপাঠ, সব-কিছু মিলেও কিন্তু সেই বিরাট মন্দিরের গাম্ভীর্য এতটুকু হ্রাস করতে পারে না, সেই আলোর জৌলুষ থামে-ঘেরা দীর্ঘ অলিন্দের মাঝে স্তিমিত হয়ে আসে। এ তো মন্দির নয়, এ যেন ধ্যানমৌন সন্ন্যাসী, মহাকালে আত্মসমাহিত।

রাত দশটা নাগাদ আমরা বেরুলাম। তখনও মন্দিরের চারিপাশের পথঘাট জম্‌জম্ করছে।

আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। একটি বড় হোটেলে আমরা ঢুকে পড়লাম। দক্ষিণ ভারতে সর্বত্রই নিরামিষ আহারের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভালো হোটেল আছে। সাধারণতঃ একবার ভাত খাওয়ার চার্জ মাত্র আট আনা। ভাত, বেগুনভাজা, ডাল, সব্জি-মেশানো ডাল, দু'রকম তরকারী, পাঁপড়ভাজা, চাট্‌নী ও এক গ্লাস ঘোল, এই হলো সাধারণ খাদ্যতালিকা। ভাজা ছাড়া সব-কিছুতেই তেঁতুল ও নারিকেল থাকবে। মিষ্টি এরা খায় না। মিষ্টি মেঠাই মেলা শক্ত, দৈবাৎ কোন কোন জায়গায় পেঁড়া মেলে। আমরা ধনুষ্কোটি ও তাঞ্জোরে পেঁড়া পেয়েছিলাম। বেশী টক খাওয়া

আমাদের অভ্যাস নেই, প্রথম তু'-একদিন একটু মুখে লাগে, তার পর অভ্যাস হয়ে যায়।

জলযোগ হিসাবে চালের বড়া ও সরুচাক্‌লি, যা 'ধোসা' ও 'ইট্‌লি' নামে প্রসিদ্ধ, আর ডালের বড়া,—চাট্‌নি দিয়ে খেতে মোটেই খারাপ লাগে না। তার সঙ্গে এক বাটি (এখানে কাপের চলন নেই, পিতলের বাটি) কফি অতি উপাদেয়।

পরদিন সকালে আবার আমরা গেলাম প্রথমে সমুদ্রতীরে সূর্যোদয় দেখতে। নীল সাগরের বুকে আলোর ব্যাপ্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে দিগ্বলয় থেকে সাগর-সৈকতে। আলোর ঔজ্জ্বল্যে মেশে রক্তিম স্নিগ্ধতা। সেই সুনীল-রক্তিমের স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাসের আড়াল থেকে লাফিয়ে উঠে লাল ছোট্ট একটি গোলক। অরুণাভার নবীনতায় উদ্‌ভাসিত করে দেয় চারিপাশ, আমাদের স্নান করিয়ে দেয় নবজীবনের চাঞ্চল্যে, আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায় একটা আনন্দের অনুভূতি। সুষমার পেলবতা অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের আনন্দলোক সৃষ্টি করে—

"আজ আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে-দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও॥
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার-কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া আলোয়-পাগল প্রভাত-হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও॥"

তার পর চললাম মন্দিরে। গ্রামে ঢুকেই দেখি প্রতিটি গৃহের সামনের পথটুকু জল দিয়ে নিকানো হয়েছে; বাড়ীর বালিকা ও কিশোরীরা সেখানে বসে বসে চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে সাদা আল্‌পনা আঁকছে। নানা রকমের আল্‌পনা, তুই

বর্গ-হাত থেকে ষোল-আঠারো বর্গহাত অবধি আল্‌পনা চোখে পড়লো। আল্‌পনার মাঝে মাঝে আবার গোবরের গুলি বসিয়ে এক একটি কুমড়ো-ফুল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মাথায়। প্রভাতী সূর্যের আলো পড়ে সেই ফুলগুলি দেখাচ্ছে যেন প্রদীপের শিখা। গৃহদ্বারে সারি সারি দীপ জ্বলছে বুঝি। অপরূপ স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে সারা পথটি। প্রথম অরুণালোকে নবীনদিনের আবাহন হয়েছে।

রাত্রে স্তিমিত সঙ্গীত ও স্তোত্র-পাঠের মধ্যে প্রায়ান্ধকারে মন্দিরের যে ধ্যানমৌন গাম্ভীর্য শ্রদ্ধা-স্তব্ধ করে দিয়েছিল, দিনের আলোয় সে পরিবেশ যেন কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে। রাত্রে মন্দির ও থামের কারুকার্য কিছুটা চোখে পড়েছিল, কিছুটা পড়ে নি,—জানা-অজানায় মেশানো একটা অস্ফুট রহস্যময় অনুভূতি ছিল। এখন দিনের আলোয় সব-কিছু স্পষ্ট, ব্যক্ত, প্রকাশমান। এখন দেবতার চেয়ে দেবতার চারিপাশে যে ভক্তি-উপহার শিল্পীরা নিপুণ হাতে থরে থরে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন তাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে চোখের সামনে। আমরাও শুধুই দেখে চলেছি। দেখছি খোদাই করা থামগুলি, দেখছি মাথার উপর ছাদে আল্‌পনার কাজ, দেখছি মন্দিরের গায়ে খোদাইকরা মূর্তি। প্রতিটি নিখুঁত, লাবণ্যমণ্ডিত, ললিত ও লালায়িত, প্রসন্ন ও প্রশান্ত। যত দেখা যায় তত দেখতে ইচ্ছা করে। এ তো কঠিন পাষাণের মূর্তি নয়, এ যেন কৃষ্ণনগরের নরম মাটি দিয়ে গড়া মূর্তি। সারাদিন দেখলেও মন্দিরের একটা অংশ দেখে শেষ করা যায় না। আমাদের হাতে আর কতটুকু সময় !

বেলা বেড়ে চলে। বাড়ী ফিরবো। দেখি। দেখতে দেখতে কখন যে কে কোন্ দিকে ছিটকে পড়েছি, হারিয়ে গেছি। সে বিরাট মন্দিরের মধ্যে কাউকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। কি যেন খেয়াল হলো, ঘড়ি খুলে দেখলাম প্রশস্ত অলিন্দ দিয়ে মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করতে কতক্ষণ লাগে। দেখলাম, সাধারণ ভাবে এক

একটি বারান্দা অতিক্রম করতে লাগে—ছ'মিনিট, চারিটি বারান্দা ঘুরে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে লাগে—চব্বিশ মিনিট।

দ্বিজেন বাবুর সঙ্গে দেখা হলো, বললেন—হারিয়ে গেছি। সামনের গোপুরম্ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি এ পথে তো আসি নি।

তা হারিয়ে যাবার কথাই বটে। বললাম—আর সব ?

—পূর্ণ বাবু ও নরেন বাবু বসে ছবি আঁকছেন। খগেন বাবু ও দ্বীপেন কোথায় ঘুরছে জানি না।

দু'জনে বাড়ী ফিরলাম। একটু পরে খগেনবাবু ও দীপেন ফিরলো। পূর্ণ বাবু ও নরেন বাবু ফিরলেন অনেক পরে। তাঁদের প্রত্যেকেরই হাতে তখন দু-তিন খানি করে ছবি।

রামেশ্বরম্ দেখা তখনও শেষ হয় নি।

বিকালের দিকে বেরুলাম। রামঝরুকা যাব। সমুদ্রতীর ধরে বরাবর বালির রাস্তা। আড়াই মাইল পথ।

পথ ও পথের বালি দেখে আমাদের দলের বয়স্করা পিছিয়ে পড়লেন, বললেন—তোমরা যাও।

আমরা তিনজন,—দ্বিজেনবাবু, দ্বীপেন ও আমি চললাম। কিছুদূর গিয়ে বুঝলাম সেই একফুট-দেড়ফুট গভীর বালি-পথে পথ চলা সত্যই কষ্টকর। চেষ্টা করলেও দ্রুত যাওয়া যায় না। দ্রুত যাবার চেষ্টা করলে পা আড়ষ্ট হয়ে আসে। দু'মাইল আড়াই-মাইল পথ যেতেই আমাদের লাগলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

রামেশ্বর দ্বীপের সেইটিই হচ্ছে চূড়া,—ছোট একটু পাহাড়ের মত, শ'খানেক ফুট উঁচু হয়ে আছে। এখানকার নাম হলো গন্ধমাদন পাহাড়। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পরে হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় নিয়ে এসেছিলেন। সেই পাহাড়টি আর হিমালয়ে ফিরে নিয়ে যান নি, সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সেই পাহাড়টিই নাকি এইখানে পড়ে

এই রামেশ্বর দ্বীপ হয়েছে। আবার এ কথাও শোনা গেল যে, সেতু বাঁধার সময় শ্রীরামচন্দ্র এই উঁচু টিপিটার উপর থেকে কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন, পরে এখান থেকে সৈন্য পরিচালনাও করেন। এই পাহাড়টি যদি সেতুবন্ধের আগেই ছিল, তাহ'লে গন্ধমাদন ছুঁড়ে ফেলার কথা ওঠে কি করে? কিন্তু আমাদের প্রতিটি তীর্থক্ষেত্রে, সম্ভব অসম্ভব মিশিয়ে একাধিক কিম্বদন্তীর চলন থাকবেই।

যাক্ সে কথা। মন্দিরটি দোতলা। দ্বিতলে শ্রীরামচন্দ্রের দু'খানি চরণচিহ্ন আছে। পূজা হয়। কোন বিগ্রহ নেই। গয়ায় গদাধরের পাদপদ্মের মত। হয়তো-বা এটি বুদ্ধের চরণচিহ্নও হতে পারে, এই পথেই তো একদিন বৌদ্ধ ধর্ম সিংহল অবধি বিস্তৃতিলাভ করেছিল। তার পর অনেক বৌদ্ধমূর্তিই তো হিন্দুরা দেবদেবীর মূর্তি বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এ-ও তেমন একটা কিছু হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

মন্দিরের ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে। আমরা ছাদে উঠলাম। অপরূপ দৃশ্য। চারিপাশে বালুকাময় হলুদ রঙের এই দ্বীপটিকে ঘিরে নীল জল। চারিদিকে শুধু নীলাম্বুরাশি। আদি নেই, অন্ত নেই। দূরে নারিকেল গাছের সারি ও রামেশ্বরের মন্দির। কয়েকটি শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়ের চূড়া বরাবর সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে সিংহলের দিকে চলে গেছে। ওইটিই নাকি শ্রীরামচন্দ্রের সেতু, ইংরেজিতে 'আডাম্‌স্ ব্রিজ'।

ওই পাহাড়গুলি ভাঁটার সময় স্পষ্ট হয়ে উঠে জলের উপরে মাথা তোলে।

ওই পথে দীর্ঘ ষোল মাইল গেলে পর মান্নার দ্বীপে পৌঁছানো যায়। মান্নার দ্বীপ দৈর্ঘ্যে রামেশ্বরের চেয়ে বড় কিন্তু চওড়ায় ছোট। রামেশ্বর ১১ × ৬ মাইল, আর মান্নার ১৮ × ২॥ মাইল। মান্নার থেকে দু'মাইল দূরে সিংহল। মান্নার থেকে এই সেতুপথে আগে সিংহলে লোক যাতায়াত করতো। ১৪৮৪ সালের এক তুফানে এই পাহাড়ী সেতু ভেসে-যায়,—যাওয়া-আসা বন্ধ হয়।

মন্দিরের ছাদের উপর দিয়ে উদ্দাম বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের বাতাস। কয়েকটি ছেলেমেয়ে ছাদের থামের গায়ে খড়ি দিয়ে নাম লিখছিল। তাদের দাদু ছিলেন সঙ্গে। শুনলাম, ওঁরা ভবানীপুরের লোক। সেখানে হয়তো আলাপ রীতিমত জমিয়ে তোলা যেত। বাঙালী বিদেশে বড় আপনার। কিন্তু সেখানে গল্প করতে ইচ্ছা হয় না। চারিপাশে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য এমন ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে যে মনে হয় চুপ করে শুধু বসে বসে তাকিয়ে থাকি,—অনাদি অনন্তকাল ধরে শুধু 'নয়ন ভরিয়া দেখি।'

"জলধি রয়েছে স্থির, ধূ-ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া!
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে দুই বাহু প্রসারিয়া॥"

পশ্চিম সাগরের বুকে ধীরে ধীরে সূর্য নেমে যাচ্ছে। মন চলে যায় হাজার হাজার বছর পিছনে। এমনি এক সূর্যাস্তের সময় শ্রীরামচন্দ্র এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বনবাসী, নবজাত তৃণের মত তাঁর বর্ণ—নবদূর্বাদলশ্যাম। সঙ্গে অগণিত অসভ্য বানর-সেনা। ত্রিভুবনজয়ী রণকুশলী উদ্ধত দিগ্বিজয়ীর বিরুদ্ধে তিনি চলেছেন অভিযান করতে—অত্যাচারকে নিঃশেষ করতে। শোকাচ্ছন্ন মনে তাঁর দুর্বার সঙ্কল্প, অনতিক্রম্য সমুদ্র পার হতে তিনি দৃঢ়চিত্ত। কিন্তু তখনও তাঁর মনে জয়-পরাজয়ের নিশ্চয়তা নেই, সন্দেহের দোলায় তিনি দুলছেন। বিষণ্ণ মনের মাঝে বার বার ভেসে উঠছে জানকীর মুখ, সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত বাতাসে তিনি শুনতে পাচ্ছেন জানকীর দীর্ঘশ্বাস, তরঙ্গের উচ্ছলতা জাগিয়ে তুলছে উচ্ছল হৃদয়াবেগ। সম্বলহীন বনবাসী উদাস দৃষ্টি মেলে ধরেছেন ওপারের অশোক বনের পানে।

সেই একদিন। আর একদিন বিজয়ী হয়ে তিনি ফিরে এসেছেন। রামেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করে এই পাহাড়ের উপরে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন। এবার জানকী তাঁর সঙ্গে আছেন। তবুও তিনি

বিষণ্ণ। মন্দোদরী ও রক্ষকুলবধূদের অশ্রু-সজল চোখ মনে পড়ছে। অত্যাচারীকে আঘাত করেছেন, দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু তবু কি তিনি শান্তি পেয়েছেন? রণাহত শত-সহস্রের চিতাগ্নির ধূম তাঁর চিত্তের আনন্দ মেঘাচ্ছন্ন করে দিয়েছে, সুন্দর ধরিত্রীর রূপময়ী উজ্জ্বলতা তাঁর মনের ঔদাস্যকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তখন কি তিনি ভেবেছিলেন এখানে বসে, তাঁর উন্মনা মন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, সে কথা আজ কে বলবে?

সূর্যের শেষ রক্তিমাভাটুকু আকাশে মিলিয়ে গেল। তখনও আমরা তাকিয়ে আছি। মনে হয়—

"যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।"

পূর্ব আকাশে অন্ধকারের আমেজ দেখা দিল, আমরা এবার নেমে এলাম। একদল ছেলেমেয়ে আমাদের পিছনে পিছনে দৌড়ালো—গড়ম, পয়সা! গড়ম, পয়সা!—অর্থাৎ বাবু, পয়সা!

পয়সা না পাওয়া অবধি তারা সঙ্গ ছাড়লো না।

বরাবর আমরা ফিরে এলাম মন্দিরে।

রামেশ্বর মন্দিরতোরণে তখন রাগ-রাগিনীর আলাপ হচ্ছে, রাজ-গায়ক সঙ্গীত শোনাচ্ছেন দেবাদিদেব রামেশ্বরকে। এই এখানকার দৈনন্দিন রীতি।

রামেশ্বরম্ থেকে ট্রেন ধরলাম। রাত ২।৫০-এর গাড়ি। প্লাট-ফর্মেই পড়ে থাকতে হলো রাত এগারটা থেকে। তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম-আগারের যে ব্যবস্থা আছে সেখানে বসলেই বোঝা যায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি রেল-কর্তাদের দরদ কত। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে সবাইকেই তো আইনের চোখে সমান বলে

ধরা হয়েছে, কিন্তু কাজে যে তা কতখানি মেনে চলা হয় তা এদেশের ট্রেণে ভ্রমণ করলেই বুঝতে পারা যায়। আর বোঝা যায় যখন প্লাটফর্মের উপর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম-আগারগুলি চোখে পড়ে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের শিখিয়েছে অর্থমূল্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বিচার করতে—যার যত বিত্ত সে ততো বড়, তাব সাচ্ছন্দ্য তত বেশি। রেল-কর্তারা সাধারণের চোখের উপর এই উদাহরণ যেমন প্রত্যক্ষ করে তুলে ধরেন এমন বোধ হয় আর কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান পারেনি।

রাত একটার সময় গাড়ী এসে প্লাটফর্মে ঢুকলো। কামরাগুলি বন্ধ। ইনেস্‌পেক্‌টারকে বলে সেই কামরা একখানি খুলিয়ে, ভিতরে উঠে বসতে লাগলো প্রায় ঘণ্টা খানেক। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের রেল-কর্তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। ছেলেবেলা থেকে একটা কথা শুনে আসছি—'না'য়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার হওয়া', তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাও সেই পর্যায়েই পড়ে। যার পয়সা কম সে বেশী সুবিধা চাইবে কেন ?

কামরায় যথেষ্ট জায়গা ছিল, বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম।

সকাল ন'টায় এসে পৌছলাম মাত্বরায়।

স্টেশনের সামনেই রাস্তার উপর মাড়োয়ারীদের এক 'ছত্রম্' অর্থাৎ ধর্মশালা। সেখানেই দোতালার একখানি ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো।

মন্দির সেখান থেকে আধ মাইলের বেশী হবে না।

মন্দিরটি একেবারে সহরের মাঝখানে। বিরাট মন্দির। মন্দিরের মধ্যে তুটি দিকে তুটি দেবতা আছেন, দক্ষিণে মীনাক্ষী দেবী, উত্তরে সুন্দরেশ্বর। মন্দির তো নয়, যেন একটি তুর্গ। প্রথমে লোহার রেলিং, তারপর দশফুট পাথরের পাঁচিল। এই পাঁচিলের বহর নেহাৎ

কম নয়, মন্দিরের ক্ষেত্রফল ধরলে লম্বায় হবে ৮৩৭ ফুট, আর চওড়ায় হবে ৭৪৪ ফুট। মন্দিরে ন'টি গোপুরম্ আছে। পূর্ব গোপুরম্‌টি উঁচুতে ১৫২ ফুট। শুনলাম দক্ষিণের গোপুরম্‌টি আরো উঁচু।

ভিতরে ঢুকলেই একটি বাজার,—ফল, ফুল আর খেল্‌নার দোকান। আটটি লক্ষ্মীমূর্তির উপর এই মণ্ডপের ছাদটি স্থাপিত, তাই এর নাম অষ্টলক্ষ্মী মণ্ডপ। এই মণ্ডপের শেষে একটি দ্বার আছে, দ্বারের দু'পাশে গণেশ ও কার্তিকের দুই বিশাল মূর্তি। দ্বার পার হয়েই বারান্দা, বারান্দার দু'পাশে মহাদেবের ও পার্বতীর শবর-শবরী মূর্তি। তারপরেই আর এক মণ্ডপ। এই মণ্ডপের শেষে বিরাট এক পিতলের দ্বার আছে, তাতে প্রতি সন্ধ্যায় ১০০৮টি প্রদীপ জ্বলে। তারপর আবার একটি মণ্ডপ। এই মণ্ডপের মধ্যে মহাদেবের ৬৪ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন লীলা-মূর্তি আছে। তারপরেই পাথর-বাঁধানো স্বর্ণপদ্ম সরোবর। এই সরোবরের মাঝখানে একটি সোনার পদ্ম ভাসছে।

সরোবরের পাশ দিয়ে গেছে বারান্দা। এই বারান্দায় অনেক টিয়াপাখী ও কাকাতুয়া পোষা আছে। মীনাক্ষী দেবী নাকি টিয়াপাখী খুব ভালবাসেন। এই বারান্দায় অনেকগুলি থাম আছে, তার মধ্যে ছ'টি থামে পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মূর্তি খোদাই করা আছে। তার পরই মীনাক্ষী দেবীর মন্দির। কালো পাথরের দণ্ডায়মান দেবীমূর্তি। কর্পূর-আরতির আলোয় স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়ী রূপ উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

মীনাক্ষী-মন্দিরের বাঁ দিকে সোমসুন্দর শিবের মন্দির। মধ্যে শত স্তম্ভের একটি মণ্ডপ আছে। প্রতি স্তম্ভে অপূর্ব কারুকার্যখচিত দেবমূর্তি—হরপার্বতী, অর্ধনারীশ্বর, শঙ্কর-নারায়ণ, নটরাজ, গজানন, মার্কণ্ডেয়, কাল-বরাহ, বীরভদ্র, অগ্নিভদ্র, ত্রিপুরান্তক,—কেবলই মূর্তির পর মূর্তি। তারপর নবগ্রহ-মূর্তি। তারপর সুন্দরেশ্বর দেবের মন্দির—কৃষ্ণপ্রস্তরের শিবলিঙ্গ।

এই সুন্দরেশ্বর শিবের উৎপত্তি সম্পর্কে স্থলপুরাণে একটি কাহিনী আছে।—

স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় নাচগান চলছে। ইন্দ্র তন্ময়। এমন সময় বৃহস্পতি এলেন রাজসভায়। দেবরাজ গুরুকে যোগ্য সম্মান দিলেন না। সেদিকে তখন তাঁর দৃষ্টি নেই। দেবগুরু বৃহস্পতি অপমানিত বোধ করে চলে গেলেন।

ইন্দ্রের যখন হুঁস হলো তখন তিনি বেরুলেন গুরুর সন্ধানে। কিন্তু কোথাও বৃহস্পতির সন্ধান পেলেন না। ইন্দ্র তখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে সব কথা বললেন। ব্রহ্মা বললেন—তোমরা ত্রিশিরাকে গুরু কর।

ইন্দ্র ত্রিশিরাকে গুরু করলেন। ত্রিশিরা দৈত্যকুলের দৌহিত্র। দৈত্যকুলের দিকেই তাঁর টান বেশী। স্বর্গে যজ্ঞ করে দৈত্যদের নামে তিনি আহুতি দেন। যজ্ঞের পুণ্যফল দৈত্যেরা পায়। দেবরাজ ইন্দ্র সে কথা জানতে পেরে একদিন ত্রিশিরার মাথা কেটে ফেললেন। ত্রিশিরা ছিলেন ত্বষ্টা মুনির ছেলে কাজেই ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হলো। ইন্দ্র সেই পাপ হতে মুক্ত হবার জন্য দেবতাদের শরণ নিলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে পাপমুক্ত করে, সেই পাপকে চার ভাগ করে মাটিতে ফেলে দিলেন,—পৃথিবী, জল, উদ্ভিদ্ ও স্ত্রীলোকের উপর এক এক ভাগ এসে পড়লো। সেই পাপের বোঝা আজ অবধি তারা বইছে।

এদিকে ত্বষ্টা মুনি পুত্র-শোকে বড়ই ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি ইন্দ্রকে মারবার জন্য এক যজ্ঞ করলেন। সেই যজ্ঞের ফলে বৃত্র নামে তাঁর এক পুত্র জন্মালো। সেই বৃত্র ইন্দ্রকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বর্গের রাজা হয়ে বসলো।

ইন্দ্র তখন বিষ্ণুর তপস্যা করলেন। বিষ্ণু দেখা দিলেন, বললেন—দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে বজ্র গড়। সেই বজ্রে বৃত্র নিহত হবে।

ইন্দ্র দধীচির কাছে গেলেন। সব শুনে দধীচি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ

করলেন। তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরী হলো। সেই বজ্রের আঘাতে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করলেন। বৃত্রও ঋষির পুত্র, ব্রাহ্মণ। ইন্দ্রের আবার ব্রহ্মহত্যার পাপ হলো। সেই পাপে ইন্দ্র বড় কষ্ট পেতে লাগলেন। তিনি স্বর্গ ছেড়ে চলে গেলেন।

এদিকে মর্ত্যে তখন নহুষ রাজা একশো অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করেছেন। ইন্দ্রহীন স্বর্গে কোন রাজা নেই শুনে তিনি স্বর্গের রাজা হয়ে বসলেন। শচীকে বললেন—আমি এখন ইন্দ্র আর তুমি তো ইন্দ্রাণী, তুমি এখন আমাকে বিয়ে কর।

শচী বললেন—বেশ, আমার বাড়ী এসো। তবে তুমি যে পাল্‌কীতে আসবে সাত জন ঋষি যেন সেই পাল্‌কী বহে আনে।

তখনই সাতজন ঋষি ঠিক হলো নহুষের পাল্‌কী বইবার জন্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অগস্ত্য। অগস্ত্যের বয়স হয়েছে, ঠিক মত পাল্‌কী বইতে পারছেন না। নহুষ ক্রুদ্ধ হয়ে অগস্ত্যের পিঠে পদাঘাত করলেন, বললেন,—সর্প সর্প—অর্থাৎ শীঘ্র চল, শীঘ্র চল!

অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন—তুই সর্প হ'।

নহুষ তখনই সাপ হয়ে গেলেন।

এদিকে স্বর্গে দেবতা, ইন্দ্র ও ঋষিদের কষ্ট দেখে বৃহস্পতির রাগ পড়ে গেল। তিনি ইন্দ্রকে খুঁজতে বেরুলেন। এক কদম্ববনে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন—তুমি শিবের আরাধনা কর, সব পাপ থেকে মুক্ত হবে।

বনের মাঝে এক পুষ্করিণীর তীরে একটি শিবলিঙ্গ দেখতে পেয়ে ইন্দ্র সেখানে তপস্যা করতে সুরু করলেন। শিব দেখা দিলেন। শিবের বরে ইন্দ্র পাপমুক্ত হলেন। ইন্দ্র তখন বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সেখানে দু'টি মন্দির তৈরী করালেন—শিব ও পার্বতীর মন্দির। বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে সেইখানে দেবদেবীর পূজা করে ইন্দ্র স্বর্গে চলে গেলেন।

তারপর কত কাল পরে ধনঞ্জয় নামে সদাগর সেখানে বনের মাঝে শিবমন্দির দেখে রাজাকে খবর দিলেন। রাজা কুলশেখর

পাণ্ড্য দশ দিনের মধ্যে বন পরিষ্কার করিয়ে মন্দিরকে নতুন করে গড়ে তুললেন। মন্দিরের চারিপাশে নগর বসালেন। স্বপ্নে দেবতার আদেশ পেয়ে রাজা দেবতার নাম দিলেন সুন্দরেশ্বর, আর নগরীর নাম হলো—মধুর। সেই 'মধুর'ই এখন লোকমুখে হয়েছে মধুরা—মাদুরা।

প্রবাদ আছে যে দক্ষিণ ভারতে একবার অনাবৃষ্টির সময় রাজা উগ্রপাণ্ড্য, সুন্দরেশ্বরের উপাসনা করে, দেবতাকে প্রসন্ন করে দেশে বৃষ্টি করিয়েছিলেন।

এখানে নাকি একবার স্বয়ং শিব সিদ্ধপুরুষ রূপে কিছুকাল ছিলেন। তাঁর শক্তি ও সাধনায় অবিশ্বাস করে তখনকার রাজা একদিন মন্দির মধ্যে তাঁকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন—আপনি তো সিদ্ধপুরুষ, পাথরের হাতীকে আপনি আখ খাওয়াতে পারেন?

সিদ্ধপুরুষ স্মিত হাস্যে ইঙ্গিত করলেন। সামনে মন্দিরের দেয়ালে খোদাই-করা একটি পাথরের হাতী-মূর্তি সহসা জীবন্ত হয়ে উঠে, শুঁড় দিয়ে রাজার গলার মুক্তার মালা ছিঁড়ে দিলে। রাজা ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, বুঝলেন যে ইনি সত্যই অসামান্য পুরুষ। তখনই সন্ন্যাসীর চরণে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

সেই যে পাথরের হাতী রাজার সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, সেই মূর্তি মন্দির-দেয়ালে খোদাই করা আছে।

সুন্দরেশ্বর শিবের মহাত্ম্য-কথা প্রসঙ্গে রাজা তিরুমলের কাহিনীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ত্রিচিনপল্লীর রাজা তিরুমল দীর্ঘকাল কাস-রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। রাজবৈদ্যেরা অনেক চেষ্টা করেও রোগের কিছুমাত্র উপশম করতে পারেন নি। শেষে রাজা যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন, তখন একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে সুন্দরেশ্বর বলছেন—মধুরায় গিয়ে বাস কর্ গে যা, অসুখ সেরে যাবে।

রাজা পর দিনই সেই ব্যবস্থা করলেন। তিনি ত্রিচিনপল্লী

থেকে মধুরায় চলে গেলেন। এক কোটি টাকা খরচ করে নূতন করে মন্দির তৈরী করালেন। নতুন করে নগরকে সুশোভিত করলেন। ধর্মশালা পুষ্করিণী রাজপথ তৈরী করলেন। নাগরিকদের সুবিধা ও সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই রাজার অসুখ সেরে গেল। তারপর ছত্রিশ বছর তিনি সুস্থ দেহে রাজত্ব করে গেলেন।

দুটি দিন মাদুরায় কেটে গেল। কোথা দিয়ে যে দিন যায় কিছুই বুঝি না। সকালে বিকালে রাত্রে শুধু মন্দিরের মধ্যেই ঘুরে বেড়াই। যত দেখি তত ভালো লাগে। কোন্ ভাস্কর্যটি বাদ দিয়ে কোন্‌টিকে যে ভাল বলবো, কোন্‌টিকে ছেড়ে দিয়ে কোন্‌টিকে দেখবো তা তো বুঝতে পারি না। মনে যেন ধাঁধা লাগে। সৌন্দর্য এখানে সহস্রমুখী। সামান্য দুটি চোখ দিয়ে তাকে ধরে রাখা যায় না। পর্ণপুটের মত ছোট মনের পর্দায় চারিপাশ থেকে অপরূপ শিল্পকলা ভীড় করে আসে। দেখার নেশা ধরে যায়, মনে হয় আরো দেখি, —দেখেই চলি দিনরাত। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের ভারতবর্ষ, যে যুগে শত শত অসামান্য কুশলী শিল্পী প্রখর রুচিবোধ আর অপূর্ব অনুভূতি দিয়ে পাথরের গায় এমন ভাবে সৌন্দর্যের প্রকাশ করে গেছেন।—

"জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী—
অনিত্যের নিত্য প্রবাহিনী,
জীবনের ইতিবৃত্ত নামহীন কর্ম উপহার
রেখে গেল তার
আপনার প্রাণ-সূত্রে, যুগযুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি স্বাক্ষর!"

মন্দির মধ্যে একটি পাথরের থাম দেখলাম। একটি থাম নয়, সরু সরু অনেকগুলি থামের সমষ্টি। তার নাম সপ্তস্বর-স্তম্ভ। এক একটি

সরু থামের গায়ে লোহা দিয়ে আঘাত করলে এক একটি স্থর বাজবে, পাশাপাশি সাতটি থামে সা রে গা মা পা ধা নি—সাতটি স্থর বাজবে। বাজিয়ে দেখলাম, সত্যই।

মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের সামনেও দেখলাম অসংখ্য টিয়াপাখী পোষা রয়েছে বড় খাঁচার মধ্যে। দেবী টিয়াপাখা ভালবাসেন, তাই মানসিক করে দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য ভক্তরা টিয়াপাখী দিয়ে যায়—মায়ের চরণে উৎসর্গ করে বলি দেবার জন্য নয়, মায়ের মন্দিরে সাচ্ছন্দ্যে পালিত হবার জন্য।

আমি আর দ্বিজেন বাবু ঘুরে ঘুরে দেখি। পূর্ণ বাবু ও নরেন বাবু —তুই শিল্পী মন্দিরের মধ্যে একপাশে বসে মন্দিরের রূপ ধরছেন শাদা কাগজের উপর। খগেনবাবু ও দ্বীপেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন নানা জিনিষপত্র, মানে মাতুরার শাড়ী কেনার তালে। খগেন বাবু শুধু শাড়ীই কিনলেন না, নিজের জন্য জামার ছিটও কিনলেন। আর দ্বীপেন, যে বড়-একটা কিছুই গ্রাহ্য করে না, সে-ও বোনের জন্য একখানি শাড়ী কিনে ফেললো। মাতুরায় কাপড়ের যা দোকান, একবার ঢুকলে কিছু না কিনে বেরিয়ে আসা শক্ত।

এক কাপড়ের দোকানের সামনে যোগেনদা'র সঙ্গে দেখা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। বললেন,—কুমারিকা দেখে যাচ্ছি রামেশ্বরে। কয়েকখানি কাপড় কিনলাম এখান থেকে।

কাপড়ের দোকানী ক্যাশ-মেমো খুলে দেখিয়ে দিল—সাহিত্য-সম্মেলনের অনেক রথী-মহারথী ভ্রমণে বেরিয়ে সেখান থেকে কাপড় কিনেছেন, নাম ঠিকানা মেমোতে লেখা।

মাতুরা সহরটা সন্ধ্যায় ঘুরে দেখলাম। মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিরাট নগরী। সব-কিছুই পাওয়া যায়। মুড়ি, চিঁড়ে, ছোলাভাজা, পকৌড়ি—কিছুই বাদ নেই। তবে মিঠাই তুর্লভ। মিষ্টি খেতে ওরা জানে না। সেই জন্য খোট্টাই খাবারের দোকান নজরে পড়লো না।

সেই রাত্রেই ধরলাম তিনেভেল্লীর গাড়ী।

সকাল ৯টায় এসে পৌঁছলাম ত্রিনেভেল্লী। ভারতীয় রেলপথের শেষ স্টেশন।

এখান থেকে চুয়ান্ন মাইল যেতে হবে বাসে। খবর পেলাম সেই বাস্ ছাড়বে দুটোর সময়। পাঁচটি ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

স্টেশনের বাইরে দু-তিনটি কল আছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি যতখানি অবহেলা করা চলে কর্তারা তা বাকী রাখেন নি। পয়সা যাদের নেই তারা তো কষ্ট করতেই জন্মেছে। তারা সব কষ্টই করতে পারে। দুপুর রোদে মাঠের মাঝে সেই কলেই আমরা স্নান করে নিলাম।

তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগ সেরে বেরিয়ে পড়লাম নগর দেখতে। পূর্ণ বাবু বললেন—বাসের টিকিটগুলোও কিনে এনো। আগে থেকে টিকিট না কিনলে বাসে জায়গা পাওয়া যাবে না বলে শুনলাম।

বাসের আপিস স্টেশন থেকে দু-তিন মিনিটের পথ। সেখানকার কাজ সেরেই ঢুকে পড়লাম টাউনে।

পরিচ্ছন্ন সহর। বেশ বড় সহর। পকেটে একখানি চিঠি ছিল। চিঠির মালিকের খোঁজ করতে বেরুলাম। আপিসে গিয়ে দেখি, আপিস বন্ধ, রবিবার। একজন মাত্র দরোয়ান বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম,—বাবুর বাড়ী কোথায়? সে ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে জবাব দিল—এখানে থেকে তিন মাইল দূরে।

চিঠিখানা তার কাছে রেখে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় একখানি মোটর এসে ঢুকলো। মোটর থেকে নামলেন এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক, বললেন—আপনারা কাকে চান?

—ইঞ্জিনীয়ার অনিল ভট্টাচার্যকে।

ইংরেজি ছেড়ে এবার তিনি বাংলায় বললেন—আপনারা বুঝি কলকাতা থেকে আসছেন? আপনাদের তো দু'দিন আগেই আস্বার কথা ছিল।

বুঝলাম তিনিই শ্রীভট্টাচার্য।

ভদ্রলোক তখনই মোটর ছুটিয়ে এলেন স্টেশনে। আমাদের তখনই বাড়ীতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু আমরা সবাই এখন কুমারিকা যাবার জন্য উৎসুক। অনিল বাবু বাসের আপিসে গিয়ে ঘণ্টা খানেক আগেই বাস্ ছাড়ার ব্যবস্থা করলেন। একমাত্র বাঙালী বাসিন্দা তিনি, এখানকার ইলেকট্রিক সাপ্লায়ের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। খাতির ও প্রতিপত্তি তাঁর যথেষ্ট। বাসে তুলে দিয়ে আমাদের জন্য একঝুড়ি পুরী ও জিলিপীর ব্যবস্থা করে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—ফেরার পথে আমার বাড়ী কিন্তু যেতে হবে।

ইতিমধ্যে বেধে গেল এক ঝামেলা। লখনৌ'র বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও ব্যবসায়ী বিদ্যান্ত মশাই ছিলেন আমাদের সঙ্গে, তিনি হন্তদন্ত করে এসে বললেন—তাঁর স্ত্রীর সঙ্গিনীটি বাস্-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

আমরা সঙ্কটে পড়লাম। তখনই আশেপাশের পথগুলি ঘুরে দেখা হলো, মহিলাকে পাওয়া গেল না। অনিল বাবু বললেন—দেখি, আমি খুঁজে পাই কিনা!

মহিলা ইংরেজি জানেন না, সেইটাই তাঁর সহায় হলো। কথা বললেও কেউ বুঝবে না। অনিল বাবু দশ মিমিটের মধ্যে তাঁকে খুঁজে বের করে আনলেন। তারপর অনিল বাবুর দেওয়া পুরী-জিলিপীর সদ্ব্যবহার করে আমরা রওনা হলাম।

তিনেভেল্লী থেকে বরাবর চললাম নাগের-কয়েল। ত্রিবেন্দ্রাম থেকে আরেকটি পথ এসে মিশেছে এখানে। তারপর বরাবর চলেগেছে কন্যাকুমারী অবধি। একটানা পাহাড় চলেছে এক পাশ দিয়ে। আরেক দিকে চলেছে সমতলভূমি। পথের দু'পাশে সারি সারি গাছ রাস্তাটিকে ছায়াশীতল করে রেখেছে। যতদূর দেখা যায় ধানক্ষেতের সীমাহীন বিস্তার, আর তালবনের সমারোহ। মাঝে মাঝে বড় বড় কলার বাগান। মাঝে মাঝে স্বল্প-গভীর দীর্ঘ জলা চোখে পড়ে।

মাটির আল দিয়ে সমুদ্রের জল বাঁধা হয়েছে। পাম্প করে এখানে সমুদ্রের জল ধরা হয়, সেই জল থিতিয়ে পড়লে নীচে থেকে লবণ পাওয়া যায়।

ছ'পাশে মাটির রং কালো, মাঝে সাদা পীচের পথ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। মাঝে মাঝে আমের বাগানও চোখে পড়ে। সমুদ্রের জলরেখা ক্রমে কাছে এগিয়ে আসে। বেলা প্রায় ছ'টা নাগাদ আমরা কুমারিকা এসে পৌঁছলাম।

পৌষ মাস, কিন্তু ওখানে তখনও সূর্য অস্ত যায় নি। ধর্মশালায় জিনিষপত্র রেখে আমরা ছুটলাম সাগরতীরে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা সাগরসঙ্গমে এসে পৌঁছলাম। প্রশস্ত বিশ্রাম-ঘাট, সামনে তিনটি সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস—বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর, ভারত মহাসাগর। এর আগেও সমুদ্র দেখেছি—পুরী, মাদ্রাজ, মহাবলীপুরম্, ধনুষ্কোটি। কিন্তু তাল-তমাল-কুঞ্জের শ্যামলতাকে বেষ্টন করা টুকরো টুকরো পাহাড়কে ঘিরে এমন অসীম জলোচ্ছ্বাস কখনও দেখি নি। অস্তগামী সূর্য রঙের পর রঙ ঢেলে দিচ্ছে আকাশের গায়, সাগরের জলে। অপূর্ব সে দৃশ্য!

সুন্দর আমার দেশ এই ভারতবর্ষ, সুন্দরতম স্থান এই কন্যাকুমারী।

চুপ করে আমরা তাকিয়ে রইলাম সাগরের পানে, আকাশের পানে, অস্তগামী সূর্যের পানে।

সূর্য অস্ত গেল।

ঘাটের সামনে কয়েকটি পাহাড়ের ফালি এমনভাবে এগিয়ে গেছে যে জলোচ্ছ্বাস সেখানে এসে পৌঁছায় না। সেই পাহাড়ের সরু পথের উপর দিয়া সামনে সমুদ্রের মাঝে আরেকটি পাহাড়ে যাওয়া যায়। সেইখানে বসেই নাকি বিবেকানন্দ নব-ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই থেকে তার নাম হয়েছে—বিবেকানন্দ শৈল। পূর্ণ বাবু, দ্বিজেন বাবু প্রভৃতি কয়েকজন সেই 'শৈলে' গিয়ে উঠলেন, আমি ঘাটে নামলাম

স্নান করতে। চারিপাশ পাহাড়ে ঘেরা। জল গভীর নয়। একটা ডুব দিতেই দেহ স্নিগ্ধ হয়ে গেল। সারা অন্তর দিয়ে যেন অনুভব করলাম অনন্ত প্রকৃতির সত্ত্বাকে, পবিত্রতা বুঝি ছুঁয়ে গেল মনের কানায় কানায়।

রাত্রি ঘনিয়ে এলো। তটভূমির একদিক থেকে আরেকদিক পর্যন্ত আলো জ্বলে উঠলো। স্তিমিত বেলাভূমির উপর জলোচ্ছ্বাসের সুর মনের মধ্যে অপূর্ব আবেগ সৃষ্টি করলো।

ফেরার পথে আমরা এলাম মন্দিরে। সমুদ্রের উপরেই মন্দির। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে তেমন কারুকার্যের আড়ম্বর নেই। শান্ত, সৌম্য ভাব। ভিতরে কৃষ্ণপ্রস্তরের পার্বতী-মূর্তি। কুমারী পার্বতী দাঁড়িয়ে আছেন। ভারতে কোথাও পার্বতীর বালিকা-মূর্তি নেই।

অপরূপ মূর্তি। চোখে মুখে অনুপম সুষমা। যেন জীবন্ত দেবী-প্রতিমা, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কপালে একখানি হীরা ঝলমল করছে।

কন্যাকুমারী সম্পর্কে এক পৌরাণিক কাহিনী আছে।—

বাণাসুর ছিলেন অসুরদের রাজা। দীর্ঘকাল তপস্যা করে তিনি ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা তাঁকে বর দেন—কোন পুরুষ তাঁকে মারতে পারবে না!

বাণাসুর তখন স্বর্গরাজ্য জয় করে, ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বর্গের রাজা হ'য়ে বসলেন।

ইন্দ্র গেলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু বললেন—তুমি পৃথিবীতে গিয়ে পার্বতীর তপস্যা কর গে।

ইন্দ্র পৃথিবীতে এলেন। কুমারিকা থেকে আট মাইল দূরে শুচীন্দ্রম গাঁয়ে তপস্যা করতে সুরু করলেন। পার্বতী প্রসন্ন হ'য়ে দেখা দিলেন। ইন্দ্র নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। পার্বতী

যজ্ঞের আগুন থেকে এক কন্যার সৃষ্টি করলেন। সেই কন্যাকে দিলেন ইন্দ্রের হাতে।

সাত বছর বয়সে এই কন্যা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। বাণাসুর তাঁর হাতে নিহত হলেন।

এবার কন্যা তপস্যা সুরু করলেন মহাদেবের। মহাদেব সন্তুষ্ট হ'য়ে দেখা দিলেন। কন্যা তাঁকে পতিরূপে কামনা করলেন। শিব বললেন—বেশ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী আছি। তবে বিয়ের দিন যদি কোন কারণে বিবাহ-লগ্ন উত্তীর্ণ হ'য়ে যায় তাহ'লে আর বিয়ে হবে না।

বিবাহের দিন ঠিক হ'য়ে গেল। যথাসময় মহাদেব বেরিয়ে পড়লেন। পথে দুর্বাসার সঙ্গে দেখা। দুর্বাসা বললেন—ঠাকুর, শাস্ত্রের একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা করে দিয়ে যান।

দুর্বাসার সঙ্গে কথায় কথায় মহাদেবের দেরী হ'য়ে গেল, লগ্ন পার হ'য়ে গেল। তবু মহাদেব চললেন বিবাহ-সভায়। মহাদেব যখন শুচীন্দ্রমে এসে পৌঁছেছেন, তখন নারদ বনের ভিতর থেকে কা কা করে কাকের মত ডেকে উঠলেন। মহাদেব ভাবলেন—তাই তো, সকাল হ'য়ে গেছে! তিনি শুচীন্দ্রমেই রয়ে গেলেন।

কন্যার বিবাহ আর হলো না।

কন্যা চিরদিনের মত কুমারী রয়ে গেলেন, তাই এই দেবীর নাম কন্যাকুমারী।

সেদিনকার ভোজের জন্য যে অন্ন রান্না করা হ'য়েছিল তা সবই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলো। সেগুলি বালি হ'য়ে গেল। এখনও এই সৈকতে বালিগুলির যে দানা চোখে পড়ে যেগুলি বড় বড় ভাতের মত দেখতে।

বাণাসুরের সঙ্গে এখানে কুমারী-কন্যার যে যুদ্ধ হ'য়েছিল তাই স্মরণ করে প্রতি বছর এখানে 'অম্বুচতু' নামে একটি করে উৎসব হয়। অম্বুচতু শব্দটির অর্থ ধনুর্যুদ্ধ।

আমরা যথারীতি নারিকেল, কলা, কর্পূর, গোলাপ-জল দিয়ে দেবীর পূজা করলাম। পূজা-শেষে দেবীর নাট-বারান্দায় বসে রইলাম অনেকক্ষণ। লোকের ভীড় নেই। ছ'চারজন মাত্র দর্শনার্থী, চারিপাশের কালো পাষাণের গায় দীপালোকের প্রতিফলন, স্তিমিত সুগন্ধী ধূপধূনার ধোঁয়ায় মৌন সমারোহ। থমথমে ধ্যানগম্ভীর ভাব। শান্ত পরিবেশ। পূর্ণবাবু ধীরে ধীরে আবৃত্তি করছিলেন ঃ

"বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে
অরণ্যে শ্মশানে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্তং গতিস্তং তমেকা ভবানী।"

নাট-মণ্ডপের পিছনে অলিন্দে দাঁড়িয়ে এক দরিদ্র রমণী করুণ সুরে গান করছিল, তার ছ'চোখ দিয়ে ঝরছে জলের ধারা। নীচ জাতির মেয়ে সে, মণ্ডপে তার ওঠা নিষেধ। মানুষ মানুষকে ভগবানের উপাসনা করার সম-অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। একজনের অহঙ্কার দেবতার সান্নিধ্য থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে আরেকজনকে। পঞ্চমা মেয়েটি দূরে দাঁড়িয়ে জগন্মাতার কাছে তার দুঃখ নিবেদন করছে। সেই করুণ স্বর সমগ্র মন্দিরের মাঝে থম্ থম্ করছে। আমরা তার একটি বর্ণও বুঝি না, কিন্তু সেই সুরে—তার মনোবেদনার অনুভূতি স্পর্শ করছে আমাদের মনকে।

খগেন বাবু একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে ছিলেন। কোন এক সময় মণ্ডপে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা পাথরের খিলানে ভীষণভাবে তাঁর মাথা ঠুকে গেল। মাথায় হাত দিয়ে তিনি বসে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ লাগলো তাঁর সুস্থ হ'তে।

ক্রমে মন্দির জনশূন্য হ'য়ে গেল। আমরাও পথে নামলাম।

যাবার পথে এক ব্রাহ্মণের হোটেল। হোটেলের মালিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আমাদের পরিতোষ করে খাওয়ালেন।

খানিকক্ষণ গল্পগুজব করলেন, বললেন,—বাবু, আমি কলিকাতায় ছিলাম অনেক দিন।

ছত্রমে ফিরলাম—রাত তখন প্রায় এগারোটা। পৌষ মাস, কিন্তু বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। বারান্দায় এক একখানি সতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়লাম।

মাথার উপর জ্যোৎস্না-ভরা নীল আকাশ, সামনে আদিগন্ত সমুদ্র। চোখে ঘুম আসে না, মনে হয়—

"কত কালে কত লোকে কত দিনের শেষে
ধুয়েছিল পথের ধূলা এইখানেতে এসে।
বসেছিল জ্যোৎস্না রাতে স্নিগ্ধ শীতল আঙিনাতে,
কয়েছিল সবাই মিলে নানা দেশের কথা।"

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাবলাম, আমরাই বুঝি আগে উঠেছি। কিন্তু কূয়াতলায় গিয়ে দেখি আমাদের অনেক আগেই সেখানে ভীড় জমেছে। আর সে ভীড় যে তাড়াতাড়ি হাল্কা হবে তারও কোন লক্ষণ নেই। কূয়া থেকে জল তোলার যে বালতিটি আছে, তাতে গুটি দশেক ফুটো আছে, জল তাতে ওঠে না। এক একবারে সামান্য যেটুকু জল উঠছে তাতে কিছুই হয় না, ভীড়ও তাই কমে না। তা ছাড়া যাত্রীদের মধ্যে 'সাহিত্য-সম্মেলনের' অনেকগুলি বাঙালী এসে পড়েছেন, বাঙালীদের জলের খরচ কিছু বেশী।

কূয়াতলা থেকে মুখ ধুয়ে ফিরতে আমাদের প্রায় ঘণ্টা খানেক লেগে গেল।

তারপর সবাই বেরুলাম সূর্যোদয় দেখতে।

ঘাটের চত্বরে তখন বহু জনের ভীড়। চত্বর থেকে নেমে বেলাভূমির উপর এক পাশে পাথরের উপর গিয়ে বসলাম।

পূর্ব আকাশ তখন সবে মাত্র ফরসা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের

নীল জলে সবে মাত্র সবুজ রং ধরেছে। চুপ করে আমরা বসে বসে আকাশে ও সাগরে রঙের খেলা দেখতে লাগলাম। লাল ও হলুদ, সবুজ ও নীল রঙের ঘন ঘন রূপান্তরের মহা সমারোহ। সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস, বেলাভূমির ধূসর প্রান্তরেখার পিছনে ছবির মত রঙীন বাড়ী ও তাল-নারিকেল গাছের ঘন সন্নিবেশ, জলের বুকে উঁচু হ'য়ে আছে পাথরের খণ্ড, সব ছাপিয়ে পূর্ব আকাশে সমুদ্রের জল ঠেলে উঠছে রক্তবর্ণ সূর্য। কিসের যেন একটা আবেগ, কি যেন একটা অনুভূতি, কেমন যেন একটা আনন্দ মনকে পূর্ণ করে তোলে। এই অব্যক্ত অনুভূতিই হয়তো স্বামীজীকে একদিন উদ্বুদ্ধ করেছিল, ওই একখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে তিনি ভারতভূমিকে নতুন করে ভালবাসতে শিখেছিলেন, নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন উর্মিমুখর মৃত্তিকার আবির্ভাব থেকে তুষার-মৌলি গৌরীশঙ্কর অবধি, নতুন ভারতের স্বপ্ন নবরূপে নতুন দীপ্তি নিয়ে জেগেছিল তাঁর মনে। এ যে সত্যই স্বপ্ন-ভরা দেশ!

সূর্য উঠলো। বেলা বাড়লো। রঙের খেলা হারিয়ে গেল, সমুদ্রে ও আকাশে দেখা দিল স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য।

আমরা একে একে নামলাম স্নান করতে। সমুদ্রকে আর একবার উপলব্ধি করলাম সারা অঙ্গ দিয়ে। মনে হলো এই জল দিয়ে যেন অনন্তকে আমি স্পর্শ করছি। পৃথিবীর আদি সৃষ্টির পর যেদিন জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড রূপান্তরিত হয়েছে, দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলেছে বছরের পর বছর ধরে, সেই আদি সৃষ্টির দিন থেকে এই জলের ঢেউ এমনিভাবে এইখানে আছড়ে পড়ছে। যুগান্তর চলে গেছে, কত মানুষ এই জলকে স্পর্শ করে গেছে এই ঘাটে, মহাকালের স্রোতে তারা ভেসে গেছে, কিন্তু জলোচ্ছ্বাস সেই আছে, পৃথিবীর শেষ দিন্ অবধি এমনি ভাবেই ঢেউএর পর ঢেউ নাচবে এই তটের উপর, বেলাভূমির হলুদ সাড়ীর কোলে শাদা ফেনার পাড় বসিয়ে যাবে অবিশ্রান্ত, আদিগন্ত।

যেন দেখতে পেলাম ওই বেলাভূমির উপর দিয়ে পায়ের চিহ্ন এঁকে এক একটি মানুষ এগিয়ে চলেছে। মুণ্ডিত মস্তক, কাঁচা সোনার মত গায়ের রং, গেরুয়া কাপড়খানি ঘুরিয়ে গলার পিছনে গিঁট বাঁধা, হাতে এক একগাছি লাঠি, আগে আগে কয়েকজন ভিক্ষা-পাত্র হাতে নিয়ে চলেছেন, ওঁরা বৌদ্ধ ভিক্ষু মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করতে যাত্রা করেছেন সমুদ্রের এই তট থেকে ভিন্ন তটে। তারপর চলেছেন সন্ত টমাস, যীশুর ত্যাগের কাহিনী শোনাতে। তারপর আচার্য শঙ্কর, আচার্য রামানুজম্, মহাপ্রভু, শ্রীচৈতন্য, তাঁর পিছনে স্বামী বিবেকানন্দ। সকলেরই চোখে জল, সমুদ্র-জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যতানে উঠেছে তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠ—'মানুষকে ভালবাস, জগৎকে ভালবাস, প্রীতি দিয়ে হিংসাকে জয় কর, অন্তরের মাঝে অন্তর্যামীকে উপলব্ধি কর, সেই হলো জীবনের পথ—নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়ণায়!' সেই পদচিহ্ন যেন অবিরত ডাকছে,—ওরে এগিয়ে আয়, আয়—আয়! —মামনুসরঃ!

সেই পদচিহ্নের পানে তাকিয়ে জীবনের জমা-খরচের পাতাগুলি মনে পড়ে। মনে হয় পাটীগণিতের সব অঙ্কগুলিই শাদা, অর্থহীন। শুধু শূন্যতাই সত্য, আগে কিছু নেই, পরেও অব্যক্ত।—

"যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে—
শেষে দেখি হায় সব ভেঙে যায়, ধুলা হয়ে যায় ধুলাতে।"

আবার এলাম মন্দিরে।

মন্দিরের মধ্যে রাত্রির যে গাম্ভীর্য, দিনের আলোয় তা ম্লান হ'য়ে গেছে।

মন্দির-দ্বারে জেলেরা তিন রকম বালি বেচছে,—লাল, কালো আর শাদা। কালো বালি বঙ্গোপসাগরের, লাল আরব সাগরের, আর বড় বড় ভাতের মত দানাওয়ালা শাদা বালি ভারত মহাসাগরের। প্রকৃতির অপরূপ লীলা-চাঞ্চল্যের সাক্ষী এরা।

যে লীলায় একই কড়ি ও শঙ্খের গায় একই জলের ঢেউ লেগে রামধনুর রঙ ফুটে ওঠে, এও সেই লীলা।

কয়েকজন মাদ্রাজী যুবক এসে ধরলো,—এখানে বিবেকানন্দের নামে একটি লাইব্রেরী আছে, সেখানে আমাদের যেতে হবে। বাঙালীরা এখানে এলেই গ্রন্থাগারটি দেখে যান, ও কিছু-কিছু সাহায্য করেন।

চাঁদার খাতাখানি তাঁরা খুলে ধরলেন আমাদের সামনে। দেখলাম আমাদের আগে 'সাহিত্য-সম্মেলন' থেকে যাঁরা এখানে এসেছেন, সকলেই কিছু-না-কিছু দিয়ে গেছেন। আমরাও সেই খাতায় স্বাক্ষর দিলাম। তবে লাইব্রেরীতে যাবার মত সময় তখন আমাদের ছিল না।

ন'টার সময় আমরা বাস্-স্ট্যাণ্ডে এলাম।

কিন্তু ন'টার বাস্ ছাড়লো বেলা দশটায়। ঘণ্টাখানেক পথেই বসে থাকতে হলো। তার মধ্যে আমরা সবাই কয়েকখানি চিঠি লিখলাম। পূর্ণবাবু ও নরেনবাবু পথে বসেই দাড়ি কামিয়ে ফেললেন। তারপর—

ঢালু পথ বেয়ে বাস্ ছুটলো। পিছনে নারিকেলকুঞ্জের আড়ালে হারিয়ে গেল মন্দির, দূরে সরে গেল সমুদ্র।

"যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল প'ড়ে,
যে মণি দুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে॥"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা এসে পৌছলাম শুচীন্দ্রমে।

একটি বিরাট মন্দিরকে কেন্দ্র করে একখানি গণ্ডগ্রাম।

এই শুচীন্দ্রম নামের এক ইতিহাস আছে।

ইন্দ্র একবার গুরুতর অপরাধ করেন। গৌতম ঋষি তাঁকে শাপ দেন। সেই শাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য ইন্দ্র এখানে তপস্যা করেন। এবং তপস্যা করে শাপমুক্ত হন, পবিত্র হন। সেই থেকে এখানকার নাম হয়—শুচী + ইন্দ্রম = শুচীন্দ্রম।

তার আগে এখানকার নাম ছিল জ্ঞানারণ্য। এখানে মহর্ষি অত্রি ও সতী অনসূয়ার আশ্রম ছিল। তাঁরা এখানে তপস্যা করতেন।

সতী অনসূয়ার তপস্যার শক্তি ছিল অপরিসীম। সেই সম্পর্কে পুরাণে একটি গল্প আছে।—

মহর্ষি অত্রি গেছেন তপস্যা করতে। অনসূয়া একা আশ্রমে আছেন। স্বামীর পাদোদক খান আর তপস্যা করেন। তাঁর গুণের কথা দেশময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে। নারদ সেই কথা গিয়ে বললেন স্বর্গে। দেবতারা ভাবলেন,—বেশ, পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ঋষি-পত্নীর কত শক্তি, কত গুণ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এলেন অনসূয়ার আশ্রমে।

অতিথি নারায়ণ। অনসূয়া তাঁদের সেবার ব্যবস্থা করলেন।

আহারের সময় ব্রাহ্মণ তিনজন বললেন—আমাদের একটা ব্রত আছে। আমাদের যিনি পরিবেশন করে খাওয়াবেন তাঁর দেহে কোন আচ্ছাদন রাখা চলবে না। যাঁর দেহে আচ্ছাদন আছে তাঁর দেওয়া অন্ন আমরা খাই না।

অনসূয়া বিপদে পড়লেন। তবে অতিথিদের কথা শুনেই তিনি বুঝলেন যে এঁরা দুষ্ট লোক। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বামীর পাদোদক ছিটিয়ে দিলেন তাঁদের গায়ে। মুহূর্তমধ্যে তিনজন ব্রাহ্মণ তিনটি শিশু হয়ে গেল।

নারদ আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তখনই স্বর্গে গিয়ে খবর দিলেন—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শিশু হয়ে গেছেন।

পার্বতী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ছুটে এলেন স্বর্গ থেকে। অনসূয়ার ঘরে শিশু তিনটিকে দেখে তাঁরা তো অবাক্,—কে যে ব্রহ্মা, কে যে বিষ্ণু, কে যে মহেশ্বর,—তা চেনার উপায় নেই।

এমন সময় অত্রি ঋষি ঘরে ফিরলেন।

দেবীরা অত্রি ও অনসূয়াকে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। অনসূয়া আবার শিশুদের দেবতা করে দিলেন।

শুচীন্দ্রমের মন্দির বেশ বড় মন্দির। ভিতরে শিব, বিষ্ণু ও রামসীতার মূর্তি আছে। মন্দিরের বারান্দায় থামের গায় যে সব মূর্তি আছে, তার সবই প্রায় ভাঙা। শুনলাম ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে মুকীলন মুসলমানরা এইভাবে মন্দিরটিকে শ্রীহীন করেছে।

মন্দিরের মধ্যে ২০ ফুট উঁচু একটি হনুমান মূর্তি আছে দেখবার মত। মন্দিরের কারুকার্য সহজেই মনকে মুগ্ধ করে।

মন্দিরের মধ্যে একটি গাছ আছে। সেই গাছের নীচেই নাকি সুন্দরেশ্বর শিবকে পাওয়া গিয়েছিল।

এখানেও একটি সপ্তস্বুরা-স্তম্ভ দেখলাম। সরু সরু সাতটি পাথরের থাম একসঙ্গে সন্নিবিষ্ট। সাতটি থামের গায়ে পরপর আঘাত করলে সা রে গা মা পা ধা নি সাতটি স্বুর বেজে ওঠে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মন্দির দেখা শেষ করলাম।

সেখান থেকে বাসে করে এলাম নাগের কয়েল।

এখানে শেষ-নাগের মন্দির আছে, তাই এই নগরটির নাম 'নাগের কয়েল।' 'কয়েল' শব্দের মানে মন্দির।

আধঘণ্টা পরেই বাস। সে বাস না ধরলে তিনেভেল্লীতে ট্রেন ধরতে পারবো না। মন্দির দেখার সময় আমাদের ছিল না।

সেখানে আমরা রীতিমত ফলাহার করলাম। কলা ডাব কমলা-

লেবু পাঁউরুটি কফি—কিছুরই অভাব হলো না। আহারাদি শেষ করে নতুন বাসে উঠে আমরা তিনেভেল্লী যাত্রা করলাম।

বেলা চারটের সময় আমরা তিনেভেল্লীতে এসে পৌঁছলাম।

অনিলবাবু আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিলেন, বললেন—আপনাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

—ট্রেন ছাড়তে মাত্র আর এক ঘণ্টা বাকি, যাই কি করে?

অনিলবাবু বললেন—গাড়ীতে যাবেন, ঠিক সময় এখানে পৌঁছে দেবো।

অনিলবাবুর মোটরে আমরা যাত্রা করলাম।

স্টেশন থেকে সাড়ে তিন মাইল পথ, পালামকোটা। সেখানে নদীর ধারে ছবির মত বাড়ী, চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কোয়ার্টার্স। ইঞ্জিনীয়ার-পত্নী আমাদের জলযোগ করালেন। দীর্ঘকাল পরে তাঁর বাড়ীতে আমরা আবার চা খেলাম। এতদিন কফি খেয়ে কাটছিল।

পাঁচটার ক' মিনিট আগেই আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম। অনিলবাবুর লোকজন আমাদের জন্য কামরায় জায়গা রেখেছিলেন। আমাদের কোন অসুবিধা হলো না।

ত্রিচিনপল্লী।

কথাটির মানে হলো সুন্দর ছোট নগর। 'ত্রি' মানে শ্রী, 'চিন' মানে সুন্দর, 'পল্লী' মানে নগর।

এই নামের আরেকটি কাহিনীও আছে।—

পুরাকালে এখানে গভীর জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায় এক রাক্ষস বাস করতো। তার ভয়ে এর আশেপাশে মানুষ আসতো না। শেষে সুরবত্তিদান নামে এক বীর পুরুষ সঙ্কল্প করলেন যে সেই রাক্ষসকে মারবেন এবং শেষে ত্রিশিরা রাক্ষস তাঁরই হাতে নিহত হলো।

সুরবত্তিদান তখন জঙ্গল সাফ করে সেখানে নগর বসালেন। নিজে হলেন রাজা। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, এই বীর পুরুষের নামে নগরের নাম হলো না, নাম হলো সেই রাক্ষসের নামে—ত্রিশিরাপল্লী, পরে ইংরেজদের উচ্চারণ দোষে হলো—ত্রিচিনপল্লী।

শুনলাম কাবেরী নদীর তীরে এক মন্দির আছে, সেখানে সুরবত্তিদানের মূর্তি পূজা করা হয়। তাঁকে দেবতা বলে ধরা হয়, নাম সুব্রহ্মণ্যদেব।

তা সে নামের যে কারণই থাক না কেন, নগরটি মোটেই ছোট নয়।

ঘোড়ার গাড়ীতে মালপত্র চড়িয়ে আমরা তো এক গলির মধ্যে এক 'চৌলট্রি তে' গিয়ে উঠলাম। সেখানে সিন্ধী বাস্তহারা মেয়েদের জন্য এক দরজী-শিক্ষালয় চলছে। ম্যানেজার একজন মাড়োয়ারী। তিনি মুখ বেঁকিয়ে যে-ভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করলেন, তাতে বুঝলাম—বাঙালী হয়ে এখানে আসা আমাদের অপরাধ হয়ে গেছে। এই ধরণের ব্যবহার দক্ষিণ ভারতে আর কোথাও পাইনি।

কিন্তু তখন আর যাই কোথা। মাত্র একটা দিন থাকবো শুনে, ম্যানেজার মুখটা বেঁকিয়ে সামনের দরদালানের একটা অংশ আমাদের ছেড়ে দিলেন। ছুটি দেওয়াল-আলমারীতে সুটকেশগুলো রেখে আমরা তখনই বেরিয়ে পড়লাম।

ত্রিচিনপল্লী প্রাচীন সহর। সম্রাট্ অশোকের শিলালিপিতে এই সহরের নাম পাওয়া যায়। তখন এই জনপদের নাম ছিল—উরেউর। ত্রিচিনপল্লীর মাইল খানেক দূরেই এই জনপদ।

এই সহরে অনেকবার অনেক যুদ্ধ হয়ে গেছে। হিন্দুদের কাছ থেকে মুসলমান, তারপর মারাঠা, নিজাম, ফরাসী ও ইংরেজ প্রভৃতির

কাছে কয়েকবার এই নগরটির হাতবদল হয়। সেই সব শাসকদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন অষ্টাদশ শতকের রাজা বিশ্বনাথ নায়েক। তিনি এখানকার মন্দিরটির সংস্কার করেন, নগরটিকেও সুন্দর করেন।

নগরের মাঝেই রক্ টেম্পল—শৈল-মন্দির।

দু'শো তিয়াত্তর ফুট উঁচু একটা পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় একটি মন্দির। নীচে থেকে উপর অবধি বরাবর সিঁড়ি গেছে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। সুড়ঙ্গ পথে পাহাড়ী সিঁড়ি। কিছুটা উঠলেই যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেই জন্য মাঝে মাঝে বিশ্রামের মণ্ডপ করা আছে। প্রথমেই একখানি বড় ঘর। তারপর সুরু হলো সিঁড়ি। পঞ্চাশটি সিঁড়ি ওঠার পর একটি মণ্ডপ। মণ্ডপে একশোটি স্তম্ভ। এখানে স্তম্ভ কখনও মসৃণ সাধারণ স্তম্ভ হয় না, স্তম্ভ হলেই তার। গায় কারুকার্য থাকবেই। দেয়ালেও অনেক দেবদেবীর চিত্র আছে।

আবার একশো দশটি সিঁড়ি। তারপর আবার একটি মণ্ডপ। এখানে দেয়ালের গায় একটি গল্পের ছবি দেওয়া আছে।—

রত্নাবলী নামে এক চেট্টিবালিকা শ্বশুর-বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মা থাকেন কাবেরী নদীর অপর পারে। মায়ের কাছে খবর গেল। মা তখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু নদীর তীরে যখন এলেন তখন জলঝড় সুরু হয়ে গেছে। সেই দুর্যোগের মাঝে মা আর নদী পার হতে পারলেন না।

এদিকে মেয়েটি একান্ত ভাবে ভগবানকে ডাকতে লাগলো।

আপনভোলা মহেশ্বরের কানে সেই ডাক পৌঁছালো। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে রত্নাবলীর কাছে এলেন। পার্বতী এলেন রত্নাবলীর মায়ের রূপ ধরে।

সারা রাত মেয়েটির সেবা করে, তাকে সুস্থ করে সকাল বেলা হর-গৌরী চলে গেলেন।

তখন জলঝড় থেমেছে। রত্নাবলীর মা এবার নদী পার হয়ে

মেয়ের বাড়ী এলেন। বললেন—সারারাত নদীর তীরে বসে ছিলাম, পার হতে পারি নি।

মেয়ে তো অবাক, বললো—তবে যে সারারাত তুমি আমার পাশে বসে ছিলে?

এবার তারা বুঝলো দেবতার করুণার কথা।

এই মাহাত্ম্য-কাহিনী থেকে এখানকার দেবতার নাম হয়েছে মাতৃ-ভূদেবেশ্বর। আবার কেউ কেউ বলেন—মথুর ভূতেশ্বর।

একশো চল্লিশটি সিঁড়ি পার হয়ে সিঁড়ির পাশে পাওয়া গেল একটি জানালা। সেই জানালা দিয়ে নীচেকার শহরটি দেখায় ছবির মত। উড়োজাহাজ থেকে তোলা ছবি যেন!

একশো পঁচাশীটি সিঁড়ি উঠলে একটি মণ্ডপে লক্ষ্মীদেবীর এক মূর্তি আছে।

ত্ব'শো ষোলটি সিঁড়ি উঠলে শ্রীত্বর্গা ও কার্তিকের মূর্তি ছোট ছোট মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত।

তিনশো ষাটটি সিঁড়ি পার হলে মূল মন্দির। এখানে শিব ও পার্বতী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের সামনে বৃহৎ এক বৃষমূর্তি। দেয়ালে নটরাজ-মূর্তি, আর অনেক পৌরাণিক মূর্তি খোদাই করা আছে। মূল মন্দিরের আশেপাশে আরও অনেক দেবতা রয়েছেন। এখানকার জানালা দিয়ে বহুদূর অবধি দৃষ্টি চলে যায়, দূরে কাবেরী নদী ও শ্যামল বনরাজির দৃশ্য মনকে স্নিগ্ধ করে তোলে।

আরও উপরে উঠতে হলো। এতক্ষণ সিঁড়ি উঠছিলাম পাহাড়ের ভিতর দিয়ে, মাথার উপর পাষাণের ছাদ ছিল, চারিপাশে ছিল পাষাণের দেয়াল। এবার সিঁড়ি এলো পাহাড়ের চূড়ায়, পাহাড়ের গা বেয়ে। ত্ব'পাশে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা—একেবারে চূড়া অবধি। উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের এক বিশালকায় মূর্তি।

নীচে সমগ্র ত্রিচিনপল্লী। বাড়ীর ছাদ, গির্জার চূড়া, রেল-স্টেশন,

পথ, শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির, জম্বুকেশ্বরের মন্দির, কাবেরীর পুল, তার পিছনে দিগন্তবিস্তারিত বন-প্রান্তর, বিলীয়মান পাহাড়ের সারি,—সব একাকার হয়ে গেছে। নীচে যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, উপর থেকে তা সমভূমির একটা বিচিত্র ব্যতিক্রম শুধু। নীচের বিরাটত্ব উপর থেকে নগণ্য, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ।

শৈল-মন্দির থেকে যখন নামলাম, তখন বেলা হয়েছে।

শ্রীরঙ্গম যাবার জন্য আমরা বাস ধরলাম। ছ' মাইল পথ। কাবেরী নদীর পুল পার হয়ে এসে নামলাম মন্দিরের সামনে।

প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরের চেয়ে দুর্গ বলাই ভালো। পর পর সাতটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ৪৯৮ বিঘা জমি। সর্বসমেত একুশটি গোপুরম্ অর্থাৎ তোরণ আছে। প্রথম প্রাচীরের চারিপাশে চারিটি গোপুরম্। প্রাচীরের মধ্যে মন্দির পরিক্রমণ পথ, দোকান-পাট, বাজার-হাট, বসত-বাটি।

তারপর আবার আরেকটি পাঁচিল। তারপরে আবার পরিক্রমণ পথ, দোকান-পাট, বাজার হাট, বসতবাটি।

তিনটি পাঁচিল এই ভাবে পার হয়ে চতুর্থ তোরণের পর আসল মন্দির সুরু হলো।

এটি যেন একটি দুর্গ। এখানে পাওয়া যায় না এমন জিনিষ নেই।

প্রাচীরের লম্বা-চওড়ার একটা হিসাব দিলে মন্দির সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাবে :

প্রথম	প্রাচীর ৩০০০ ফুট লম্বা,	চওড়া ২৫০০ ফুট।
দ্বিতীয়	প্রাচীর ২১০০ ফুট লম্বা,	চওড়া ১৮০০ ফুট।
তৃতীয়	প্রাচীর ১৬০০ ফুট লম্বা,	চওড়া ১২৫০ ফুট।
চতুর্থ	প্রাচীর ১২৩০ ফুট লম্বা,	চওড়া ৮৪০ ফুট
পঞ্চম	প্রাচীর ৭৭০ ফুট লম্বা,	চওড়া ৫০০ ফুট
ষষ্ঠ	প্রাচীর ৪২৫ ফুট লম্বা,	চওড়া ২৯০ ফুট।

সপ্তম প্রাচীর ২৪০ ফুট লম্বা, চওড়া ১৮০ ফুট।

চতুর্থ প্রাচীরের গোপুরম্ই সবচেয়ে উঁচু—১৬৪ ফুট। ন'তলা। প্রবেশ-পথ পঁচিশ ফুট উঁচু, বারো ফুট চওড়া। অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত।

প্রতিটি গোপুরম্ বিরাট।

ভিতরে শত স্তম্ভ ও সহস্র স্তম্ভ যুক্ত মণ্ডপ। প্রতিটি থামের গায়ে বড় বড় অশ্বারোহী মূর্তি, এক হাতে খোলা তলোয়ার, আরেক হাতে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছে। দেয়ালে দেয়ালে দেবদেবীর অসংখ্য মূর্তি। মূল মন্দিরে আছে নারায়ণ মূর্তি—শ্রীরঙ্গনাথ স্বামী। দীপালোকের আব্ছা অন্ধকারে আমরা প্রথমে কিছু ভাল দেখতে পাইনি, কিন্তু পুরোহিত যখন আমাদের নৈবেদ্যের কর্পূর দিয়ে দেবতার আরতি করলেন তখন আমরা দেখলাম মন্দিরের মধ্যে এক দিক থেকে আরেকদিক পর্যন্ত নারায়ণের শায়িত মূর্তি। অনন্ত-নাগের উপর তিনি শুয়ে আছেন। মাথার উপর শেষনাগ তাঁর ফণা ছড়িয়ে দিয়েছে। পায়ের কাছে লক্ষ্মী, ভূদেবী ও শ্রীদেবী, নাভি থেকে উঠেছেন ব্রহ্মা। একখানি নীল পাথরের তৈরী দশ হাত দীর্ঘ মূর্তি। মুখে শান্ত সৌম্য ভাব। এই ধরণের মূর্তি ভারতে আর কোথাও নেই।

এই রঙ্গনাথস্বামীর মূর্তি বহু প্রাচীন।

ইনি ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের কুলদেবতা। শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কা বিজয় করে দেশে ফিরলেন, তখন মহা ধূমধাম করে তাঁর অভিষেক উৎসব হলো। অভিষেকের দিনে শ্রীরামচন্দ্র সকলকেই কিছু-না-কিছু দান করলেন। যে যা চায় তাই পায়। বিভীষণ এসে দাঁড়ালেন সামনে। স্বর্ণলঙ্কার রাজা বিভীষণ, তাঁর তো মণি-মুক্তার অভাব নেই। শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে আর কি দেবেন? একটু চিন্তা করে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—তুমি প্রার্থী, তোমাকে ধনরত্ন কি দোব? তোমার তো কিছুরই অভাব নেই। তোমারই মনোমত এক মহা মূল্যবান দ্রব্য আমি তোমাকে দোব। তুমি এই নারায়ণ মূর্তি নাও,

ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম। এই মূর্তি লঙ্কায় স্থাপন করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করো।

বিভীষণ সানন্দে মূর্তিটি গ্রহণ করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন—কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, পথে মূর্তিটি কোথাও ভূমিতে নামিও না।

বিভীষণ পুষ্পক রথে যাত্রা করলেন।

পথে কাবেরী নদী দেখে তাঁর স্নান করার ইচ্ছা হলো। তিনি নামলেন। কিন্তু বিগ্রহ তো মাটিতে রাখা চলবে না। এক ব্রাহ্মণ বালককে দেখে তিনি ডাকলেন, বললেন—খোকা, তুমি আমার এই বিগ্রহটি ধরো, আমি কাবেরীতে স্নান করে নিই।

বালক বিগ্রহটি হাতে নিলে।

বিভীষণ স্নান করতে চলে গেলেন।

ফিরে এসে দেখেন, ছেলেটি বিগ্রহ মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। বিভীষণ তাড়াতাড়ি বিগ্রহটি তোলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বিগ্রহটিকে তুলতে পারলেন না। বিভীষণের চেষ্টা দেখে বালক হেসে উঠলো।

বিভীষণের বেজায় রাগ হলো। একটুকরো পাথর নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন বালককে।

কিন্তু সেই পাথর বালকের গায় লাগবার আগেই বালক বাতাসে মিলিয়ে গেল। বিভীষণ এবার বুঝলেন—এ দেবতার মায়া। সেইখানেই এক মন্দির করে, দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি মনের দুঃখে লঙ্কায় ফিরে গেলেন।

সে হলো ত্রেতাযুগের কথা।

তারপর একে একে অনেক ভক্ত এই মন্দিরটিকে ধীরে ধীরে বড় করে, সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন। এখন এই বিগ্রহের অলঙ্কার যা আছে তারই মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা।

অষ্টম শতকে ভক্ত তিরুমংগই আলোয়ার এই মন্দিরের জন্য অনেক অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর এক একটি শিষ্যের এক এক

রকম গুণ ছিল। একজন জানতো ফুঁ দিয়ে চাবি খুলতে, একজন জানতো মানুষের ছায়ার উপর পা রেখে তার গতিরোধ করতে, একজন জানতো জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে। এই সব শিষ্যদের কাছ থেকে অলৌকিক উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহ করতেন।

মাঝে মন্দিরের পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। তখন আচার্য রামানুজম্ এই মন্দিরের ভার লন। তাতে স্বার্থপর পাণ্ডাদের অনেক অসুবিধা হয়। তাঁরা রামানুজকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ অবধি তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। আচার্য রামানুজ ষাট বছর ধরে এই মন্দির পরিচালনা করেন।

মন্দিরের মধ্যেই একটি পুষ্করিণী আছে, তার নাম চন্দ্র পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পাশেই একটি মণ্ডপে এক স্ত্রীমূর্তি আছে। নিত্য মাখন ও মিশ্রী দিয়ে এই মূর্তির ভোগ হয়।

ইনি কোন এক মুসলমান নবাবের মেয়ে।

নবাব এসেছিলেন মন্দির লুঠ করতে। মন্দিরের রত্ন-অলঙ্কার লুকানো ছিল। নবাব প্রধান পাণ্ডাকে ধরে বললেন—সব বের করে দাও।

প্রধান পাণ্ডা সে কথা শুনলেন না।

নবাব তাঁকে কঠোর সাজা দিলেন।

পাণ্ডার কান্না শুনে নবাবের মেয়ে স্থির থাকতে পারলেন না। পাণ্ডাকে ছেড়ে দিলেন, বললেন—কিন্তু আপনার দেবতাকে একবার আমি দেখতে চাই।

যবনকন্যার তো হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নেই।

পাণ্ডা বললেন—আপনাকে তো মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবো না, তবে আমার দেবতাকে যদি সত্যি আপনি দেখতে চান, তাহলে আপনার ঘরে বসেই তাঁকে ডাকুন, তিনি দেখা দেবেন।

—কতদিনে তিনি দেখা দেবেন?

—তিন দিনে। আমার দেবতা বড় জাগ্রত। তিনদিনেই তিনি দেখা দেবেন।

যবনকন্যা ঘরে বসে এক মনে ডাকতে লাগলেন। তৃতীয় রাত্রে শ্রীরঙ্গনাথস্বামী সত্যই তাঁকে দেখা দিলেন, নবাব-নন্দিনী রঙ্গনাথ-স্বামীর পূজাও করলেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এখানে চারমাস থেকে চতুর্মাস্য ব্রত করেছিলেন। মন্দিরের মধ্যে প্রহ্লাদ ও নৃসিংহ মূর্তি দেখে তাঁর ভাবাবেশ হয়েছিল।

এখানকার বিখ্যাত শৈব পণ্ডিত ছিলেন বেঙ্কট ভট্ট, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব নিয়ে নানা আলোচনা করেন। পরে বেঙ্কট ভট্ট বৈষ্ণব হয়ে যান। এখনও তাঁর শিষ্যেরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে পরিচয় দেন।

শ্রীচৈতন্য এখানে নিত্য কাবেরীতে স্নান করতেন ও মন্দিরে কীর্তন করতেন।

শ্রীরঙ্গমের এই মন্দিরটি তৈরী করতে পুরো ষাট বছর লেগেছিল।

শ্রীরঙ্গমের মন্দির থেকে চার মাইল দূরে জম্বুকেশ্বরের মন্দির।

পাঁচটি প্রাকারের মধ্যে ২৪০ বিঘা জমি ব্যেপে প্রকাণ্ড মন্দির।

এখানে শিব জলের মধ্যে বিরাজমান। যেখানে শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত তার নীচে একটি ঝরণা আছে, সেই ঝরণা দিয়ে কাবেরীর জল নিয়ত উৎসারিত হচ্ছে। পাছে দেবতা জলে ডুবে যান সেজন্য লোক আছে, তার কাজ হলো নিয়ত জল ছেঁচে ফেলে দেওয়া।

দক্ষিণ ভারতে পাঁচটি লিঙ্গ আছে—ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম। শিবকাঞ্চিতে ক্ষিতি-লিঙ্গ, জম্বুকেশ্বরে অপ-লিঙ্গ, কালহস্তাতে মরুৎ-লিঙ্গ, চিদাম্বরমে ব্যোম-লিঙ্গ ও তিরুবান্ন-মলয়ে তেজ-লিঙ্গ।

তাছাড়া মল্লিকার্জুনে জ্যোতির্লিঙ্গ আছে, কিন্তু সেস্থান বড় দুর্গম।

এই মন্দিরের মধ্যে সহস্র স্তম্ভের একটি মণ্ডপ আছে, সূর্যতীর্থম্ নামে একটি পুষ্করিণীও আছে।

মন্দিরের মধ্যে একটি অতি পুরাণো জামগাছ আছে। এই গাছের নীচেই নাকি শিবলিঙ্গটি পাওয়া গিয়াছিল। গাছটিকে রক্ষা করেই তার সামনে মূল শিবমন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। এই গাছ থেকেই এই লিঙ্গটির নাম জম্বুকেশ্বর।

আবার কেউ কেউ অন্যকথাও বলেন। জম্বুক ঋষির এখানে আশ্রম ছিল, জম্বুক প্রতিদিন এই দেবতার পূজা করতেন বলেই এই দেবতার নাম জম্বুকেশ্বর।

আবার কেউ বলেন, এখানে জম্বু সাহেবের জঙ্গল ছিল, সেই থেকেই নামটা এসেছে। এ জনশ্রুতি অনেক আধুনিক।

এখানে যে পার্বতী মূর্তি আছে তাঁর নাম অখিলেশ্বরী। এখানকার ভক্তদের বিশ্বাস পার্বতী এখনও এখানে তপস্যা করছেন।

মন্দিরের গায় একটি বিশাল হাতী ও একটি প্রকাণ্ড মাকড়সার ছবি খোদাই করা আছে। এই মাকড়সা ও হাতী হলো জম্বুকেশ্বরের আদি ভক্ত।

জামগাছের তলে শিবকে যখন দেখা গেল, তখন মাকড়সা দেখলো—শিবের মাথায় কোন আচ্ছাদন নেই। সে জাল বুনে বুনে শিবের মাথায় একটি আচ্ছাদন করে দিলে।

হাতী এলো মহাদেবের জলাভিষেক করতে। শুঁড় দিয়ে মহাদেবের মাথায় সে জল দিল। তার চোখে পড়লো, মহাদেবের মাথার উপর একটি মাকড়সার জাল। স্থানটিকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সে জালটি ছিঁড়ে দিলে।

মাকড়সার আবার জাল বুনে দিলে।

হাতী পরদিন এসে আবার জাল ছিঁড়ে দিলে।

এই ভাবেই ক'দিন যায়, শেষে মাকড়সা একদিন ভীষণ রেগে হাতীর শুঁড়ের মধ্যে ঢুকে হাতীকে কামড়ালো। বিষের যাতনায় অস্থির হয়ে হাতী মাটিতে শুঁড় আছড়ে মাকড়সাকে বের করলো, তারপর পায়ে চেপে তাকে পিষে মারলো।

কিছুক্ষণ পরে মাকড়সার বিষে হাতীও মারা পড়লো।

শিব তখন দু'জনকেই আবার বাঁচিয়ে দিলেন। দুই ভক্তকে রেখে দিলেন নিজের কাছে। দুই ভক্তের প্রতিমূর্তি তাই এখন মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা আছে।

মন্দিরটি দক্ষিণের আর-সব মন্দিরের মতই অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত।

সেইদিনই তিনটের ট্রেনে আমরা তাঞ্জোর যাত্রা করলাম।

ইতিমধ্যে এক মজার ব্যাপার ঘটলো।

শ্রীরঙ্গমে আহারাদির পর হোটেলের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। পূর্ণবাবু গেছেন পান কিনতে। পান নাহলে তাঁর একদণ্ড চলে না।

ফিরে এসে পূর্ণবাবু বললেন—কাজু বাদাম এখানে খুব সস্তা, মাত্র দশ পয়সায় কোয়ার্টার পাউণ্ড, অর্থাৎ আধপোয়া। কিছু কিনলে হয়, পথে খাওয়া যাবে।

খগেনবাবু তখনই চললেন কিনতে। আমরা সহগামী হলাম।

পূর্ণবাবু, নরেনবাবু, খগেনবাবু প্রত্যেকেই এক দোকান থেকে দু'কোয়ার্টার করে কাজু বাদাম কিনে ফেললেন, বললেন—তোমরা কিনবে না?

বললাম—দরকার নেই, আপনারা যা কিনলেন, তা থেকে কিছু-কিছু পেলেই চলবে।

দাম দেবার সময় বাধলো গোলযোগ। এঁরা এক একজন পাঁচ

আনা করে দিলেন। দোকানদার বললো—মোর মোর, গিভ মোর—আরো দাও।

—কেন ?

—কোয়ার্টার পাউণ্ড, প্রাইস ট'-আন্না সিক্স্ পাই।

পূর্ণবাবুও ইংরেজীতে বললেন—তাইত দিয়েছি, টু-আনা সিকস্ পাই—দশ পয়সা, দশ পয়সা, পাঁচ আনা।

—নো নো, কোয়ার্টার পাউণ্ড ট'-আন্না সিক্স্ পাই।

আমরা তো থ'।

দোকানী তখন বাক্স থেকে 'ট'-আন্না সিক্স্ পাই' বের করে আমাদের দেখালো—একটি আধুলী, একটি দু'আনি ও দুটি পয়সা, অর্থাৎ টেন আন্না সিক্স পাই।

আমরা ভেবেছিলাম 'ট'-আন্না সিক্স্ পাই' মানে 'টু-আন্না সিক্স্ পাই' আসলে কিন্তু তা টেন-আনা সিক্স্ পাই।

কিন্তু তখন আর কথা কি, প্রত্যেকে একটাকা পাঁচ আনা করে দিয়ে এলেন। একপো কাজু বাদামের দাম এক টাকা পাঁচ আনা। সস্তায় সওদা করার সখ মিটে গেল।

খগেনবাবু বললেন—আর কিছু কিনবো না এখান থেকে। এদের উচ্চারণের এতো দোষ, কথাই বুঝি না।

কিন্তু তখন আর কেনার বিশেষ কিছু বাকি নেই। মোটা টাকার সওদা তার আগেই আমাদের হয়ে গেছে মাদুরায়। অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট টাকার সৌখান মাদুরা শাড়ী সবাই কিনেছেন। অমন দ্বীপেনও যে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে কোথাও কিছু কিনবে না, সে-ও মাদুরায় বোনের জন্য পনেরো টাকা দিয়ে একখানি শাড়ী কিনে ফেলেছে—সংসর্গজা দোষগুণাঃ জায়ন্তে।

ঠিক সন্ধ্যাবেলা আমরা তাঞ্জোরে এসে পৌঁছলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। খগেনবাবু ও দ্বীপেন বললো—আমরা তাঞ্জোর যাবো না, মাদ্রাজ চললাম। কলকাতায় দেখা হবে।

তাঞ্জোরে এলাম আমরা চারজন।

স্টেশনে লেফট্ লাগেজে মালপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লাম মন্দির দেখতে।

তাঞ্জোর বেশ বড় সহর।

ত্রিচিনোপল্লীর মত এই সহরটিরও একটি জন্মকথা আছে।—

অনেক—অনেক দিন আগে এখানে জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেখানে এক রাক্ষস থাকতো তার নাম তানজন। যা পেত তাই সে ধরে খেত। জন্তু-জানোয়ার মানুষ কিছুই বাদ যেত না। দেখতে দেখতে বনভূমি প্রায় প্রাণীশূন্য হয়ে গেল। কিন্তু বনের জীবজন্তু ফুরিয়ে গেলেও ক্ষুধা তো আর ফুরায় নি, রাক্ষস একদিন বনের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এক ধ্যানমগ্ন ঋষিকে দেখতে পেলে। তখনই ঋষির ঘাড়ের উপর সে লাফিয়ে পড়লো।

ঋষি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন।

ভক্তের ডাক ভগবানের কাছে গিয়ে পৌঁছালো। বিষ্ণু তখনই এসে দেখা দিলেন। বিষ্ণুকে দেখেই তো রাক্ষস দিশাহারা হয়ে পড়লো। ঋষিকে ছেড়ে সে বিষ্ণুর চরণ জড়িয়ে ধরলো। বললো—আমাকে ক্ষমা করুন, প্রভু!

বিষ্ণু তাকে ক্ষমা করলেন। বললেন,—কি বর চাও বল?

বিষ্ণুর স্পর্শ পেয়েই রাক্ষসের মন তখন বদলে গেছে, বললো—প্রভু, এ স্থান তো আমার জন্য প্রাণীশূন্য হয়ে গেছে। আপনি আশীর্বাদ করুন, এখানে যেন আবার মানুষের বসতি হয় আর সেই জনপদ যেন আমারই নামে খ্যাত হয়।

বিষ্ণুর আশীর্বাদে সেখানে আবার মানুষের বসতি হলো। ধীরে

ধীরে গড়ে উঠলো নগর। সেই নগরের নাম হলো 'তানজন'—লোকমুখে তাঞ্জোর।

দু'খানি ঝট্‌কা অর্থাৎ টাঙ্গা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মন্দিরের দিকে।

প্রশস্ত পথ, সারি সারি দোকান আর বড় বড় বাড়ী পার হয়ে ঝট্‌কা এসে পড়লো দুর্গের সামনে। পরিখার পুল পার হয়েই দুর্গতোরণ। দুর্গটির নাম শিবগঙ্গা। দুর্গমধ্যেই মন্দির।

বৃহদীশ্বর মন্দিরে ঢুকতেই একটি বিশেষত্ব চোখে পড়লো। দক্ষিণে আর যে-সব মন্দির আছে, তাদের গোপুরম্‌ই আসল মন্দিরের চূড়া থেকে অনেক বেশী উঁচু। কিন্তু এখানে আসল মন্দিরটির চূড়াই গোপুরম্‌কে ছাড়িয়ে উঠেছে। মন্দিরের চূড়াটি ২১৬ ফুট উঁচু। এই মন্দিরটি চোল রাজারা তৈরী করেছিলেন বারো-শো বছর আগে।

প্রথম গোপুরম্ পার হয়েই একটী প্রাঙ্গণ, তারপর দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে মন্দির। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মন্দিরের মত সমস্ত মন্দির, প্রাঙ্গণ ও বারান্দা জুড়ে কোন ছাদ নেই, সবই উন্মুক্ত চত্বর। মন্দিরের সামনেই প্রকাণ্ড কালো পাথরের বৃষ। বৃষটি বসে আছে, উচ্চতায় বারো ফুট। শুনলাম এতবড় বৃষ নাকি আর কোথাও নেই,—অবশ্য রামেশ্বর ছাড়া।

এই বৃষ নিয়েও একটি গল্প আছে।—

একটি জীবন্ত পাথর কেটে-ছেঁটে এই বৃষটি তৈরী করা হয়েছিল। জীবন্ত পাথর। ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। শেষে যখন এত বড় হয়ে যায় যে শিবলিঙ্গকেও উচ্চতায় ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম হলো, তখন এক ভক্ত পূজারী এসে বৃষের মাথায় এক চড় বসিয়ে দিলেন, বললেন—কি, হচ্ছে কি? তুই শেষে শিবকেও ছাড়িয়ে যাবি?

ব্যস্, বৃষের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেল।

সামনেই মন্দিরমধ্যে শিবলিঙ্গ—বৃহদীশ্বর। তা বৃহৎ-ঈশ্বর নামটি

সার্থক। লিঙ্গটি তেরো ফুট উঁচু। গর্ভগৃহের চারিপাশে মঞ্চ গাঁথা আছে, তার উপর উঠে দেবতাকে প্রদক্ষিণ ও আরতি করতে হয়।

এই মন্দিরের মাথায় একটি গোলাকার গ্রেনাইট পাথর বসানো আছে। এটির ওজন হচ্ছে ৮০ টন অর্থাৎ প্রায় ২২৪০ মণ। এই পাথরখানির ব্যাস ২৫½ বর্গফুট। এর গায় অপূর্ব কারুকার্য খচিত। পাথরখানি লাগানো আছে মন্দিরের ছাদে যে বিমান আছে তারই গায়, ছাদের ৩৩ ফুট উঁচুতে। অত উঁচুতে ওই ওজনের একখানি পাথর তোলা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। এখন না হয় ভারী জিনিষ তোলার জন্যে 'ক্রেন্' আছে, তখন তো তা ছিল না। সেইজন্য মন্দির নির্মাণকালে চার মাইল দূর সারাপুল্লম গাঁ থেকে একটি ঢালু রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল মন্দিরের মাথা অবধি। সেই রাস্তা দিয়ে পাথরখানি গড়িয়ে আনা হয়েছিল মন্দিরের মাথায়।

এই মন্দিরটি তৈরী করতে লেগেছিল বারো বছর। এক ওলন্দাজ সাহেব মন্দির তৈরীর সময় কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন, মন্দিরের গায় তাঁর মূর্তি খোদাই করা আছে। শুনলাম মন্দিরটি এমন ভাবে তৈরী যে দিনের মধ্যে কোন সময়েই মন্দিরের চূড়ার ছায়া মাটিতে পড়ে না—মন্দিরের ছায়ায় কোন প্রাণী কোনদিন যেন পদক্ষেপ না করতে পারে।

বারান্দায় ১০৮টি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।

এখানকার কারুকার্যে বিখ্যাত মন্দির হলো সুব্রাহ্মণ্য স্বামী অর্থাৎ কার্তিকের মন্দির। এর কারুকার্য অতি সুন্দর। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা প্রতিটি মূর্তি যেন জীবন্ত, মনে হয় এই মাত্র খোদাই শেষ হয়েছে। অথচ মন্দিরটি প্রাচীন।

এখানকার পার্বতী-মূর্তির নাম পেরিয়া-নায়া-জিয়ামল।

সাধারণ ভাবে মন্দির দেখতে আমাদের দু' ঘণ্টা লাগলো। তারপর আমরা ফিরলাম স্টেশনে।

হোটেলে খেতে বসে কথা উঠলো—চিদাম্বরম্ যাব কিনা?

একভাবে ঘুরতে ঘুরতে সকলের দেহে-মনে জেগেছিল পথের ক্লান্তি, সকলেই বললো—এবার থাক্, পরে যদি কখনও আসা যায়, তখন হবে।

রাত দশটায় মাদ্রাজের ট্রেনে উঠে পড়লাম।

পরদিন সকালে মাদ্রাজে গাড়ী বদল করতে গিয়ে দেখি খগেনবাবুও আমাদের সহযাত্রী। আমাদের আগে বেরুলেও তিনি আমাদের আগে এসে পৌঁছাতে পারেন নি। আর আগে পৌঁছালেও, এই গাড়ীই তাঁদের ধরতে হতো।

* * * *

এবার বাঙালুর। মাদ্রাজ থেকে বাঙালুর আট-ন' ঘণ্টার পথ—দু'শো বাইশ মাইল।

মাদ্রাজ থেকে আমাদের কামরাখানি জুড়ে দেওয়া হলো মহীশূরের গাড়ীর সঙ্গে, দক্ষিণ থেকে অমরা মোড় ফিরলাম পশ্চিম দিকে।

সেই পুরাণো সঙ্গীর দল, সেই রিজার্ভ করা কামরা, সে-ই বাংলা সাহিত্যের আর-এক বার্ষিক সম্মেলন।

আড়াই দিন এক ভাবে ট্রেনে বসে বসে যাওয়া মোটেই সুখদায়ক নয়, কিন্তু শ'-দেড়েক মানুষের একটা দল যখন দলবেঁধে কোথাও যায় তখন পথের কষ্ট গায়ে লাগে না। ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে একটী ক্লাব বসে যায়, সময় কেটে যায় গান গল্প ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে। কলিকাতায় যে মানুষগুলি গম্ভীর মেজাজে ভারিক্কী চালে চলাফেরা করেন,—সদাই ব্যস্তসমস্ত ভাব,—তাঁরা যে সঙ্গী পেলে কতটা কলোচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠতে পারেন তা এই সময় ট্রেনের এই কামরাখানি না দেখলে বোঝা যায় না।

সন্ধ্যার পরে আমরা পৌঁছলাম ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনে। স্টেশনে আমাদের জন্য বাস্ ছিল, সেই বাস্ এনে আমাদের পৌঁছে দিল

এক ধর্মশালায়। সেখানকার সভা-ঘরে আমাদের স্থান হলো। মস্ত সভাঘর, তার একপাশে অভিনয় করবার জন্য পাকা মঞ্চ বাঁধা আছে। সেখানে পাইকারী হারে আমাদের স্থান সংকুলান হয়ে গেল। অবশ্য সংকুলান হলো বললে ঠিক বলা হয় না, সংকুলান করে নিতে হলো। অল্পপরিসর স্থানে বেশী লোকের থাকার যে ব্যবস্থা, তাতে আমরা—ভারতবাসীরা বোধ হয় পৃথিবীর আদর্শ। আমাদের রেলগাড়ীর কর্তারা বহুদিন ধরে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এ-কথাটা শিখিয়ে চলেছেন। তার উপর কিছুকাল ধরে কলিকাতার ট্রাম ও স্টেট্ বাসের কর্তারাও এই ধারাকে বলবৎ করেছেন। সেই শিক্ষা এই সভাঘরেও আমাদের কাজে লাগলো। তা ছাড়া একাদিক্রমে তিনদিন জঙ্গম থাকবার পর এখন স্থাবর হবার যেটুকু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তা-ই যথেষ্ট বলে মনে হলো। গায়ে গায়ে পাশাপাশি সব বিছানা পড়ে গেল। ট্রেনের বেশভূষা পরিবর্তনের জন্য সবাই এবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ওয়াল্টেয়ার পার হবার পর থেকে শীত পাই নি, এখন যেন একটু শীতের আমেজ এসে লাগলো। তবে ডিসেম্বর মাসে যেমন শীত হওয়া উচিত তেমন কিছু নয়।

সবাই শ্রান্ত, আহারাদি শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে দেবার জন্যই সবাই ব্যস্ত, তবু কোনখান দিয়ে যে রাত এগারোটা বেজে যায় তা কেউ টের পায় না। রাত বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাটাও যেন বাড়তে থাকে। এই শীতের রাতে নীচের তলে মেঝেতে শোওয়া কারো মনঃপুত হয় না, কিন্তু স্থান ও পাত্র ভেদে সব সইয়ে নিতে হয়। যে যার মাথা অবধি কম্বল ঢাকা দেয়। দিন তিনেকের মত থাকা-খাওয়ার একটা আস্তানা যখন পাওয়া গেছে তখন ঘুমটুকুই বা বাদ যায় কেন? আর ট্রেনের যে দীর্ঘ ক্লান্তি জমে উঠেছিল, ঘুমিয়ে পড়তে মোটেই দেরী হলো না।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙলো। তখনও ভালো করে দিনের আলো ফোটে নি। চারিপাশের কম্বলাচ্ছাদিত মানুষগুলির পানে তাকিয়ে মনে পড়লো কলেজস্ট্রীট মার্কেটের গাড়ী-বারান্দার নীচে সারি সারি যে গৃহহীনদের শুয়ে থাকতে দেখা যায়, অথবা শেয়ালদা' স্টেশনে বাস্তুহারাদের যেমন দেখেছি, এ বুঝি তাদেরই একটি দল। তবে সে-দলে শিল্পী, লেখক, সম্পাদক, উকিল ও ডাক্তার আছে বলে শুনি নি, কিন্তু আমাদের এ-দলে আছে। রুশ বিপ্লবের পরে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল তখন বোধ হয় 'সাদা রুশ'দের এই অবস্থা হয়েছিল। তখন অবশ্য ভাবি নি যে রাশিয়া অবধি যাবার দরকার নেই, আসাম-বাসী বাঙালীদের এই অবস্থা আসছে বছর খানেকের মধ্যেই।

যাক্, মুখ ধুয়ে এসে সঙ্গীদের তো ডেকে তুললাম। প্রোগ্রাম ছিল সকালে সহরটা ঘুরে দেখে আসতে হবে, কারণ অধিবেশন সুরু হতে দেরী আছে। এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু সুধীন মুখ ধুতে গিয়ে ফিরে এলো, বললো—জল কই? কলে জল নেই।

সকালে কলে জল নেই! এখানেও কি তবে কলিকাতার কানুন চলে? যাক্, ছ'টা তখনও বাজে নি, ছ'টা অবধি অপেক্ষা করাই ভাল। আবার যে যার কম্বল মুড়ি দিল।

একে একে অনেকে উঠলেন, সেই এক কথা—জল নেই! দেখতে দেখতে ছ'টা পার হয়ে সাতটা বাজতে চললো, তখনও জল নেই। অভিযোগ জানাবার মত কর্মকর্তাও কেউ নেই। এদিকে অন্তরে অন্তরে প্রাতঃকৃত্যের তাগিদ দেখা দিয়েছে অনেকের, বিরক্তি ও রাগ শেষ অবধি চাঞ্চল্যে এসে পৌঁছেছে।

অবশেষে সাতটা নাগদ একজন কর্মকর্তার দেখা পাওয়া গেল, সবাই ঘিরে ধরলেন তাঁকে। তিনি কয়েকজনকে টেলিফোন করে বললেন—মিউনিসিপ্যালিটিকে আগে জানানো হয় নি, তাই ঠিক সময় জল পান নি।

একটি মাত্র বাড়ীর জল কি করে মিউনিসিপ্যালিটি বন্ধ রাখতে পারে তা ঠিক মত বুঝলাম না, তবে এটুকু বুঝলাম যে ব্যবস্থার কোথাও কোন কিছু গলদ আছে। অবশ্য সব ব্যবস্থাতেই কিছু-না-কিছু গলদ থাকা আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য, সেটুকু না থাকলে 'ভারতীয়' ট্রেডমার্ক থাকে না।

যাক্, শেষ অবধি জল এলো। দেড়শো লোক এবং আটটি কল। কাজেই স্নান সেরে তৈরী হতে হতে আমাদের ক'জনের ন'টা বেজে গেল, এবং ন'টার সময়েই সভা সুরু। আর সভা করতেই আমরা এতদূরে এসেছি।

সারাটা দিন সভাতেই কাটলো। কাটলো নয়, কাটিয়ে দিলাম। দীর্ঘ ট্রেন-ভ্রমণের ক্লান্তি তখনও সারা দেহ জুড়ে ছিল, আর দেহের ক্লান্তি মনেরও শক্তি ক্ষয় করে। সভাগৃহটি ছেড়ে বাইরে বেরুবার উৎসাহ পেলাম না।

সভাগৃহটি সুন্দর। টাউন হল। কলিকাতার যে কোন প্রথম শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চের সমতুল। গদী-আঁটা চেয়ার, দেয়ালে ফ্রেস্‌কোর কাজ, সুদৃশ্য মঞ্চ। একেবারে আধুনিক। সাম্প্রতিক তৈরী। প্রাচীন ঐতিহ্য নেই, নবীন রূপশ্রী আছে। মাদ্রাজ, জবলপুর, আমেদাবাদ—সর্বত্রই এই নবীনতা, শুধু কলিকাতাতেই এর ব্যতিক্রম। কলিকাতায় এমন একটা দৃশ্য সভা-ঘর নেই যা আগন্তুকের নয়নরঞ্জন করতে পারে। প্রতিবেশীদের অগ্রগতির সামনে আমরা চোখ বুঁজে আছি। অবশ্য তার কৈফিয়ৎ আছে এক ঝুড়ি।

যাক্, সেই রাত্রে বসে প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গেল, মিটিং-এর ফাঁকে-ফাঁকে দেখে নিতে হবে—বাজার-হাট, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, বিধান-সৌধ, লালবাগ, ও বিজ্ঞান-পরিষদ।

সহর দেখতে বেরুবার আগে, এই সহরের গোড়াপত্তনের ইতিহাসটুকু জেনে রাখা ভাল।

কয়েক শো বছর আগের কথা। হোয়সাল রাজারা তখন এই অঞ্চলে রাজত্ব করছেন। এই রাজ্যের নাম তখন দ্বারসমুদ্র। তখনকার দিনের রাজাদের মৃগয়া করার একটা সখ ছিল। রাজ-কাজ করতে করতে যখন ক্লান্তি আসতো তখনই তাঁরা বেরিয়ে পড়তেন বন-বাদাড়ে হরিণ আর বাঘের খোঁজে খানিক ছুটোছুটি করে বেড়াতে। দ্বারসমুদ্রের রাজা বীরবল্লালও একদিন মৃগয়া করতে বেরুলেন। রাজকীয় ব্যাপার, সঙ্গে সেবক ও অনুচর চললো অনেক।

কিন্তু মহারাজের দুর্ভাগ্য, শিকারের পেছনে ছুটোছুটি করতে করতে কখন যে তিনি বনের মধ্যে সঙ্গীদের হারিয়ে ফেললেন তা জানেন না। যখন খেয়াল হলো তখন সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরী নেই।

রাজা বনের মধ্যে অনেকক্ষণ সঙ্গীদের খুঁজলেন। এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বনের মধ্যে আর নজর চলে না। ঘোড়াটিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অথচ বন থেকে বেরুবার কোন পথ মহারাজ খুঁজে পাচ্ছেন না।

সহসা একটা আলো চোখে পড়লো। মহারাজ সেই আলোর দিশায় এগিয়ে গেলেন। এসে পড়লেন এক কুটীরে। দ্বারে ধাক্কা দিতেই এক বুড়ী বেরিয়ে এলো। রাজাকে দেখে সহসা তার মুখে কোন কথা জোগালো না। রাজা বললেন,—শিকার করতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি, সঙ্গীদেরও খুঁজে পাচ্ছি না। বনের বাইরে যাবার পথটা একটু বলে দেবে?

বুড়ী বললো,—এই অন্ধকারে সে-পথ তো ঠাহর করতে পারবেন না। আবার হারিয়ে যাবেন।

—তাহ'লে?

বুড়ী এবার সাহস করে বললো,—আজকের রাতটা এখানেই থেকে যান। বনের অন্ধকারে সাপ-বাঘের ভয়ও আছে।

রাজা বললেন,—সেই ভাল। কিছু খাবার জোগাড় কর, জল দাও। ঘোড়াটার জন্যও কিছু ঘাস-জল চাই।

বুড়ীর কুঁড়েঘরেই রাজা আশ্রয় নিলেন। বুড়ী খড় বিছিয়ে দিল, ছেড়া কাঁথা পেতে দিল তার উপর। রাজা বসলেন।

রাজা তো বসলেন, কিন্তু বুড়ী পড়লো মুস্কিলে। রাজাকে কি দেবে খেতে? ঘরে তো কিছুই নেই! বুড়ীর ভাব দেখে রাজা বললেন,—ঘরে যা আছে তাই দাও।

—এক বাড়ী থেকে কিছু সীম পেয়েছিলাম, সেই সীম সিদ্ধ করেই ক'দিন আমি খাচ্ছি। সেই সীম ছাড়া তো আর কিছু নেই!

—আমাকেও সেই সীম সিদ্ধ করে দাও।

বুড়ী সীম সিদ্ধ করে রাজাকে খেতে দিলে।

সীম সিদ্ধ খেয়ে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজার রাত কাটলো।

পর দিন প্রত্যূষে বুড়ী রাজাকে পথ দেখিয়ে দিলে, রাজা বাড়ী ফিরলেন।

সেই সীমসিদ্ধ খাওয়ার গল্প রাজা বললেন রাজসভায়, লোকের মুখে মুখে সে খবর ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। এদিকে রাজবাড়ীর লোকজনও যাওয়া-আসা স্থরু করলো সেই বুড়ীর বাড়ীতে। ধীরে ধীরে বন কেটে পথ হলো, বুড়ীর বাড়ীর চারিপাশে মানুষের বাস স্থরু হয়ে গেল। সেই বসতির পরিচয় হলো 'বাংগালুরু।' বাংগালু মানে সীম, আর উরু মানে নগর। কানাড়ী ভাষায় বাংগালুরু মানে সীম-নগর। তা-ই মুখে মুখে হয়েছে 'বাঙালুর', আর ইংরেজদের উচ্চারণ-দোষে হয়েছে 'বাংগালোর।'

গোড়াকার সেই জনপদ একদিন নগর হলো। সেই নগরটিকে ঘিরে একদিন এক মাটির পাঁচিল তুললেন—কেম্‌পিগৌদা নামে এক সামন্ত। সে ১৫৩৭ সালের কথা। তার পর হায়দার আলি সেই প্রাকার পাথর গেঁথে মজবুত করলেন। সে ১৭২৯ সালের ব্যাপার। ১৭২৯ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত হায়দার আলি আর টিপু

সুলতান এখানে রাজত্ব করলেন—সত্তর বছর। তার পর এলো ইংরেজরা। আজকের দিনে এই সহরের যা কিছু সমৃদ্ধি তা এই ইংরেজদেরই সৃষ্টি। এখন এই সহরটী ২৬ বর্গ মাইল ব্যেপে আছে,—আর এর জনসংখ্যা আট লাখের মত।

সহরটির তু'টি ভাগ, পুরানো বাংগালুর নগর, আর নতুন বাংগালোর ক্যান্টনমেণ্ট। পুরানো সহর পশ্চিমের আর-পাঁচটা সহরের মত ;—এলোমেলো বাড়ী-ঘর, আঁকাবাঁকা পথঘাট, ধূলিধূসর পল্লী। কিন্তু নতুন সহর সুপরিকল্পিত, সাজানো-গোছানো—পিচের প্রশস্ত রাস্তা, তু'পাশে সুদৃশ্য ইমারত, মাঝে মাঝে সুরক্ষিত পার্ক—পরিচ্ছন্ন, ঝরঝরে।

বাংগালুরে দ্রষ্টব্য আছে অনেক—মহারাজার প্রাসাদ, বিধানসৌধ, লালবাগ, ভারতীয় বিজ্ঞান-পরিষদ, তুর্গ ইত্যাদি। এইগুলিই হচ্ছে ভ্রাম্যমানদের কাছে এই সহরের পরিচয়,—অল্প সময়ের মধ্যে যা আমরা পেতে পারি। আর এখানকার মানুষের পরিচয় পেতে হলে কিছুদিন থাকার এবং মেলামেশার দরকার ; সে সময় আমাদের কই ?

এই চোখের দেখা অল্পকালের পরিচয় নিয়েই আমার কাহিনী।

আমাদের ধর্মশালা থেকে লালবাগ পাঁচ মিনিটের পথ।

লালবাগ এখানকার বোটানিক্যাল গার্ডেন। সুদৃশ্য, বিশাল উদ্যান। টিপু সুলতান এই উদ্যানটির পত্তন করেন। তখন এটি শুধু ফুলের বাগানই ছিল, তারপর ইংরেজ আমলে ১৮৫৯ সালে এটিকে উদ্ভিদ-বিদ্যার শিক্ষণ-কেন্দ্র করা হয়। এর ভিতরে কয়েকখানি ঘর আছে, সেখানে উদ্ভিদ্-বিদ্যার ক্লাস বসে।

লালবাগে ঢুকলেই সবার আগে নজরে পড়ে একটি মস্ত কাঁচের ঘর। এই ঘরখানির ভিত্তিস্থাপনা করেছিলেন প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স্ ১৮৮৯ সালে। এখানে বছরে বছরে পুষ্প-প্রদর্শনী হয়।

এই কাঁচঘরের ভিতর দিয়েই বরাবর পথ চলে গেছে পশ্চিম-মুখো। সেই পথ দিয়ে কিছুটা গেলেই একটি টিলা। এই টিলার উপর একখানি ছোট ঘর। এই ঘরখানি থেকে সমস্ত বাংগালুর শহরটি দেখা যায়। উদ্যানের আরো তিন কোণে এমনি তিনটি 'টাওয়ার' আছে। মহারাজ কেম্‌পি-গোয়াদার এই চারিটি টাওয়ার তৈরী করে বলেছিলেন—'এই পর্যবেক্ষণ-তোরণ থেকে যতদূর দেখা যায় একদিন ততদূর বিস্তৃত হবে এই বাংগালুর নগরী।' তখন নগরীর সে বিস্তৃতি ছিল না, কিন্তু আজ মহারাজার সে কথা সত্যি হয়েছে।

বাগানের ভিতরে ঘুরতে ঘুরতে আমরা এসে পড়লাম এক মনোরম জায়গায়। জাপানী বাগান। রকমারি রঙীন বড় বড় ফুলে স্থানটি সত্যি অপরূপ। বড় বড় ক্রিসেনথেমাম্ ও মোরগ ফুল রঙের বাহার খুলে দিয়েছে। এতো বড় বড় ফুল, আর এতো রং এর আগে আর কোথাও দেখি নি।

জাপানী উদ্যান পার হলেই একটি কুঞ্জ। একটি ছোট পুল, পাশে একটি কৃত্রিম ঝর্ণা। ঝর্ণার ধারে আর একটি কুঞ্জ। কুঞ্জের নীচে একটি গঙ্গামূর্তি। মূর্তির একপাশে একটি ব্যাঙ, আর একপাশে একটি কুমীর। ব্যাঙ ও কুমীরের মুখ থেকে জলের ফোয়ারা উঠছে। সামনে একটি আধুনিকা মেয়ে গঙ্গাদেবীর আরতি করছে। মূর্তিগুলি সবই 'সিমেণ্ট প্লাস্টারের' তৈরী। ঝর্ণার জলে বড় বড় পদ্ম ফুটেছে। পুল, ঝর্ণা, কুঞ্জ, মূর্তি, ফুল—সব মিলিয়ে স্থানটির শোভা মনকে স্নিগ্ধ করে তোলে।

আমরা এসে পড়লাম এক চত্বরে। চত্বরের কেন্দ্রে মহারাজা শ্রীচামরাজা ওয়াদিয়ারের একটি মর্মর মূর্তি। ইনি বর্তমান মহীশূরের মহারাজার পিতামহ। এই অঞ্চলের যা-কিছু সমৃদ্ধি তার গোড়াপত্তন করেছিলেন ইনিই। এই মর্মরমূর্তি কেন্দ্র করে চারিপাশে ছায়া-বীথিকা, এবং বেঞ্চি পাতা। একখানি বেঞ্চিতে আমরা বসলাম।

অপরাহ্নের রোদ এসে পড়েছে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে, শীতের হাওয়ায় থর থর করে পাতাগুলি কাঁপছে। টুকরো টুকরো রোদও কাঁপছে ঘাসের মাথায় আর কাঁকর-বিছানো পথের উপরে। পাতা ও রোদের এ যেন সুর মিলিয়ে নাচা।

বেলা পড়ে আসে। শীতের আমেজ দেখা দেয় বাতাসে। আমরা উঠে পড়লাম। গরম জামা ছিল না কারো গায়ে।

এবার বিধানসৌধের কথা। আমাদের সম্মেলন হচ্ছিল টাউন হলে। সেখান থেকে বিধানসৌধ বেশী দূরে নয়। নতুন শহরের প্রশস্ত পথ বরাবর পশ্চিমমুখো চলে গেছে। শীতের দিনে রোদ ভাল লাগে, কিন্তু চোখের উপর সূর্য রেখে পথ চলা কষ্টকর। তবে পথ বেশী নয়, এই যা কথা।

পথের দু'পাশে দু'টি বড় বাড়ী। দু'টিই বিধানসভা,—একটি আগেকার, একটি আধুনিক। আগেরটি মোটামুটি কলিকাতার রাইটার্স বিল্‌ডিং-এর মত, রংও লাল, তবে দৈর্ঘ্যে প্রায় তিনগুণ। তারই সামনে আধুনিক বিশাল সৌধ। সাদা তিনতলা বাড়ী। শ্বেত পাথরের তৈরী। চারশো একর জমির উপর পঞ্চাশ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এটি তৈরী করতে। অনেক সিঁড়ি, অনেক ঘর, দীর্ঘ বারান্দা, অনেক দরজা, দরজায়-দরজায় অনেক নাম—মন্ত্রী, সেক্রেটারী ও দপ্তরখানা। এই আড়ম্বর দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, কিন্তু তার পরেই যখন শহরের পথে ছেঁড়া-গেঞ্জি-গায়ে মানুষ চোখে পড়ে তখন মনে হয় এই বিধানসৌধ যদি এ দেশের হয় তা হলে এই মানুষগুলি নিশ্চয়ই এ দেশের নয়! না হলে এমন গরমিল হবে কেন? এই গরমিল যেদিন ঘুচবে সেদিনই মানাবে এই আড়ম্বরের আতিশয্য।

বিধানসৌধের মধ্যে বিধান-সভাঘর। গোলাকার কক্ষ। নীচের তলে স্পীকার ও মন্ত্রীদের আসনের সামনে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী

আসনের সারি, উপরতলে দর্শকদের আসনের গ্যালারি। চারিপাশের দেয়াল জাতীয় নেতাদের বড় বড় ছবিতে সাজানো। ছাদে একটি বিশাল প্রস্ফুটিত গোলাপের কারুকাজ। উপরতলের একপাশে একটি সুন্দর কারুকাজ-করা চন্দন কাঠের দরজা। এই দরজাটি তৈরী করতে লেগেছে আট হাজার টাকার কাঠ, আর শিল্পীরা মজুরী নিয়েছে দশ হাজার টাকা। বিধানসভার উদ্‌বোধনের দিনে রাজপ্রমুখ এই দরজা খুলে সভাঘরে প্রবেশ করেন। অন্য সময় দরজাটি বন্ধই থাকে। চন্দনের দেশে চন্দনকাঠের এটি একটি আধুনিক কীর্তি।

বিধানসভার কাছ থেকেই সুরু হয়েছে কুবন পার্ক। স্যার মার্ক কুবন ছিলেন মহীশূর রাজ্যের কমিশনার, তাঁরই নামে এই পার্কের নাম হয়েছে। এখন আবার এই নাম বদলে নতুন নাম হয়েছে চামরাজেন্দ্র পার্ক। এটি আমাদের কলিকাতার গড়ের মাঠের মত। মাঝে মাঝে মর্মরমূর্তি আছে। মহারাজ চামরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার, মার্ক কুবন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের মর্মরমূর্তি আমাদের চোখে পড়লো। পার্কের এক পাশে বড় বড় জমকালো হোটেল আছে। সেই একটি হোটেলে এখানকার বাঙালী সংঘ সেইদিন সন্ধ্যায় আমাদের প্রীতিসম্মেলনে আপ্যায়িত করলেন। হোটেল-সংলগ্ন প্রকাণ্ড উদ্যানে মঞ্চ বেঁধে একটা ছোট-খাটো আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজনও তাঁরা করেছিলেন।

পরদিন সকালে অধ্যাপক ক্ষিতীন বাবু ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে পড়লেন ভারতীয় বিজ্ঞান-পরিষদ দেখতে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম আর একদিকে।

বাংগালুরের বিজ্ঞান-পরিষদ ভারতের একটি গৌরবের বস্তু। বোম্বাইএর জামশেদজি টাটা ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়ে এটির পত্তন

করেছিলেন। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এটি অবস্থিত। এটির উন্নতি ও খ্যাতির মধ্যে যাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা আছে তাঁদের মধ্যে চন্দ্রশেখর বেংকট রামন্ অন্যতম।

আমরা ক'জন বেরুলাম শহর দেখতে। সেইদিনই আমাদের বাংগালুরে অবস্থানের শেষ দিন। আজ এখানকার বাসিন্দাদের জানবার ও বুঝবার জন্য আমরা নগর পরিক্রমায় বেরুলাম।

পুরানো নগরের দিকে কিছুদূর গেলেই দুর্গ। দুর্গ বলতে এখন আর বিশেষ কিছুই নেই। প্রধান রাস্তার দু' পাশে দু'টি পাথরের দেয়াল আছে মাত্র। আমাদের টালিগঞ্জ, নারিকেলডাঙ্গা ও বেলেঘাটার রাস্তার উপর দিয়ে রেলপথের রাস্তার পুলটা যেমন দেখায় অনেকটা সেই রকম। পথের সেইখানকার নাম 'কিল্লা-ফটক'। সেই ফটক পার হলেই পুরানো নগর। সে নগর আগাগোড়া 'হিন্দুস্থান মার্কা' আঁটা। পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ী ;—কোনখানি পাকা, আবার কোনখানি চালাঘর ; ধূলিধূসর পথে আধুনিক মোটর গাড়ীর সঙ্গে সনাতনী গরুর গাড়ী ; সম্পন্ন ইস্ত্রি-চোস্ত প্যাণ্ট-কোটের পাশে নগ্নপদ আধময়লা শার্ট ; পরিচ্ছন্ন বিপণির পাশে মলিন দোকান। এ হলো ভারতীয় অর্থনীতির স্থায়ী রূপ,—আসমুদ্র হিমাচল ও কচ্ছ-বঙ্গ উপকূল সর্বত্রই এই এক চেহারা। মহাকাল সবই ক্ষয় করেন কিন্তু ভারতভূমির দারিদ্র্য কালজয়ী। এ দেশে 'দরিদ্র নারায়ণ'। এই দারিদ্র্যই বোধ হয় ভারতের সংস্কৃতি, সেই জন্য সর্বযুগের ভারতীয় শাসকেরা এই দারিদ্র্যকেই অব্যহতভাবে বজায় রেখে চলেছেন।

আমরা এসে পড়লাম বাজারে। আমাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন সিল্কের খদ্দের। সিল্ক এখানকার একটা বড় শিল্প, সেইজন্য সাধারণ লোকের ধারণা বাংগালুরে সিল্ক সস্তা। সে ধারণা আমাদেরও ছিল, কিন্তু সেখানকার দোকানে সিল্কের জিনিষের যে দাম দেখলাম তাতে তাকে মোটেই সস্তা বলা যায় না অবশ্য এখন এ

দেশ থেকে সস্তা দাম বিদায় নিয়েছে, কাজেই সস্তায় কোথাও কোন জিনিষ পাওয়া যাবে এ কথা ভাবাই উচিত নয়।

যাক্, বাজারে তো এসে ঢুকলাম। সেদিন রবিবার। সাপ্তাহিক একদিন বন্ধ হিসাবে বাজারের প্রায় সব দোকানই বন্ধ। তবে আমাদের সৌভাগ্য, দু'-একখানি দোকান খোলা ছিল। দোকানে তো ঢুকলাম, কিন্তু মুস্কিল বাধলো কথা বলা নিয়ে। এখানে হিন্দি কি ইংরেজি বোঝে খুব কম লোক। দোকানদারও অনেক সময় মাতৃভাষা ছাড়া কিছুই বোঝে না। তা না বুঝলেও চোখে দেখে জিনিস পছন্দ করা ও দাম জিজ্ঞাসা করার মধ্যে বিশেষ দুর্বোধ্য কিছু নেই। আমরা তো দর-দাম সুরু করে দিলাম।

কাপড় পছন্দ করা ও দাম জানার ব্যাপারে আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম বাংলায়। তাতে দোকানের একটি ষোল-আঠারো বছরের ছেলে আমাদের ইংরেজীতে প্রশ্ন করলো হোয়াট ইউ স্পিক্!—চাইনিজ, জাপানীজ অর বেংগলি?

যুবকের মুখের পানে তাকালাম। রহস্য করছে বলে মনে হলো না। সরল মুখ, সহজ ভাব। বুঝলাম আমাদের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার কোথাও একটা বড় ত্রুটি রয়ে গেছে যার জন্য হিন্দি নিয়ে দক্ষিণ ভারত উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বাঙালী বিহারী মারামারি করে, বাংলা নিয়ে আসামীরা বাঙালীকে ভিটে-ছাড়া করে দেয়,—সাত-সমুদ্দুর-তোরো-নদী-পারের ইংরেজীকে রাখতে সবাই ব্যাকুল, মাতৃভাষাকে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেবার আগ্রহ ততটা কারও দেখা যায় না। মাতৃভাষাটা ভালো করে শিখলেই যে আরও ভাষা জানবার ও শেখবার আগ্রহ আপনি জাগবে সেটা উচ্চপদস্থ বড় বড় মাথায় ঢোকে না। সেই জন্য বাঙালীকে বাংগালুরে গিয়ে শুনতে হয় তার ভাষাটা চাইনীজ অথবা জাপানীজ কিনা!

যাক্, সওদা করে তো ফিরলাম। বিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার কাপড় ও ছিট কিনে ফেললেন এক একজন। প্রসন্নমুখে কেউ

কেউ বললেন—'কলকাতায় সব কিছুরই দাম বেশী, কারণ সেখানে মুনাফাবাজির মনোভাব অত্যন্ত প্রবল। তা ছাড়া সাম্প্রতিক কালে বাংলা দেশের সব পয়সা এখানকার কিছু লোকের হাতে এসে পড়েছে। সেই সব 'উড়ো-ধনীরা' সব কিছুতেই পয়সা ছড়ায়, প্রজাপতির মত কলকাতার আসরে ফ্যাসনের ঢেউ তোলে।' কিন্তু কলিকাতা দিয়ে বাংলা দেশের অবস্থার বিচার করা চলে না, যেমন বোম্বাই বা দিল্লী ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মাপকাঠি নয়।

সেই দিনই সন্ধ্যার আসরে বাদ্য-নৃত্য ও অভিনয়ের অনুষ্ঠান জমে উঠলো। স্থানীয় শিল্পীরা ভারতনাট্যম্, কথাকলি ও মালাবারের লোকনৃত্য আমাদের দেখালেন। এই সব নাচের পরিচালনা করছিলেন শ্রীকৃষ্ণ রাও ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী চন্দ্রভাগা দেবী। শ্রীরাও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে ললিতকলাকে তিনি মিশিয়ে ফেলেছেন অপরূপ-ভাবে। শ্রীমতী চন্দ্রভাগাও নৃত্যকলায় এই অঞ্চলে সমধিক খ্যাতি-সম্পন্না। স্বামীস্ত্রী দু'জনেই ভাল শিল্পী, দু'জনের একক নৃত্যে সে পরিচয় পাওয়া গেল। অধ্যাপক রাও নাচলেন 'গীতোপদেশম্',—অর্জুনের বিষাদ-যোগ ও শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শনের ভাবপ্রকাশ, আর শ্রীমতী নাচলেন ভারতনাট্যম্ ও কথাকলির সংমিশ্রণে একটি মালাবারী নাচ—'মোহিনী আত্তম্'। তারপর তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীরা নাচলেন—কথক, কথাকলি ও ভারতনাট্যম্।

এখন আমাদের দেশে নাচ সাধারণভাবে অভ্যাগত, দর্শক বা ধনীদের আসরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আগেকার দিনে এই নাচ ছিল আমাদের দেব-অর্চনার একটি অঙ্গ। এখনও আমাদের প্রাচীন মন্দির-গাত্রে নৃত্যরত অজস্র মূর্তি দর্শনীয় হয়ে আছে।

আমাদের দেশের নাচের চারটি ধারা আছেঃ ভারতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী।

ভারতনাট্যমের উৎস হলো দক্ষিণ ভারত, তামিল, অন্ধ্র ও কানাড়ীয় সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। এই নাট্যকলার যে রূপ আমরা আজ দেখি তা প্রবর্তন করেন তাঞ্জোরের রাজা সরফোজীর চারজন পারিষদ,—চার সহোদর—পুন্নিয়া, চিন্নিয়া, শিবনন্দন ও বড়ি বেলু। নাট্যশাস্ত্রম্ মধ্যযুগে লুপ্ত হতে চলেছিল, এঁরা তার পুনরুদ্ধার করেন। এঁরা চারজনেই ছিলেন প্রতিভাধর, সুরকার ও গীতিকার, সেই জন্য এদিকে প্রেরণা জোগাবার ও সংযোজনা করবার সুবিধা তাঁদের ছিল ; তার উপর ছিল মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতা।

কথাকলি নাচের জন্মস্থান কেরল। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে কালিকটে সমুতিরি নামে এক প্রখ্যাত নর্তক ছিলেন। তিনি 'কৃষ্ণনাট্যম্' রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর নাম শুনে 'কোত্তার কারা'-এর রাজা তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন রাজসভায়, বললেন,—আপনার নৃত্যকলা দেখতে চাই।

সমুতিরি নাচ দেখালেন, কিন্তু সে নাচ দেখে রাজা খুসি হতে পারলেন না। তিনি কোন ভনিতা না করে মুখোমুখি শিল্পীকে বলে দিলেন—ভাল হয় নি।

শিল্পী ক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন,—নাচ বুঝতে হলে যে রসবোধের দরকার তা আপনাদের নেই।

রাজা বললেন,—বেশ, আমি নিজে নাচের প্রযোজনা করে দেখিয়ে দেব।

রাজা 'রামনাট্যম্'-এর পরিকল্পনা করলেন। সেই হলো কথাকলির সূত্রপাত।

কথাকলির ভাব হলো পৌরাণিক, প্রকাশ-রীতির ভিত্তি হলো নাট্যশাস্ত্রম্ ও অভিনয়-দর্পণ শাস্ত্র। যে যে-ভূমিকায় নাচে তার সেই মত অঙ্গসজ্জা হয়। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনভাগে চরিত্র ভাগ করা থাকে। দেবদেবী, ভীম-অর্জুন প্রভৃতি সজ্জন সাত্বিক পর্যায়ের চরিত্র। দুর্যোধন, রাবণ প্রভৃতি রাজসিক

চরিত্র। দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি তামসিক চরিত্র। হাতের চব্বিশ রকম মুদ্রা আর মুখের ভাবই কথাকলির মধ্যে প্রধান। সাধারণতঃ গ্রামের মাঠে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে কথাকলির অনুষ্ঠান হয়। নাচ ভাঙে প্রত্যূষে।

কথক নাচের জন্ম রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে। শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে কথকেরা গান গাইতেন আর সেই সংগীতের রূপ দিতেন নাচের ভঙ্গিমায়। কথকের এই গানের উৎস ছিল পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানগুলি। ভজন, ধ্রুপদ ও কবিতার সঙ্গে এই নাচ নাচা হতো। কিন্তু মুসলমান সুলতানদের আমলে এই নাচের মূলসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। মন্দিরে দেবতার কাছে ভক্তি নিবেদন করার জন্য যে নাচ নাচা হতো, নবাব বাদশাহের দরবারে সেই নাচের অনুষ্ঠান হতে লাগলো পারিষদদের মনোরঞ্জনের জন্য। তাতে নাচের রূপ গেল বদলে। দীর্ঘকাল পরে লখ্নৌ-এর ঠাকুরপ্রসাদ ও জয়পুরের জানকীপ্রসাদ বহু আয়াসে এই নৃত্যকলাকে আবার পুরানো ধারায় ফিরিয়ে এনে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। আবার ঠুংরী, দাদ্‌রা ও ভজন-গানের সঙ্গে এই নাচের অনুষ্ঠান সুরু হয়। এ নাচের বৈশিষ্ট্য হলো সংগীতের তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর—দ্রুততম হয় এবং দেহের প্রকাশ-ছন্দও ক্ষিপ্র থেকে ক্ষিপ্রতর—ক্ষিপ্রতম হয়ে ওঠে। এ নাচে অভ্যস্ত হওয়া নর্তকের পক্ষে সহজ নয়।

মণিপুরী নাচের জন্ম মণিপুরে। পুরাণে ও মহাভারতে মণিপুরকে 'নৃত্যভূমি' বলছে। এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস যে পার্বতীর সঙ্গে নৃত্য করবার জন্যই শিব এই মনোরম মণিপুর অঞ্চল সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এক সময় যেখানে হরপার্বতী নৃত্য করেছিলেন, সেখানকার সব নাচই এখন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে। মণিপুরীরা বৈষ্ণব—কৃষ্ণভক্তিই তাদের নাচের উৎস। 'রাসলীলা' মণিপুরী নৃত্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। রাসলীলা বছরে পাঁচবার ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন নামে অনুষ্ঠিত হয়—বসন্তরাস, কুঞ্জরাস, কান্তরাস, নর্তরাস ও

মহারাস। এই সব-কয়টি নৃত্যের ধারাই কিন্তু মোটামুটি একই রকম। গানের বাণীতে যা বলা হয়, গোপী ও শ্রীকৃষ্ণ-বেশী নর্তক-নর্তকী তারই ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করে নাচে।

মণিপুরীদের আর একটি নাচ আছে 'লাই হারুবা' অর্থাৎ দেবার্চনা। প্রতি গ্রামেই বছরে একবার এই নাচের অনুষ্ঠান হয় দেবতার তুষ্টিসাধনের জন্য। সমস্ত গ্রামবাসী এই নাচে অংশগ্রহণ করে।

পুংচোলম ও করতাল-চোলমও মণিপুরীদের মধ্যে জনপ্রিয় নাচ। কীর্তনের সঙ্গে ঢাক অথবা করতাল বাজিয়ে এই নাচ নাচা হয়। এ নাচ অনেকটা তাণ্ডবের মত,—আগাগোড়া বীরভাব।

এই সব নাচ ক্লাসিক পর্যায়ের, প্রাচীন কলাশাস্ত্রসম্মত। ভারতীয় নৃত্যকলাবিদ্যা সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রাচীন বই ভরতের নাট্যশাস্ত্র। ভরত এই গ্রন্থে কলাবিদ্যাকে বিচার ওবিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থ খুবই প্রাচীন এবং আমাদের নৃত্যকলা ও অতি-প্রাচীন। মহেনজোদারো ও হরপ্পায় মাটির নীচে যা কিছু পাওয়া গেছে তার মধ্যে নৃত্য-ভঙ্গিমার চিত্রও আমরা পেয়েছি। এই দু'টি নগরের ইতিহাস অন্ততঃ তিন হাজার বছর আগেকার ইতিহাস। নৃত্য মিশে আছে হিন্দুধর্মের সঙ্গে। আমাদের শিব নাচেন, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ নাচেন। নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দ চলছে বিশ্বপ্রকৃতির বুকে মায়াজাল সৃষ্টি করে, নটরাজের সে নৃত্য জীবাত্মার অন্তর্লোক। আর নটবর শ্রীকৃষ্ণ নাচছেন গোপীদের সঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা আর গোপীরা জীবাত্মা। পরমাত্মাকে পাবার জন্য জীবাত্মা গভীর আকুতি নিয়ে জীবনের গতির তালে তালে নেচে চলেছে। এই নৃত্যচ্ছন্দে সুর জোগাচ্ছে মুরলীর ধ্বনি, অর্থাৎ বিশ্বের চিরন্তন কর্মচ্ছন্দের ঐক্যতান। এই ভাবদর্শনের জন্যই সম্ভবতঃ আগেকার কালে আমাদের মন্দিরে দেবতার অর্চনা সম্পূর্ণ করতে হলে নৃত্যানুষ্ঠান আবশ্যিক ছিল; এখনও প্রাচীন মন্দিরগাত্রে নৃত্যরত অজস্র ভঙ্গী দর্শনীয় হয়ে আছে।

নাচ দেখতে দেখতে নাচের কথায় চলে এলাম। এই কাহিনীর মধ্যে এটুকু প্রাসঙ্গিক হলেও বাহুল্য। যাক্, বাংগালুরে এবারকার সম্মেলনের এইটাই শেষ প্রোগ্রাম। নাচ দেখেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

নাচের শেষে ছিল অভিনয়, কিন্তু সে অভিনয় দেখতে হলে রাত দশটা চল্লিশের ট্রেন ধরা যায় না। আর ঐ ট্রেনেই আমরা কয়েকজন রওনা হব শ্রীরঙ্গপট্টন।

বিছানাপত্তর বাঁধাই ছিল, আহার শেষ করে জানাচেনা দু'-চার জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওনা হলাম। স্টেশনে যখন পৌঁছলাম ট্রেন ছাড়তে তখন মাত্র দশ মিনিট বাকি।

রাত দশটা চল্লিশের প্যাসেঞ্জার। মিটার গেজের গাড়ী। যাবে মহীশূর অবধি। আমরা অনেক আগেই স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। স্থটেকেস্‌গুলি 'লেফট্ লাগেজে' জমা করে দিলাম। হোল্ড্-অলে শুধু একটা করে হাল্কা বিছানা রইল সঙ্গে, আর সামান্য দু'-একটা করে জামা-কাপড়। ঘোরাফেরার ব্যাপারে বোঝাটা হল্কা করে রাখাই স্থবিধে।

কিন্তু গাড়ীর অবস্থা দেখে চমকে উঠলাম। গাড়ীতে তখনই এত লোক যে বসবার স্থানও নেই। যদি বা একটু স্থান হতো, তা বাংকের উপর লম্বালম্বি শুয়ে আছে ক'জন। শেষ অবধি চলাচলের পথে হোল্ড্-অল রেখে তারই উপর যে যার বসে পড়লাম।

এদিকে গাড়ী ছাড়ার সময় যত এগিয়ে আসে যাত্রীর সংখ্যা তত বাড়ে। শেষে দাঁড়াবার মতো জায়গাও বোধ হয় আর থাকে না। বাংকের মানুষগুলি কিন্তু তখনও নির্বিকার। শেষে কে-একজন চেকারকে ডেকে আনলো। চেকার এসে বাংকের লোকগুলোকে তুলে নীচে নামিয়ে দিলে। এবার সবাই জিনিষপত্রগুলো তুলে দিলে বাংকের উপরে। তাতে চলাফেরার মতো একটু অবকাশ

পাওয়া গেল, কিন্তু সকলের বসবার মত স্থান সংকুলান হ'লো না। চোখে পড়লো রেলের কর্তারা কামরার গায়ে লিখে রেখেছেন—'লেস্ লাগেজ, মোর কম্‌ফর্ট' অর্থাৎ লাগেজ কম নাও সাচ্ছন্দ্য বেশী পাবে। রেল-কর্তাদের রসবোধ আছে। পরশুরামের গল্পে পড়েছিলাম, নীরোগ ব্যক্তিকে কবিরাজ বলেছেন—'অয়, জানতি পার না।' যেখানে মানুষের দাঁড়াবার মত স্থান নেই সেখানে লাগেজের কথা, আবার বেশী লাগেজের জন্য উপদেশ! কর্তারা বোধ হয় মনে করেন যে এ দেশের মানুষগুলো এতই বোকা যে ট্রেনে যাবার সময় অ-দরকারী যত বোঝা নিয়ে যায়, আর এই উপদেশটুকু চোখে পড়ামাত্রই সেগুলি সব প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে দিয়ে তারা চলে যাবে। অথবা তাঁরা মনে করেন, যারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী তারা যত দূরেই যাক তাদের আর জামাকাপড়, বিছানাপত্র কি হবে? এ-দেশে কত মানুষই তো আগের দিনে গাছতলায় থাকতো, এখনকার দিনে সহরের ফুটপাথে থাকে! নিঃসম্বল বাস্তুহারারা সেই সংখ্যা বাড়িয়েছে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা না হয় আরো কিছু বাড়ালো। আমাদের 'জাতির জনক' মহাত্মাজী যে ভাবে চলেছিলেন, সাধারণ মানুষের তো সেইটাই শেখা উচিত। রেলকর্তারা সাধারণ ন'ন, অনেক উপর থেকে ভগবানের দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা দেখেন। যাত্রীদের কোন কষ্টই তাঁদের চোখে পড়ে না। আপিসের কাগজপত্র দুরস্ত রেখে, মাঝে মাঝে খবরের কাগজে ফতোয়া ছাপলেই হ'লো। স্বাধীনতা পাবার পর বারো বছর যখন এই ভাবে চলে গেছে তখন আরো বারো বছর ঠিক চলবে। ততদিনে উচ্চ থেকে উচ্চতর—উচ্চতম বেতন নিয়ে তাঁরা বিদায় নেবেন, পরে যা হয় হোক্ গে! গাড়ী বাড়িয়ে যাত্রীদের সাচ্ছন্দ্য বিধান করা তাঁদের কাজ নয়, তাঁদের কাজ হ'লো দামী স্যুট পরে, সৌখীন টাই বেঁধে, ভালো মোটরে চড়ে জাতীয় সমৃদ্ধির ঝলমলানি বৃদ্ধি করা।

সেই ভাবে বসে বসেই সারাটা রাত কাটলো: সময় কোন-কিছুর অপেক্ষা রাখে না।

ভোর চারটের সময় এসে পৌঁছলাম শ্রীরঙ্গপত্তনমে। তখনও শেষ রাত্রির অন্ধকার ঘোচে নি। তার উপর শীতের হাওয়ায় সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আমরা সরাসরি বিশ্রাম-আগারে গিয়ে ঢুকলাম।

ঘণ্টা দুয়েক পরে দিনের আলো ফুটলো। ঘন কুয়াশা ঢাকা শীতের সকাল। প্ল্যাটফর্মের কোনখানে কোথাও একটা মানুষ নেই। প্ল্যাটফর্মের বাইরেও কোথাও একখানি গাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই। কাজেই আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।

এবার পথে গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। দেখা গেল একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসছে। আমাদের ছই-এ ঢাকা গরুর গাড়ীর মত গাড়ী, ঘোড়ায় টানছে। এর নাম ঝট্কা। একখানি ঝট্কায় কোন মতে তিনজনের স্থান হতে পারে, কিন্তু আমরা ছ'জন। ঝট্কাওয়ালা আর একখানি ঝট্কা ডাকতে গেল। ঝটকা নিয়ে ফিরলো প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে। আমরা যখন গাড়ীতে উঠলাম তখন সাতটা বাজে। আমাদের ছ'জনকে নিয়ে খুটখুট করে ঝট্কা অগ্রসর হলো। এ কলিকাতার সহর নয়, তাড়াতাড়ির ব্যস্ততা এখানে কোথাও নেই।

কিছুটা পথ নিরিবিলি, জনবসতিহীন. তারপর জীর্ণ কয়েকখানি পাকা বাড়ী বা কুটীর। এক সময় এখানে যে নগর ছিল, এখন তারই স্মরণ-অবশেষ একখানি মলিন গ্রাম। মানুষের বসতি ক্ষীণ হলেও সরল প্রশস্ত পথের বিস্তার জানিয়ে দেয় যে এখানে এককালে বহু পথিকের পদচিহ্ন পড়েছিল।

একখানি জীর্ণ ঘরে একটি কফির দোকান চোখে পড়লো (চা এখানে দুর্লভ)। ঢুকে পড়লাম। কফির সঙ্গে ধোসা, ইট্‌লি ও বড্ডা ছাড়া সেখানে আর কিছু মেলে না। ধোসা হলো চাল-ডালের

সরু চাকলি, ইট্‌লি চালগুঁড়োর বড়া, আর বড্ডা কড়াইয়ের ডালের বড়া। ধোসার মধ্যে কিছু আলু-পেঁয়াজের তরকারী দিয়ে লাঠির মত পাকিয়ে দিলে, তার নাম হয় মশলাদার ধোসা, খাদ্য হিসাবে তার আভিজাত্য বাড়ে, দামও বাড়ে। পাটিসাপটা ধরণের মশলাদার ধোসা এক একখানি আর এক এক কাপ কফি খেয়ে নিলাম। আহারটা রুচিমত হ'লো না, কিন্তু শীতের সকালে গরম কিছু পেটে পড়লো, এই যা। কবির ভাষা একটু বদলে বলা যায়—

গরম যা পাও হাত পেতে নাও,
রুচির কথা এখন থাক ;
ঘরের কথা লাভ কি ভেবে—
তেরো শো মাইল মাঝের ফাঁক।

এবার আমরা কেল্লার ফটকের সামনে এসে পড়লাম। পথের পাশ দিয়ে সুরু হলো দুর্গপ্রাকার। এই দুর্গপ্রাকারের সঙ্গে হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের নাম জড়িয়ে আছে।

শ্রীরঙ্গপত্তনম্ পৌরাণিক নগর। কাবেরী নদীর তীরে এটি কাবেরীর একটি দ্বীপ। নগরের পশ্চিমে কাবেরী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে নগরটিকে ঘিরে পূর্বে যুক্ত হয়েছে। নগরটির দু'পাশ দিয়ে দু'টি ধারা প্রবাহিত, উত্তর ধারা ও দক্ষিণ ধারা। নদীর ওপারে ছোট ছোট পাহাড় চোখে পড়ে। স্থানটি মনোরম। মহামুনি গৌতমের স্থানটি ভাল লাগে। তিনি এখানেই কিছুকাল তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে শ্রীবিষ্ণু রঙ্গনাথ বেশে তাঁকে দেখা দেন। শ্রীবিষ্ণু যে রূপে আবির্ভূত হন, পরে সেই মূর্তিই এখানে স্থাপিত হয়। সেই রঙ্গনাথ স্বামীর নামেই এখানকার নাম হয় শ্রীরঙ্গপত্তনম্। পত্তন মানে নগর। এখানকার আর একটি প্রাচীন নামও আছে,—'গৌতম ক্ষেত্র'।

এই নগরটি পত্তন করেন হয়সাল রাজা বিষ্ণুবর্ধনের ভাই

উদায়াদিত্য, ১১২০ সালে। পরে এটি বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। বিজয়নগর রাজ্যের এক সামন্ত থিরুমলদেব এখানে একটি দুর্গ তৈরী করান। পরে মহীশূরের সামন্ত রাজারা এখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। দেবরাজ নামে এক সামন্ত বিজয়নগরের রাজাকে হারিয়ে দিয়ে এখানে স্বাধীন রাজা হয়ে বসেন। তখন থেকে শ্রীরঙ্গপত্তন নিয়ে মহীশূর একটি স্বাধীন রাজ্য বলে গণ্য হতে স্বুরু করে। বিজনগর রাজ্য প্রতিবেশী বাহমনি-রাজের সঙ্গে অবিরত লড়াই করে, যখন ছত্রখান হয়ে গেল, তখন বাদশাহ ঔরংজীব এখানকার রাজা চিক্‌কা দেবরাজের সঙ্গে সন্ধি করে, তাঁকে স্বাধীন মহীশূর-রাজ বলে নতুন করে স্বীকৃতি দেন।

শিবজী মারাঠাদের সংগঠিত করে তুললেন। মারাঠারা মহীশূরের প্রতিবেশী। প্রায়ই তারা মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করার ভয় দেখাতো, আর এখানকার রাজার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে নিত। মহীশূর-রাজেরা কিছুতেই মারাঠাদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না।

১৭৬০ সালে মারাঠারা একবার চারিপাশ থেকে মহীশূর রাজ্য অবরোধ করে বসলো। মহারাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজা সেনানায়কদের ডেকে বললেন,—তোমাদের মধ্যে কেউ পারবে মারাঠাদের তাড়িয়ে দিতে ?

সকলেই চুপ করে রইল। মারাঠাদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠা সহজ কথা নয়। মহারাজ বললেন,—তাহ'লে কি মারাঠাদের সঙ্গে লড়লে আমরা পারবো না ?

তরুণ ফৌজদার হায়দার আলি ছিলেন সেখানে, বললেন,—মহারাজ যদি অনুমতি দেন. তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—কত সৈন্য তোমার চাই ?

—খুব বেশী প্রয়োজন নেই।

—বেশ, তুমি তৈরী হও।

—আমি তৈরীই আছি, মহারাজ!

পরদিনই অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে হায়দার আলি মারাঠাদের সম্মুখীন হলেন, এবং তাদের হটিয়ে দিলেন মহীশূর সীমান্ত থেকে। মহারাজ সন্তুষ্ট হলেন। হায়দার আলির পদোন্নতি হলো। হায়দার আলির বয়স তখন মাত্র সাতাশ বছর।

হায়দারের বাবাও ছিলেন মহীশূরের ফৌজদার। ফতে মোহম্মদ পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন চাকরি করতে। মহীশূর-রাজ তাঁকে ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন কোলার অঞ্চলে। সেখানকার এক যুদ্ধে ফতে মহম্মদ নিহত হন। হায়দারের মা দুই ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে আসেন বাঙালুরে। হায়দারের বয়স তখন সাত বছর, ছোট ভাই আবাজ পাঁচ বছরের ছেলে। বাঙালুরেই দু' ভাইয়ের বাল্য ও কৈশোর কাটে। যৌবনে দু'জনেই যোগ দিলেন মহারাজার সৈন্যদলে। সাতাশ বছর বয়সে মারাঠাদের হটিয়ে দিয়ে হায়দার মহারাজার প্রিয়পাত্র হলেন।

হায়দার এবার সৈন্যদলকে নতুন কায়দায় গড়তে লেগে গেলেন। ইংরেজ ও ফরাসীদের রণকৌশল তিনি দেখেছিলেন। তাদের লড়াইয়ের পদ্ধতি ছিল একেবারে অন্য ধরনের। ফরাসী শিক্ষক নিযুক্ত করে হায়দার নিজের সেনাদলকে সেই কায়দায় সুশিক্ষিত করে তুললেন।

এদিকে বছর কয়েকের মধ্যেই আবার মারাঠারা মহীশূর রাজ্যে চড়াও হলো। হায়দার তৈরী ছিলেন, তাঁর নতুন বাহিনী নিয়ে তিনি মারাঠাদের অতি সহজেই দূর করে দিলেন। মহারাজ এবার হায়দারকে 'সর্বাধিকারী' করে দিলেন। অর্থাৎ, এবার হায়দার হলেন মহীশূরের প্রধান সেনানায়ক ও প্রধান শাসক।

হায়দারের হাতে এবার যথেষ্ট ক্ষমতা এসে পড়লো। মহীশূর রাজ্যকে এবার বিস্তৃত করবার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। মহারাজার শাসন-পরিষদে যে ক'জন মন্ত্রী তাঁর বিরোধী ছিল, হায়দার একে

একে সকলকে হটিয়ে দিলেন, সমস্ত কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন নিজের হাতে। তারপর একটির পর একটি রাজ্য জয় করে, উত্তরে কৃষ্ণা নদী থেকে দক্ষিণে ডিংরিগল অবধি মহীশূর রাজ্য বিস্তার করলেন। মালাবার জয় করে হায়দার যখন ফিরলেন তখন মহারাজ কৃষ্ণরাজার মৃত্যু হয়েছে, তাঁর বড় ছেলে সিংহাসনে বসেছেন। আগের রাজা হায়দারকে যেমন স্নেহ করতেন, নতুন রাজা তেমন নন। তিনি হায়দারের কোন কর্তৃত্বই পছন্দ করতেন না। কথায় কথায় হায়দারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটতে লাগলো।

শেষ অবধি হায়দার দেখলেন নতুন রাজার সঙ্গে মানিয়ে চলা সম্ভব নয়, তাঁকে স্ববশে আনার জন্য তিনি রাজাকে বন্দী করলেন, প্রাসাদের দ্বারে সান্ত্রী বসিয়ে দিলেন। নতুন রাজা কিন্তু নতি স্বীকার করলেন না। তিনি গোপনে মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এরা এতদিন হায়দারের প্রাধান্য দেখে ঈর্ষা করছিল, এবারে সুযোগ ও অজুহাত পেয়ে তিন শক্তি একযোগে মহীশূর আক্রমণ করলো। কিন্তু হায়দার এজন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিন শক্তিকেই হটিয়ে দিলেন তিনি। এই যুদ্ধই 'প্রথম মহীশূর যুদ্ধ' নামে ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করেছে।

মারাঠারা কিন্তু ছাড়লো না, তিন বছর বাদে তারা আবার নতুন উদ্যমে হায়দারকে আক্রমণ করলো, শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করলো। হায়দার হেরে গেলেন। মহীশূর রাজ্যের একটা অংশ মারাঠাদের ছেড়ে দিতে হলো, আর তারই সঙ্গে দিতে হলো অনেক টাকা। হায়দার মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

হায়দার ইংরেজদের ভাল চোখে দেখতেন না। বিদেশী, ব্যবসা করতে এসে ছলে বলে কৌশলে রাজ্যবিস্তার করছে, এদেরকে এ-দেশ থেকে তাড়াতে হবে। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করার সুযোগ তিনি খুঁজছিলেন। সেই সুযোগ মিলে গেল কর্ণাটকের ব্যাপারে। সেখানে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে বিরোধ চলছিল। দু'দলই

চাইছিলেন যে তাঁদের মনের মত লোক রাজা হোক্ আর তাঁরা অবাধে ব্যবসা চালিয়ে যান। ইংরেজরা কর্ণাটকে সৈন্য পাঠালো হায়দারের রাজ্যের ভিতর দিয়ে। হায়দার তার কৈফিয়ৎ চাইলেন। ইংরেজরা এই বে-আইনী কাজের ভালো কৈফিয়ৎ দিতে পারলো না, হায়দার কর্ণাটক আক্রমণ করে ইংরেজদের হারিয়ে দিলেন।

শেষ অবধি ইংরেজদের ভাগ্যে কি ঘটতো বলা যায় না। কিন্তু হায়দার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পিঠে ক্যানসার হয়ে তিনি মারা গেলেন।

টিপু সুলতান হলেন রাজা। টিপু আবার ইংরেজ সম্পর্কে বাপের চেয়েও কঠোর ছিলেন। ইংরেজদের একেবারে এ-দেশ থেকে বিতাড়িত করবার জন্য তিনি শক্তি সঞ্চয় করতে সুরু করলেন।

কিন্তু টিপু রাজা হয়েই দু'টো ভুল করে বসলেন। তিনি ঘোষণা করলেন—মহীশূর একটি স্বাধীন রাজ্য এবং তিনি তার মহারাজা। হায়দার মহীশূর রাজ্যের কর্মচারী ছিলেন, সেজন্য তাঁর দুর্বলতা ছিল, ব্যবহারের দিক থেকে তিনি মহীশূর-রাজকে সম্মান করতেন। টিপুর সে বালাই ছিল না। রাজভক্ত হিন্দু প্রজারা টিপুর এই ঘোষণায় ক্ষুণ্ণ হলো।

টিপু আর একটা ভুল করলেন। একটি পুরানো মন্দিরকে তিনি মসজিদ করে দিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তনে হনুমানজীর অঞ্জনেয় মন্দির ছিল। ছেলেবেলায় সে মন্দিরের সামনের মাঠে টিপু খেলা করতেন। একদিন খেলার মাঠে এক ফকির এসে টিপুকে বললো—বেটা, তুই রাজা হবি।

টিপু থমকে দাঁড়ালেন, বললেন—আমি রাজা হব?

—হ্যাঁ রে বেটা, দেখিস তুই রাজা হবি।

—বেশ, যদি আমি রাজা হই তখন তুমি যা চাইবে তোমাকে তাই দেব।

—ততদিন আমি বাঁচবো না রে বেটা! আর আমি ফকির মানুষ, আমার টাকাপয়সা ধনদৌলতে কোন দরকার নেই। তুই রাজা হলে একটা ভালো কাজ করিস্।

—কি কাজ বল?

—এখানে আল্লার নামে তুই একটা ভাল মসজিদ্ বানিয়ে দিস্।

ছেলেবেলার সেই কথা টিপুর মনে ছিল। রাজা হয়ে টিপু আর নূতন মসজিদ বানালেন না, হিন্দুদের উপর কড়া হুকুম দিলেন—এই হনুমানজীর মন্দির থেকে মূর্তি সরিয়ে নাও, এখানে আমি মসজিদ বানাবো।

হিন্দুরা মূর্তি সরাতে বাধ্য হলো। সেই মন্দিরকেই টিপু করলেন জুম্মা মসজিদ। সামনে ছু'টি উঁচু মিনার তৈরী হলো, আর দেয়ালে দেয়ালে খোদাই করা হলো কোরাণের উদ্ধৃতি। এর ফলে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে টিপুর পতন কামনা করতে স্থুরু করলো।

টিপু প্রথম আক্রমণ করলেন ত্রিবাংকুর রাজ্য। ত্রিবাংকুর তখন ইংরেজের আশ্রিত। আশ্রিতকে রক্ষা করার জন্য ইংরেজরা এগিয়ে এলো। ইংরেজদের সাহায্য করলো নিজাম ও মারাঠারা। তিন দিক্ থেকে আক্রান্ত হয়ে টিপু হেরে গেলেন। ইংরেজরা বাঙালুর দখল করে বসলো। টিপু পিছিয়ে এলেন শ্রীরঙ্গপত্তনে। ইংরেজরা শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করলো। ইংরেজদের গোলাবর্ষণে কেল্লার পূর্বদিকের প্রাকার ভেঙে পড়লো। সন্ধি না করে টিপুর আর উপায় রইল না। সন্ধিতে রাজ্যের অনেকখানি অংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হলো, আর দিতে হলো অনেক টাকা। সব টাকা একসঙ্গে টিপু দিতে পারলেন না, যতদিন না সেই টাকা শোধ হয় ততদিন ছু'টি ছেলেকে জামিন রাখতে হলো ইংরাজদের দরবারে। ইতিহাসে এই সন্ধি 'শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি' নামে খ্যাত।

এতটা নতি স্বীকার করার জন্য টিপু তৈরী ছিলেন না। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি তৈরী হতে লাগলেন। ফরাসীরা তখন ইংরেজদের শত্রু। টিপু সেনাদলে ফরাসী অফিসার নিয়োগ করলেন, পুরোপুরি বিলিতি কায়দায় শিক্ষিত করে তুললেন নিজের সেনাদলকে। আর একদিকে প্যারিসে ফরাসী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কাবুল, আরব ও পারস্যের রাজ-দরবারেও দূত পাঠালেন। মারাঠা, নিজাম ও অন্যান্য ভারতীয় রাজাদের দরবারেও টিপুর বার্তাবহ গেল। বিদেশী ইংরেজদের ভারত থেকে দূর করার জন্য টিপু চারিদিক থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন।

ইংরেজ বড়লাট লর্ড কনোয়ালিস সবই জানতে পারলেন। মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে তিনি একটা চুক্তি করে ফেললেন, তারপর চরমপত্র পাঠালেন টিপুর কাছে—'আমাকে উপরওয়ালা বলে মানতে হবে, আমাকে কর দিতে হবে; আমার এজেন্ট থাকবে তোমার রাজ্যে, তার কথামত তোমাকে চলতে হবে।'

টিপুর পক্ষে এত অপমান সহ্য করা সম্ভব নয়। টিপু যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন। ইংরেজরা হু'দিক থেকে টিপুকে আক্রমণ করলো—পূর্বে মাদ্রাজ ও পশ্চিমে বোম্বাই থেকে ইংরেজ সেনা অগ্রসর হলো। টিপু হু'দিক রক্ষা করতে পারলেন না। ইংরেজবাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তনে এসে তাঁবু ফেললো। ইংরেজরা খবর পেয়েছিল কেল্লার পশ্চিম দিকের দেয়ালটা দুর্বল। আট ফুট মাত্র পাথর দিয়ে গাঁথা, তার উপর বাকি দশ ফুট মাটির গাঁথুনি। সেই দিক্ থেকে ইংরেজরা গোলাবর্ষণ সুরু করলো। গোলার আঘাতে সেই দেয়াল ভেঙ্গে পড়লো। তার পিছনে ছিল আর এক দেয়াল। সে দেয়াল টপ্‌কানো সহজ ছিল না। কিন্তু টিপুর দেওয়ান মীর সাদেক বিশ্বাসঘাতকতা করলো, পূর্ব দিকের দরজা খুলে দিল। হুড়মুড় করে কেল্লার মধ্যে ইংরেজ ও মারাঠা সেনারা ঢুকে পড়লো। অবশ্য মীর সাদেক তার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হাতে-হাতেই পেল,

ব্যাপারটা এক সান্ত্রার নজরে পড়েছিল, সে সাদেককে গুলি করে হত্যা করলো। কেল্লার পূর্বদিকের ফটকের বাইরে একটা ঢিপি দেখিয়ে এখনও এখানকার মানুষ বলে—এইটে নিমকহারাম মীর সাদেকের কবর।

এদিকে কেল্লার মধ্যে শত্রুরা এসে পড়লো, টিপু আর সামলাতে পারলেন না। কোন এক সময় বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে তিনি পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়েও তলোয়ার দিয়ে তিনি শত্রুদের আঘাত করছিলেন। এক ইংরেজ সৈনিক তখন তাঁকে গুলি করে হত্যা করলো।

কেল্লা দখল হলো। যুদ্ধ শেষ হলো। টিপুকে না পেয়ে ইংরেজরা যখন তাঁর সন্ধান করছে, তখন টিপুর মরণাপন্ন খাস মুন্সী (প্রাইভেট সেক্রেটারী) আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন টিপুর মৃতদেহ। সে দেহ দেখে ইংরেজরা সহসা বিশ্বাস করতে পারে নি যে তিনি টিপু। তাঁর বেশভূষায় রাজকীয় কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। শুধু কোমরে একটি সোনার কোমরবন্ধ ছিল মাত্র। তবে যারা টিপুকে চিনতো, তারা চিনতে পারলো। এক মহাশত্রুর নিপাতে ইংরেজরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের শেষ দুর্জয় প্রতিবন্ধক অপসারিত হলো। ইংরেজদের এদেশে আর কোথাও এমন বিচক্ষণ শত্রুর সম্মুখীন হতে হয় নি।

টিপুর কথা ভাবতে ভাবতে আমরা দুর্গের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলাম।

শ্রীরঙ্গপত্তন।

কেল্লার ভিতর দিয়ে ঝট্‌কা চলেছে।

লোকজন চোখে পড়ে না। ফাঁকা মাঠ ঘিরে কেল্লার প্রাচীর। রাজকীয় আড়ম্বরে এই স্থান একদিন সরগরম ছিল; এখন সে রাজা নেই, জনতার জৌলুষও হারিয়ে গেছে। এখন এই পথে আমাদের মত দু'-চার জন দৈবাৎ হয়তো আসে ইতিহাসের জীর্ণ পৃষ্ঠার

যোগাযোগটুকু প্রত্যক্ষ করার নেশায়। ছু'-চার জন অতীত-কাহিনী-রসিকের জন্য এই পথ। এই পথের ধারেই টিপু সুলতান একদিন কৈশোর-চাপল্যে জীবন সুরু করেছিলেন, আবার এই পথের পাশেই গুলি খেয়ে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। টিপুর বিজয়-বাহিনীর পদক্ষেপে এই পথ ধূলি উড়িয়েছে, আবার পরাজিত টিপুর অন্তিম রক্তধারা এই পথই গায়ে মেখেছে। টিপুর আগেও এই পথ ছিল, টিপুর পরেও এই পথ আছে। কত জন কত ভাবে এসেছে ও চলে গেছে, পথ কিন্তু অনড়, অচল, সর্বংসহা। পথই বুঝি মহাকালের প্রতিভূ। চিরন্তন মহাকাল, আর নিরবধি অশেষ পথ। এক প্রত্যক্ষ, আর এক অপ্রত্যক্ষ। দার্শনিকের ভাষায় বলা যায়—এক 'কন্‌ক্রিট', আর এক 'আবস্‌ট্রাক্‌ট'। কিন্তু ও-সব বড় বড় কথা। তবু সংক্ষেপে বলি, মহাকালের পার্থিব রূপ এই মহাপথ। এদের পরিমাপ দিয়ে সীমিত করে, নামকরণ করে, আমরা এদের ছোট গণ্ডীর মধ্যে ধরতে চাই। সে শুধু আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য খণ্ডাংশ মাত্র।

আমাদের ঝট্‌কা কেল্লার ফটক পার হয়ে এসে পড়লো এক গ্রামে। গ্রামের নাম গঞ্জাম। সাধারণ গ্রাম। কয়েক ঘর গরীব লোকের বাস। গ্রামের পাশ দিয়ে পথ বরাবর গিয়ে আমাদের পৌঁছে দিল গম্বুজে। গম্বুজ, হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সমাধি-মন্দির। উপরটা মসজিদের ধরণে গোলাকার বলেই এর নাম গম্বুজ। লালবাগ নামে সুন্দর একটি বাগানের কেন্দ্রে উঁচু ভিতের উপর এই সৌধ। চারিপাশে প্রশস্ত বারান্দা। বারন্দায় সারি সারি কালো পাথরের থাম। সমাধি-মন্দিরের দরজাটি আবলুষ কাঠের তৈরী। তার উপর গজদন্তের কারুকাজ। ভিতরে তিনটি সমাধি,—মাঝে হায়দার আলি, এক পাশে টিপু সুলতান, আর-এক পাশে টিপুর মা। হায়দারের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির উপর টিপু এই সৌধটি তৈরী করেছিলেন, পরে টিপুকেও এখানে সমাধিস্থ করা

হয়। সমাধি-মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ভিতরে ছিলেন, তিনি আমাদের হাতে কয়েকটি ধূপ দিলেন। আমরা একে একে সে ক'টি জ্বালিয়ে দিলাম সমাধির সামনে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অনাচার দেশের মাটি থেকে যিনি উৎখাত করতে চেয়েছিলেন সর্বপ্রথম, নীরবে সেই মানুষটিকে স্মরণ করে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। শান্ত, স্তব্ধ সে সমাধি-মন্দির ধূপ ও ধূনায় রহস্যময়—মহীয়ান্ হয়ে উঠেছে। মনে হয় টিপুর অশরীরী আত্মা যেন সেখানে ধ্যানমগ্ন, ভারতের স্বাধীনতায় প্রশান্তচিত্ত। ইংরেজ আজ এ দেশ থেকে দূর হয়েছে, টিপুর আত্মা আজ শান্তিলাভ করেছে।

সমাধি-মন্দিরের চারিপাশে অসংখ্য সমাধি। টিপুর পুত্র, বেগম, আত্মীরপরিজন, বন্ধু ও সেনানায়ক যাঁরা সেদিনের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন, এগুলি তাঁদের সমাধি। গম্বুজের বারান্দায় কালো পাথরের আর একটি সমাধি। এটি আর সব থেকে পৃথক। এটি টিপুর ধাত্রীর সমাধি। ইনি টিপুকে মানুষ করেছিলেম, পৃথক ভাবে তাই এঁকে সম্মান দেওয়া হয়েছে।

একপাশে উপাসনার চত্বর।

সমাধি-মন্দিরের চারিপাশ ঘিরে মনোরম এক উদ্যান,—লালবাগ। উদ্যানের একধারে টিপুর প্রাসাদ। প্রাসাদের অবশেষ আছে ভাঙা দেয়াল আর মাটির স্তূপ। যুদ্ধশেষে ইংরেজ সেনা এই প্রাসাদ লুঠ করে ও ধ্বংস করে।

লালবাগের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে কাবেরী নদী। গম্বুজ থেকে পূর্ব দিকে কিছুটা গেলেই কাবেরীর ঘাট। ঘাটের সামনেই কাবেরীর দু'টি ধারা একত্রে মিশিছে। শ্রীরঙ্গপত্তনের পশ্চিমে কাবেরীর একটি শাখা বেরিয়ে উত্তর দক্ষিণ বেষ্টন করে আবার এই পূর্বে একত্র হয়েছে। কাবেরী বিশেষ চওড়া নয়, কিন্তু সংগমক্ষেত্রে বিস্তার বেশী হবেই। স্বচ্ছ জল, গভীর নয়, কিন্তু স্রোতের টান

খুব বেশী। ওপারে পাহাড়, জলের মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝে পাথরের চাঁই মাথা তুলেছে। সেই সব পাথরের গায় ধাক্কা খেয়ে স্রোতধারা ফেনিল হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট আবর্ত সৃষ্টি করেছে। এ সত্যই গৌতমের তপস্যার উপযুক্ত স্থান।

সংগমের উপরেই প্রশস্ত ঘাট। ঘাটের উপরেই অনেকখানি জুড়ে চত্বর। চারিপাশে কয়েকটি বড় বড় গাছ চত্বরটিকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। নদীর কিনারা ধরে ছোট বড় গাছের সারি চলে গেছে দূরান্তে। একটি অশথ গাছের ছায়ায় আমরা বসলাম। ভবেশ বললো,—এখানে আমরা সবাই স্নান করে নিই।

ঝট্‌কার গাড়োয়ান সঙ্গেই ছিল, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা দুর্বোধ্য হিন্দিতে বললো,—স্নান করে নিন, শরীর ঠাণ্ডা হবে। তবে একটু সাবধানে নামবেন। ঘড়িয়াল আছে।

—ঘড়িয়াল !—এখানকার এই পাহাড়ী জায়গায়, অগভীর নদীতে কুমীর ?

সুধীন বললো,—থাক্ কুমীর, আমাদের মগ আছে। ঘাটের সিঁড়িতে বসে মগে জল তুলে মাথায় ঢালবো।

দেখলাম ঘাটের আর এক প্রান্তে আরো ক'জন লোক সেই ভাবেই স্নান করছে। কেউ কেউ অবশ্য কোমর জলে নেমেছেও।

বৈরাগীর ঝোলার মত আবশ্যিক দ্রব্যের একটি ঝোলা আমাদের প্রায় নিত্যসাথী। এবার প্রত্যেকের ঝোলা থেকে বেরোলো গামছা, তেল, মাজন, আরশী, চিরুণী, পায়জামা বা লুঙ্গি ও মগ। শীতের হাওয়া উপেক্ষা করে সেই নদীর কিনারায় বসে নগ্ন দেহে সবাই তেল ঘষতে সুরু করে দিলাম। সেই স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ জল অবগাহন করার জন্য আমাদের কাছে অবিরত মৌন আবেদন জানাচ্ছিল। নদী তার নীলাভ দৃষ্টি দিয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে ছিল যেন।

কিন্তু কুমীরের ভয়ে আমরা অনেকেই জলে নামলাম না। মগে

করে জল তুলে মাথায় ঢাললাম। প্রকৃতির স্নেহাশীষে শরীর ও মন স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো।

স্নান শেষ করে একটি অশথ গাছের নীচে বসলাম। নীল জলধারার পিছনে পাহাড়ের নীলাভ শ্যামলিমা, পাথরের ঢেউ এসে মিশেছে জলের ঢেউ-এ। পাহাড়ের মাথায় পূর্বাহ্নের সূর্য। ফেনিল জলের বুকে রৌপ্যাভ ঔজ্জ্বল্য। ঝলমলে ফেনিলতা নদীর মুখে একটি হাসির রেখা টেনে দিয়েছে। কুল কুল শব্দের মধ্যে চপলা এক দুষ্টু মেয়ের চঞ্চল হাসির খিলখিল শব্দ এসে মিশেছে যেন। রূপস্রষ্টা নিজের পানে তাকিয়ে এখানে নিজেই যেন হাসছেন।

"তরুটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে—
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা ;—
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।"

বসেছিলাম। কোন এক সময় গাড়োয়ান এসে বললো—এ কি বাবু, বসলেন যে ? এখনও বহুৎ দেখতে বাকি, জল্‌দি করুন।

দু'-হাজার বছর ধরে প্রকৃতি থেকে দূরে সরে আসার যে সাধনা মানুষ করেছে, বিংশ শতকের সেই ঘড়ি-ধরা মানুষ—সভ্য মানুষ আমরা। আমাদের সৌন্দর্য ভোগের অবসর কোথা ?

এবার ঝট্‌কা ছুটলো পশ্চিমমুখো। খোয়া-বিছানো পথে ঝট্‌কায় যাওয়া একটা শাস্তি। ছোটদের রূপকথায় রাক্ষসী-রাণীর হাড়-মুড়মুড়ি ব্যায়রামের কথা আছে। ছুটন্ত ঝট্‌কায় কিছুক্ষণ

বসে থাকলেই সেই রোগের প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়। দেহের যেখানে যত অস্থির সংযোগ আছে সবই খট্‌খট্‌ করতে থাকে। বার বার মনে হয়, নেমে হেঁটে যাই। কোন মতে স্থির হয়ে বসার যো নেই, ক্ষণে ক্ষণে সরে-নড়ে যেতে হবে।

এবার আমরা এসে পৌঁছলাম দরিয়া-দৌলত-এ। কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে সুন্দর সুদৃশ্য একটি বাগান। এটি এক সময় টিপু সুলতানের সখের বাগান ছিল। টিপু নানা ফলফুলের গাছ দিয়ে এটিকে সাজিয়েছিলেন। রাজাসনে বসার আগে তিনি এখানে একটি গ্রাষ্মাবাস তৈরী করান,—নাম দেন দরিয়া-দৌলত, অর্থাৎ নদী-সম্পদ্‌ বা সমুদ্র-সম্পদ্‌। পশ্চিমে আরব সাগরের তীরে মাংগালুর অবধি হায়দার আলি রাজ্যবিস্তার করেছিলেন, সেই কথাটা স্মরণ করেই অথবা সেই অঞ্চল থেকে আহরণ করে আনা সম্পদ্‌ থেকেই হয়তো টিপু সুলতান তাঁর এই নতুন প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন।

দরিয়া-দৌলত একখানি সুদৃশ্য দোতলা বাড়ী। কয়েকটি সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রশস্ত বারান্দা। কাঠের কারুকাজ করা থামের উপর দোতলার ছাদ। চারপাশে চতুষ্কোণ বারান্দার মাঝে নীচের তলে একখানি ছোট হল্‌ঘর। তারই উপরে দোতলায় চারখানি ঘর। দোতলার মাঝের ঘরখানি আর-সব ঘরের চেয়ে বড়। বড় ঘরখানির সামনে খানিকটা বারান্দা বের করা আছে, সেখানে বসে টিপু নীচের চত্বরে অনেক সময় সভা করতেন। ধরণটা অনেকটা দেওয়ানী-খাসের মত। এই উপর তলে টিপু থাকতেন। দোতলায় ওঠার তিনটি সিঁড়ি আছে কিন্তু সেগুলি দেয়ালের মধ্যে এমন ভাবে গুপ্ত যে সহসা চোখে পড়ে না। এটুকু বোধ হয় তখনকার দিনে নিরাপত্তার জন্য টিপুকে করতে হয়েছিল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠলে সামনের ঘরখানিতে একখানি ছোট সোফার উপর টিপুর একটী মূর্তি বসানো আছে। মনে হয় তিনি যেন দর্শকদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। অন্য তিনখানি ঘরে টিপু, হায়দার

আলি ও তাঁদের পরিবার-পরিজনের নানা চিত্র, বেশভূষা, অস্ত্রশস্ত্র ও ঐতিহাসিক চিঠিপত্র সাজানো আছে। সেদিক থেকে এটিকে একটি যাতুঘরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যেতে পারে।

দরিয়া-দৌলতের বিশেষত্ব আছে—দেয়ালে, থামে, ছাদে সর্বত্রই নানা কারুকাজ। রকমারি রঙের। তার মধ্যে সোনালি রঙের জৌলুষ খুবই বেশী। বড় বড় আকারে দেয়াল ভরা শুধু ছবি। হায়দার আলি যুদ্ধে চলেছেন হাতীর পিঠে, আগুপিছু অশ্বারোহী ও পদাতিকবাহিনী। সেই রকমের আর একখানি ছবি—টিপু স্থলতানের যুদ্ধযাত্রা। তবে টিপুর সেনাবাহিনীতে ফরাসী সৈন্য রয়েছে, তাদের নেতৃত্ব করেছেন মঁশিয়ে লালী। তৃতীয় চিত্রটি টিপুর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ। ইংরেজবাহিনী দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছে। ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল বেলী একখানি পাল্‌কীতে বসে আছেন, কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছেন না। পরাজয় তখন অনিবার্য। আর এক দিকের দেয়ালে টিপুর দরবারের ছবি, আর তাঁরই চারিপাশে সমকালীন অনেক রাজা-রাণীর ছবি। এঁরা কেউ টিপুর বন্ধু, আবার কেউ-বা টিপুর সামন্ত। চিত্তুরের রাণী, তাঞ্জোরের রাজা, বারাণসীর রাজা, পেশোয়া দ্বিতীয় বালাজী রাও, মাগধী, কেম্‌পিগৌদা, চিতলগড়ের রাজা, তৃতীয় কৃষ্ণরাজ ওয়াড়িয়া প্রভৃতির রঙীন দেয়ালচিত্র।

আমাদের পথ এবার প্রাকারের পূর্ব-তোরণ দিয়ে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করলো। সামনেই জুম্মা মসজিদ। আগে এখানে হনুমানজীর মন্দির ছিল, টিপু সেই মন্দির থেকে বিগ্রহ সরিয়ে দেবার জন্য পুরোহিতদের বাধ্য করেন। তার পর মন্দিরের চূড়াটি ভেঙে গোলাকার গম্বুজ বানানো হয়। টিপু ছেলেবেলায় এক ফকিরের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এখানে এক মসজিদ বানাবেন। ফকির নিশ্চয়ই মন্দির ভেঙে মসজিদ বানাতে বলেন নি। কিন্তু নতুন করে মসজিদ তৈরী করানোর অনেক খরচ, তার চেয়ে হিন্দুর মন্দির

ভেঙে মসজিদ বানানো অনেক সোজা। এ দেশের অনেক মুসলমান নবাব-বাদশা এই সহজ পথটাই বেছে নিয়েছিলেন, টিপুও বাদ যান নি। এতে হিন্দু প্রজারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তখনকার দিনে যাদের শক্তি থাকতো, দুর্বলের কথা তারা মোটেই ভাবতো না। টিপুই বা ভাববেন কেন? কিন্তু তার ফল শেষ পর্যন্ত সুখের হয় না— এক্ষেত্রেও হয় নি।

মসজিদ থেকে উত্তরমুখো কিছুটা গেলেই কাবেরীর ঘাট। কেল্লার প্রাকারের নীচে একটি খিলান দিয়ে ঘাটে নামতে হয়, অনেকটা আমাদের কলিকাতার বাবুঘাটের মত। এর নাম হ'ল 'দিড্ডি বাগিলু' অর্থাৎ জলতোরণ বা পানিফটক। পানিফটকের কাছেই একখানি প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে 'টিপুর মৃত্যুস্থান'। এইখানেই টিপু গুলি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, এইখানেই ইংরেজরা তাঁর মৃতদেহ দেখতে পায়। পরে হায়দার আলির সমাধির পাশে সেই দেহ কবর দেওয়া হয়।

এবার আমরা বরাবর গেলাম রঙ্গনাথের মন্দিরে। এই মন্দিরটি হাজার বছরের পুরানো। হোয়সাল রাজারা এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন, তারপর বিজয়নগরের রাজারা এই মন্দিরটীর যথেষ্ট বিস্তার করেন। পরে মহীশূর-রাজারাও এটির অনেক সংস্কার করিয়েছেন।

প্রথমেই একটী বিরাট তোরণ,—গোপুরম্। গোপুরম্ পার হয়েই প্রশস্ত চত্বর, চত্বরের কেন্দ্রে মন্দির। ভিতরে নারায়ণের অনন্ত-শয্যা-মূর্তি। নারায়ণ অনন্তনাগের উপর শুয়ে আছেন. ডান হাতের উপর মাথা, বাঁ হাত পাশে লম্বমান। সারা দেহ অলঙ্কারভূষিত। অনন্তনাগ মাথার উপর সাতটী ফণা ছড়িয়ে দিয়েছে। পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন কাবেরী দেবী, আর তাঁর পিছনে

মহামুনি গৌতম। কিন্তু নাভিপদ্ম নেই, ব্রহ্মামূর্তিও নেই। মূর্তিটি এতই বড় যে দ্বারের সামনে থেকে সবটুকু দেখা যায় না।

শ্রীরঙ্গমেও এই একই ধরণের মূর্তি আছে, তবে সে মূর্তি এর চেয়েও দীর্ঘ।

দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরের মত এখানেও মন্দিরের দেয়ালে বহু কারুকাজ। তবে এখানকার একটী বিশেষত্ব আমরা দেখলাম, সে এখানকার থামগুলি। অন্যত্র চতুষ্কোণ বা গোল দেখেছি, কিন্তু এখানকার থামগুলি দেখলাম চক্রাকার। নীচের দিক্‌টা চতুষ্কোণ তার পরেই চক্র—যেন কয়েকখানি চাকা পর পর যোগ করে উপরের দিক্‌টা তৈরী হয়েছে। এইটীই নাকি হোয়সাল আমলের শিল্প-বৈশিষ্ট্য। পরে এ জিনিস বেলুড় ও হালিবিদেও দেখেছি।

গর্ভগৃহকে ঘিরে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদক্ষিণ-পথ। সেই পথ দিয়ে একপাক ঘুরে প্রদক্ষিণ করে, দেবতার চরণে প্রণাম জানিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

তারপর এলাম 'ডানজিয়ন্'-এ অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ কারাগৃহে। কেল্লার প্রাকারের নীচে ভূগর্ভে একটি কারাগার। আগে অন্ধকার ছিল, এখন চারিপাশ ভেঙ্গেচুরে গিয়ে আলোর আর অভাব নেই। বড় বড় থাম আর খিলানের পর খিলান দেওয়া ষাট হাত লম্বা আর পঁচিশ হাত চওড়া জানালাহীন একখানা ঘর। সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে চললে পদে পদে খিলানে মাথা ঠুকে যাবার সম্ভাবনা। পিছনে কয়েদীকে শিকল বেঁধে রাখার জন্য পাথরের গায়ে বড় বড় গর্ত। এই গর্ত থেকে শিকল দিয়ে কয়েদীকে বেঁধে রাখা হতো। এখানে এক সময় বহু ইংরেজকে টিপু বন্দী করে রেখেছিলেন। সামনে একটি কামান পড়ে আছে,—দশ ফুট লম্বা, ছ' ইঞ্চি ব্যাস। যুদ্ধের সময় এই কামানটি ছিল ডান্‌জিয়নের ছাদের উপরে, পরে গড়িয়ে নীচে পড়েছে। যুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে আজও সেইখানে পড়েই আছে।

শ্রীরঙ্গপত্তনে আর কিছু বিশেষ দেখবার ছিল না। তাই আমরা বরাবর স্টেশনে ফিরে এলাম। ঝট্‌কার কবল থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

শ্রীরঙ্গপত্তন দেখা সেরে যখন স্টেশনে এলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা। গাড়ী সেই বিকাল পাঁচটায়, ততক্ষণ স্টেশনে অলস ভাবে বসে থাকতে হবে। আমাদের দলের ম্যানেজার ভবেশ বললো,—এর মধ্যে আমরা সোমনাথপুরা থেকে ঘুরে আসি। বাসে যাবো, বাসে আসবো।

বাস্-আপিসে গিয়ে খবর নিয়ে দেখা গেল, পাঁচটার আগেই আমরা ফিরতে পারবো। তবে এখনি যে বাস্ আসবে তাতেই যাত্রা করতে হবে।

বাস্ তখনই আসার কথা। বাস্-স্ট্যাণ্ডের সামনেই হোটেল। ইতিমধ্যে হু'টি ভাত খেয়ে নিলে মন্দ হয় না। তখনই খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু ব্যঞ্জনের ব্যাপারে আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। সম্বরম্, পকৌড়ি আর পাঁপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। তবু ক্ষুধার জ্বালায় তা-ই খেতে হলো। তবে খাওয়াটা যে সংক্ষিপ্ত হলো তা বলাই বাহুল্য।

ইতিমধ্যে বাস্ এসে পড়লো। দশ মিনিটের বেশী দাঁড়াবে না। তখনও আমরা কেউ-কেউ খাচ্ছি। অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের মধ্যে কিছুটা প্রবীণ, এতটা তাড়াহুড়ো করে আহার করতে তিনি অভ্যস্ত ন'ন, তাঁর খাওয়াই হলো না। আর সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুই খেলে না। পেশায় শিল্পী হলেও মেজাজে সে মিলিটারী। হু'টি অন্ন মুখে দিয়ে, আর ব্যঞ্জনের স্বাদ নিয়ে সে বললো—নেহি খায়গা।—একটু পাঁপড় আর পকৌড়ি খেয়েই সে উঠে পড়লো।

ইতিমধ্যে বাসের ছাদে আমাদের মালপত্তর তোলা হয়ে গিয়েছিল। আমরা বাসে এসে উঠলাম।

সোমনাথপুরা উনিশ মাইল পথ। বরাবর সেই বাসেই চলে আসার কথা, কিন্তু বাস্ আমাদের নামিয়ে দিল মাঝপথে এক গ্রামে, বান্নুর। সেখান থেকে সোমনাথপুরা পাঁচ মাইল। সেটুকু আবার অন্য বাসে যেতে হবে, এবং সে বাস্ আসতে নাকি পূরো একটি ঘণ্টা তখনও দেরী।

এ অঞ্চলের সর্বত্রই দেখেছি, বাসের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হোটেল থাকে, এখানেও হোটেল দেখলাম সামনেই। আমরা ঢুকে পড়লাম। একখানি চালা-ঘর, কয়েকখানি বেঞ্চি আর বহু পূরানো গোটা তিনেক টেবিল নিয়ে কফি-খানা। পাওয়া যায় কফি, পকৌড়ি ও ডালমুঠ। ভবেশ কফি খায় না, পকৌড়ি আর ডালমুঠ চিবুতে চিবুতে সে বেরিয়ে পড়লো, কারুর সঙ্গে আলাপ করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায় কিনা। কিন্তু সে তল্লাটে পূরো হিন্দি কি ইংরেজি বোঝে এমন মানুষ সে খুঁজে পেলে না। যাকে জিজ্ঞাসা করে সে-ই কানাড়ি ভাষায় এমন উত্তর দেয় যার একটি বর্ণও আমরা বুঝি না।

আমাদের দেশে এই ভাষার বাধা মেলামেশার পক্ষে যে কত বড় প্রতিকূল তা আমরা মধ্য ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে রীতিমত বুঝেছি। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যারা য়ুরোপ ঘুরে এসেছেন, তাঁদের মুখ থেকে সেখানকার রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে ভাষা সম্পর্কে যে সব গল্প শুনেছি, আমাদেরও স্থানে স্থানে সেই অবস্থাই হয়েছে, কেবল স্থান কাল পাত্র বদলেছে। এই প্রসঙ্গে মনে হলো— এদেশে একটি ভাষা-মাধ্যমের একান্ত প্রয়োজন, এবং সেটা ভারতীয় ভাষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যে-দেশের অধিকাংশ মানুষ মাতৃভাষাই লিখতে-পড়তে পারে না, তাদের আবার রাষ্ট্রভাষা শেখা! যে খুঁড়িয়ে চলে সে হেঁটে কেদার-বদরী যাবে!

যাক্, আমাদের বরাত ভালো। শেষ অবধি একটী মানুষ মিলে গেল, তিনি দিল্লীতে চাকরি করেন, আমাদের হোটেলে এলেন কফি খেতে। আমাদের দেখে তিনি ইংরেজিতেই আলাপ সুরু করলেন। তিনি বললেন—আড়াইটের সময় সোমনাথপুরায় তো পৌঁছবেন, তার পর দেখাশুনা করার সময় পাবেন মাত্র দু'ঘণ্টা। সাড়ে চারটের সময় ওখান থেকে শেষ বাস্ ছাড়বে সে বাস্ যদি ধরতে না পারেন তা'হলে সেইখানেই আজ রাতে আপনাদের থাকতে হবে। এবং সেখানে ভালো ভাবে থাকার কোন ব্যবস্থাই নেই।

সুধীন বললো,—কিন্তু মহীশূরে যে আজ রাতে আমাদের ফিরতেই হবে। সেখানে বৃন্দাবন-উদ্যানে আজ সন্ধ্যায় আলো দেবে, না হলে সেই আলো দেখার জন্য সেখানে আমাদের শনিবার অবধি অপেক্ষা করতে হবে। এতদিন মহীশূরে বসে থাকতে পারবো না।

—তা'হলে এক কাজ করুন। এত সব মালপত্তর নিয়ে যাবেন না। এগুলো এখানে রেখে যান। বাস্ থেকে নামবেন, দেখবেন, আবার ফিরতি বাসে চলে আসবেন—কোন ঝামেলা থাকবে না।

তাঁর কথা মতই কাজ করা স্থির হলো। তিনি মধ্যস্থ হয়ে আমাদের হোল্ড্-অল্গুলি সেই হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেজন্য কোন পয়সা-কড়ি লাগলো না। বাস্ এসে পড়লো, আমরাও উঠে পড়লাম।

বান্নুর থেকে সোমনাথপুরা মাত্র পাঁচ মাইল।

কাবেরী নদীর তীরে ছোট একখানি গ্রাম, তারই প্রান্তে একটি প্রাচীন মন্দির—কেশবস্বামীর মন্দির। হোয়সাল রাজাদের আমলের মন্দির। রাজা তৃতীয় নরসিংহের আমলে প্রতিপত্তিশালী সামন্ত ছিলেন সোমনাথ। রাজ-পরিবারেরই লোক। স্বনামে তিনি এখানে এই জনপদ বসিয়েছিলেন, এখানকার এই মন্দিরও তাঁরই তৈরী। হোয়সাল রাজ্যে তখনকার দিনে জনকাচারীর সমকক্ষ

স্থপতি ও কারুশিল্পী আর কেউ ছিল না। সোমনাথ জনকাচার্যকে দিয়েই কেশবস্বামী-মন্দিরের গঠন পরিকল্পনা ও নক্সার কাজ করিয়েছিলেন।

বাস্ থেকে নেমে কিছুটা গেলেই মন্দির। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। লম্বার ২১০ ফুট, চওড়া ১৭২ ফুট। তোরণ পার হলেই ভিতরে পাঁচিলের পাশ দিয়ে বরাবর ঘর ও বারান্দা চলে গেছে। পর পর চৌষট্টিখানি ঘর। কোন ঘরে মূর্তি আছে, কোন ঘর শূন্য। বারান্দায় পর পর বহু থাম, থামের গায়ে নানা কারুকাজ। বারান্দার ছাদেও ফুলপাতা ও দেবমূর্তির কাজ। সেই ছাদের পানে তাকালে স্বতঃই দিলওয়ারা মন্দিরের বারান্দার কথা মনে পড়ে। দিলওয়ারায় সাদা পাথরের উপর যে কাজ আমরা দেখছি, এখানে কালো পাথরের গায়ে তারই প্রতিচ্ছায়া। তবে এই মন্দির তৈরী হয়েছে অনেক আগে, ১২৬৮ সালে। দিলওয়ারার শিল্পীরা এই মন্দিরটিকেই আদর্শ করেছিলেন কিনা তা আজ গবেষণার ব্যাপার।

প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে কেশবস্বামীর মন্দির। তিনটি চূড়াওয়ালা মন্দির। এই গঠনরীতির নাম 'ত্রিকূটাচল'। ভিতরে তিনটি গর্ভগৃহ। মধ্যে কেশবস্বামীর মূর্তি, উত্তর দিকে জনার্দন, দক্ষিণে বেণুগোপাল। কেশবস্বামী শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। কিন্তু এই মূর্তিটি আধুনিক। পুরানো মূর্তির স্থলে এই নূতন মূর্তি বসানো হয়েছে। পুরানো মূর্তিটি কি হলো, সে কথা জানা গেল না। কাউকে যে জিজ্ঞাসা করবো, তা আমাদের ভাষা তো এখানে কেউ বোঝে না। জনার্দন ও বেণুগোপালের মূর্তি দু'টি প্রাচীন আদি মূর্তি। জনার্দন বিষ্ণুমূর্তি, ছ'ফুট উঁচু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। মুখের চারিপাশে জ্যোতিঃর ছটা, সেই ছটার প্রান্তে চালচিত্রের মত দশ অবতারের মূর্তি। বেণুগোপাল বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তি। ছ' ফুট উঁচু। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন। দু'পাশে গরুর পাল

মুগ্ধ হয়ে বাঁশী শুনছে। শ্রীকৃষ্ণের বদন-মণ্ডলের চারিপাশে জ্যোতিঃর ছটা, এবং সেই ছটার শেষে চালচিত্রের গঠনে পর পর দশ অবতারের মূর্তি। দু'টি মূর্তিরই অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখের কমনীয়তা মন হরণ করে।

তিনটি গর্ভগৃহের দ্বার বহু কারুকার্যখচিত। কেশবস্বামী-মন্দিরের দ্বারের মাথায় বিষ্ণু ও লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি খোদাই করা। জনার্দন-মন্দিরের দ্বারশীর্ষে বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও নরসিংহ-মূর্তি এবং বেণুগোপালের দ্বারে বিষ্ণুমূর্তি চিত্রিত করা আছে। তা ছাড়া প্রতি দ্বারের দু'পাশে কারুকাজ আজে অজস্র।

দেবদর্শন করে আমরা প্রাঙ্গণের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। ত্রিকূটাচলের পর পর তিনটি চূড়া। বত্রিশ ফুট উঁচু। কিন্তু এর কোনখানে এক ইঞ্চি স্থানও ফাঁক নেই,—তবকে তবকে শুধু কারুকাজ। সবার নীচে প্রথম সারিতে চলে গেছে নানাভঙ্গীর সারি সারি হাতী। দ্বিতীয় সারিতে ঘোড়া। তৃতীয় সারিতে নক্‌সার কাজ। চতুর্থ সারিতে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের দৃশ্যাবলী। তার উপরের সারিতে বড় বড় দেবমূর্তি। বেশীর ভাগই বিষ্ণুমূর্তি—বরাহ, নরসিংহ, হয়গ্রাব, বেণুগোপাল, পরবাসুদেব প্রভৃতি। তা ছাড়া শিব, মহিষাসুরমর্দিনী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, ব্রহ্মা, সূর্য, গরুড়, ইন্দ্র প্রভৃতির মূর্তিও আছে। কিছু কিছু সাধারণ নরনারীর মূর্তিও আছে। অজস্র মূর্তির কারুনৈপুণ্য চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কয়েকটি মূর্তির অম্লান ঔজ্জ্বল্য সহজেই নজরে পড়ে। শত শত বছরের জলহাওয়া এখনও তাদের কমনীয়তা ম্লান করতে পারে নি।

মন্দির-গাত্রে এই সব বড় বড় মূর্তির সংখ্যা ১৯৪টি। তার মধ্যে কয়েকটি নতুন মূর্তি চোখে পড়লো। বিষ্ণুর নটরাজ মূর্তি এর আগে আর কোথাও দেখে নি। নৃত্যরতা লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তি চোখে পড়লো। একটি নতুন মূর্তি দেখলাম, চতুর্মুখ,

চারিহস্তের দেবতা বসে আছেন,—হু'হাতে শঙ্খচক্র, আর হু'টি হাত ধ্যানমুদ্রায় কোলের উপর স্থাপিত। আর একটি উপবিষ্ট দেবমূর্তি চোখে পড়লো,—এক হাতে একটি পূর্ণঘট আর এক হাতে একটি ফল। প্রতিটি মূর্তির মধ্যেই অপরূপ কমনীয়তা প্রকাশ পাচ্ছে। ত্রয়োদশ শতকের হিন্দু শিল্পীর অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছে।

কেশবস্বামীর মন্দির হু' ঘণ্টায় দেখে শেষ করার মত নয়। একটা পূরো দিনের দরকার। কিন্তু আমরা তখন বাসের দাস, শেষ বাস্ সাড়ে চারটেয়। কাজেই ত্বরিত দৃষ্টিতে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে হু'ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

বাস্-স্ট্যাণ্ডের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি আর বাস্ এসে পড়লো। পাঁচ-সাত মিনিট দেরী হলে আমরা আর ফিরতে পারতাম না।

ফিরে এলাম বান্নুরে।

বাস্ থেকে নামতেই সেই দিল্লী-প্রবাসী বন্ধুটির সঙ্গে দেখা। হাসিমুখে বললেন—আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি, কেমন দেখলেন ?

বললাম—একি হু'ঘণ্টায় দেখে শেষ করার মত? এ শুধু এক নজরে একটা ধারণা নিয়ে যাওয়া মাত্র—ক্যামেরার স্ন্যাপ্ শট্।

—আপনাদের সময় কম, তা ছাড়া এখানে থাকারও কোন ভাল ব্যবস্থা নেই, সেই জন্য এখানে লোক খুব কম আসে। যারা আসে তারা ওই আপনাদেরই মত হু'-তিন ঘণ্টায় দেখে চলে যেতে বাধ্য হয়। তবে হালিবিদ ও বেলুড়েও আপনারা এই শিল্পকলাই দেখবেন। এই তিনটি মন্দির একই সময়কার, একই লোকের পরিকল্পনা। যে-কোন একটিকে ভাল করে দেখলেই সব দেখা হয়ে যাবে। গঠননৈপুণ্য, শিল্পরীতি সব ক'টিতেই একই রকম, শুধু মূর্তির সংখ্যা কম-বেশী।

বেলুড় ও হালবিদের কথা উঠতেই ভবেশ আলোচনায় মেতে উঠলো।

এদিকে বাস্ আসতে দেরী হচ্ছিল, সুধীন অধৈর্য হয়ে পড়লো। —মহীশূর পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে? রাত আটটার আগে বৃন্দাবন উদ্যানে না গেলে আলোক-সজ্জা দেখা যাবে না।

কিন্তু আমাদের ব্যস্ততার সঙ্গে বাসের সময়ানুবর্তিতার সম্পর্ক কী? পথে যত দেরী করবে তত যাত্রী পাবে, কারণ এইটেই শেষ বাস্। আর বাস্ ছাড়া এখানে দ্বিতীয় যানবাহন কিছু নেই। বাসের প্রতীক্ষায় চানাচুরের ডিস আর কফির পেয়ালা নিয়ে আমরা সময়ক্ষেপের ব্যবস্থা করলাম।

শেষে বাস্ এলো। অনেক দেরীতে এলো। মহীশূর যাবার শেষ বাস্, তিল ধারণের স্থান নেই। বাইরে থেকে যতটা মনে করেছিলাম, ভিতরে তার চেয়েও বেশী ভীড়। কোন মতে পাঁচজনের মত স্থান হলো। গত দশ-পনেরো বছর ধরে কলিকাতায় বাসে-ট্রামে দাঁড়িয়ে থাকাই আমরা অভ্যাস করেছি, কিন্তু এখানকার বাসে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। ছাদটা নীচু, দেহের উপর-অংশটা ঝুলিয়ে রাখতে হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে কাঁধ ও কোমর অসহনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু সোজা হতে গেলেই ছাদে মাথা ঠুকে যায়।

তবে আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, বেশীর ভাগ যাত্রীই গাঁয়ের মানুষ, সহরের মানুষের চেয়ে সরল, সহজ, সদ্‌ব্যবহারী। ক্ষিতীন বাবুকে প্রবীণ দেখে, এক চাষী একটি বস্তার উপর বসেছিল,—তারই একপাশে একটু জায়গা করে দিল। ক্ষিতীন বাবু বসলেন। খানিক পরে ক'জন নেমে গেল, আমরাও কোন মতে বসার মত স্থান পেলাম। কলিকাতা হলে এটুকুও পেতাম না, কোন্ পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে, পিছলে এসে এটুকু কেউ দখল করে বসতো, তার পর আমাদের কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলতো—মছ্‌লিখোর, কেন এসেছ আমাদের দেশে?

মহীশূর এসে পৌছলাম সন্ধ্যা ছ'টার আগেই।

এক মারাঠী ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আলাপ হলো বাস্-স্ট্যাণ্ডে। তিনিও যাবেন বৃন্দাবন-উদ্যানে আলো দেখতে। বললেন,—আমরা বারোজন আছি, আপনারাও আমাদের সঙ্গে আসুন, একখানা বাস্ রিজার্ভ করে নিই। সস্তা হবে, সুবিধাও হবে।

ভবেশ বললো,—একটা হোটেল ঠিক করে মালপত্তরগুলো রেখে যেতে হবে।

ইঞ্জিনয়ার বললেন,—ওসব এখন বাস্-স্ট্যাণ্ডেই থাক, ফিরে এসে একটা হোটেল দেখে নেবেন।

কথাটা মনঃপূত হলো। মারাঠী ভদ্রলোক তখনই বাস্ ঠিক করে ফেললেন। সুন্দর বড় একখানি স্টেট বাস, আমাদের কলিকাতায় যেমন চলে। কথাবার্তা বলে বন্দোবস্ত করতে আমাদের পনেরো মিনিটের বেশী লাগলো না। তবে কথা রইল পথে যাত্রী পেলে শূন্য আসনগুলি তাঁরা পূর্ণ করে নেবেন।

পথে আরো ক'জন যাত্রী উঠলো। ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা বারো মাইল পথ অতিক্রম করে উদ্যানের সামনে এসে নামলাম।

বাগানের বড় বড় গাছের মধ্যে দিয়ে পথ। কিছুটা গেলেই বাঁ দিকে সুরু হলো বিরাট পাঁচিল। ডাইনে বাগান। পথের পাশেই একটি গুমটী-ঘর। ওখানে টিকেট করতে হয়। যেদিন আলো দেয় সেদিন আলো দেখার জন্য দর্শকদের টিকেট কিনতে হয়। আমাদের পানে তাকিয়ে টিকেট-বিক্রেতা বললেন,—আপনারা বাঙালী? সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধি? বাঙালুর থেকে আসছেন?

আমাদের উত্তর শুনে বললেন,—আপনাদের টিকেট লাগবে না। আপনাদের দেখবার জন্যই মহারাজা আজ এখানে এই আলো দেবার বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন, না হলে শনি-রবিবার ছাড়া তো এখানে আলো দেওয়া হয় না। আজ সোমবার। আপনারা এখানে নিমন্ত্রিত।

মহারাজকে ধন্যবাদ জানালাম।

ভদ্রলোক বললেন,—আপনাদের চারখানা বাস্ অনেক আগেই এসেছে। আপনাদের এতো দেরী হলো কেন?

—আমরা সোমনাথপুরায় গিয়েছিলাম।

—আপনারা, বাঙালীরা খুব বেড়াতে ভালবাসেন। বাঙালীরা যত ভ্রমণ করে এমন আর কোন জাত করে না।

—আপনার প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ।

গুমটি-ঘরের পাশ দিয়ে একটি সরু পুল পাঁচিলের ধার দিয়ে নেমে এসেছে বাগানে। পাশের ওই উঁচু পাঁচিলটি এক বিশাল জলাধারের। কৃষ্ণরাজসাগর জলাধার। তিনটি নদী এসে মিলেছে এখানে, তার জল ধরা হয়েছে এই জলাধারে। জলাধারটি একশো ত্রিশ ফুট উঁচু, পৌনে দু' মাইল লম্বা। একটি হ্রদ বলা চলে। এটি তৈরী করেছিলেন মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান বিশ্বেশ্বরায়া। কুড়ি বছর লেগেছিল তৈরী হতে—১৯১১ থেকে ১৯৩১ সাল। খরচ পড়েছিল আড়াই কোটী টাকা। এখানকার এই সঞ্চিত জল সারা বছর ধরে জোগান দেওয়া হয় ষাট মাইল দূরে শিবসমুদ্রম্-এ। শিবসমুদ্রম্-এ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান।

জলাধারের পাশ দিয়ে আমরা নেমে এলাম একটী মনোরম উদ্যানে। হ্যাঁ, বাগান বটে! মহারাজার সখের বাগান। তৈরী করেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণরাজা। বাগানের উপরেই তাঁর প্রাসাদ, আধুনিকতম তিনতলা রাজপ্রাসাদ। মহারাজ কৃষ্ণরাজা এখানে থাকতেন। এখন এটি হয়েছে হোটেল। থাকার খরচ দৈনিক সতেরো টাকা। এখানকার পুষ্পসুরভিত, ঝর্ণা-বাহিত, উপবন-পরিবেশে এই আবাসটী অতি মনোরম। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন আকাশ ও উদ্যানকে কালো করে দিয়েছে। পশ্চিমের শেষ প্রান্তে শুধু আগুনের ছটার মত লাল রঙের দীপ্তি, উদ্যানের অন্তরালে

দিগ্বলয়ের কোলে একটা আগুন লেগেছে বুঝি! সত্যিই, স্বাধীন ভারতে সামন্ত রাজাদের রাজগরিমার যে অবসান ঘটিয়ে গেছেন বল্লভভাই প্যাটেল, তারই ভস্মশেষের দীপ্তি বুঝি ওইটি!

আমরা হোটেলের লনে দাঁড়িয়েছিলাম। এবার আলো জ্বলে উঠলো। লাল, নীল, হলদে, সবুজ রঙীন আলো। অপরূপ শোভাময় হয়ে উঠলো উদ্যানটি। সরু সরু ফালি ফালি জলধারা, পাশে ফুলগাছের সারি, তার পাশে সরু পথ। মাঝে মাঝে এক এক টুকরো কেয়ারী করা বাগান। কৃত্রিম জলপ্রপাত, কোথাও-বা প্রপাতের সামনে একটি সুদৃশ্য তোরণ। কোথাও-বা মুখোমুখি দু'টি ফোয়ারা উৎক্ষিপ্ত জলধারা দিয়ে একটি জলের খিলান তৈরী করেছে, কোথাও চারটি ফোয়ারার জল একটি কেন্দ্রে এসে মিশেছে, কোথাও আবার গোলাকারে সাজানো কয়েকটি ফোয়ারা উৎক্ষিপ্ত জলধারায় একটি গম্বুজ সৃষ্টি করেছে। রঙীন আলোয় এই জল-ধারাগুলিকে রামধনুময় করে তুলেছে। জলধারার মধ্যে পদ্মের মতো ফুটতে থাকে লাল, নীল, হলদে, সবুজ আলো। প্রপাতগুলির উপর রঙীন ফ্ল্যাশ্ লাইট ঝল্সে ওঠে, কখনো সবটুকু এক-খানি ঝকমকে নীলকান্ত মণির মত, কখন একখানি সবুজ মরকত, কখন হলুদ রঙের গলানো সোনার স্রোত, কখন লাল রক্তধারা। ফোয়ারা গুলি ফ্ল্যাশের রঙীন তুবড়ী হয়ে ওঠে। জলের খিলানগুলি রঙে রঙে অপরূপ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে পথের শেষে প্রপাতের সামনে যে খিলানগুলি করা আছে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয়, জাহাজের ডেক থেকে অথৈ নীল চন্দ্রালোকিত সাগরের পানে তাকিয়ে আছি। এ যেন এক রূপকথার রাজ্য! প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পরুচি আর বৈজ্ঞানিক কৌশল একসঙ্গে কি অপরূপ লীলানিকেতন সৃষ্টি করতে পারে মহীশূর-মহারাজা তারই যেন পরীক্ষা করছেন এখানে।

উদ্যানের শেষ প্রান্তে একটি ঝর্ণার পাশে একটী শ্বেতপাথরের

রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আছে। ছোট সাধারণ মূর্তি। উদ্যানের আতিশয্যের সঙ্গে এই মূর্তির গঠন-সারল্য বড় বেমানান। কৃত্রিম আড়ম্বর যেখানে চরমে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, সেখানে শিল্পেরও চরম নৈপুণ্য থাকলেই ভালো মানাতো।

সব শেষে একটী পুষ্করিণী, তার তীরে একটী শিবলিঙ্গ, আর আছে একটি তোরণ। তোরণের শীর্ষে একটি জাতীয় পতাকা। পুষ্করিণীতে কয়েকখানি নৌকাও আছে, চার আনা দিয়ে সেই নৌকায় জলবিহার করা চলে।

ঘুরতে ঘুরতে রাত আটটা বাজলো। ঘুরতে ও দেখতে ভাল লাগছিল। আড়ম্বরের আতিশয্য ও সৌন্দর্যবোধ—এই দুই বিপরীত ভাবনাকে এখানে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। সৌন্দর্যের সাধনা প্রকৃতিকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করার সাধনা, আর আড়ম্বরের রুচি প্রকৃতিকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিলাসের প্রকাশ-ভাবনা। এই দুই মেলানো সহজ নয়। ভারতীয় সাধকেরা একটাকে ছেড়ে দিয়ে আর একটাকে গ্রহণ করেছিলেন, মেলাতে পারেন নি। পশ্চিমের দেশে একটি ধারণাকে পরিপূর্ণ ভাবে স্বীকার করতে গিয়ে মানুষ দুটো বড় বড় বিশ্বযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছে। আড়ম্বরতার মধ্যে অতৃপ্তি, অতৃপ্তি বোধে মনুষ্যত্বের বিনাশ।

রাত আটটা অবধি আলো দেবার ব্যবস্থা। এবার একে একে আলো নিভতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সব রঙীন আলো মিশে গেল কালো ছায়ায়। শুধু পথের সাধারণ আলোগুলি জ্বলতে লাগলো। রঙের উচ্ছ্বাসে যে উল্লাসের দীপ্তি ছিল, ছায়াচ্ছন্ন সমাহিত শান্তি তাকে নিঃশেষে মুছে দিল। এ যেন সারা জগতের একটা সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা অভিনীত হয়ে গেল আমাদের চোখের উপর। জীবনের যত সম্পদ্ ও বিলাস জগৎকে যতই রঙীন করে তুলুক, মোহের সে জমকালো রামধনু একদিন মৃত্যুর কালো ছায়ায় অস্তমিত হবে। তখন আর রং নেই, আলো

নেই, উচ্ছলতা নেই,—শুধু অন্ধকারে নিরবচ্ছিন্ন অবলুপ্তির প্রশান্তি।

হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সাহিত্য-সম্মেলনের সকলেই এসেছেন। দেখা হলো অনেকের সঙ্গেই। প্রেমেনদা এসেছেন দৌহিত্রকে নিয়ে, কুমারেশ বাবু আছেন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে, পূর্ণদা ও নরেন বাবু মিষ্টি আলাপে আসর জমিয়েছেন। উপেন বাবু সিগারেটের ধোঁয়া মিশিয়ে বললেন,—রিয়ালি ওয়াণ্ডারফুল!

প্রেমেনদা বললেন,—নেহাৎ ছেলেমানুষী লাগে, বড় বেশি কৃত্রিম।

আমাদের ছোট দলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এবার সকলে একত্র হয়ে বাসে ফিরলাম। মহীশূরে ফিরে এলাম রাত তখন সাড়ে ন'টা।

ফিরে তো এলাম, কিন্তু রাতে থাকবার জায়গা নিয়ে বাধলো মুস্কিল। চৌমাথার উপর বড় বড় হোটেল, কিন্তু কোনটিতেই স্থান নেই। সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধিরা সব ক'টি হোটেলের সব ঘর দখল করে বসেছেন। সে অঞ্চলে যতগুলি হোটেলের সাইন-বোর্ড চোখে পড়লো, ভবেশ সব ক'টি ঘুরে এলো, কোথাও স্থান নেই। এদিকে রাত সাড়ে দশটা বাজলো। রাস্তা নির্জন হয়ে এলো। মালপত্তর নিয়ে আমরা পথে দাঁড়িয়ে আছি।

সামনের দোকানের একজন চাকর এতক্ষণ আমাদের দুর্গতি দেখছিল, এবার এগিয়ে এসে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বললো,—চলুন, আমি হোটেল দেখে দিচ্ছি।

সত্যই সে আমাদেরকে হোটেলে পৌঁছে দিল। বিরাট চারতলা হোটেল, কিন্তু কোন সাইন-বোর্ড নজরে পড়ে না। দোতলায় ৭৭ নং ঘরে আমরা আশ্রয় পেলাম। আহারের ব্যবস্থা নীচে। এতো

রাত্রে খাবার বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। তা হোক, ঘরখানি ভালো। স্বস্তি পেলাম।

মহীশূর বর্তমান ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রদেশ-রাজ্য। ইতিপূর্বে এটি সামন্ত রাজ্য ছিল। রাজ্যটি পুরাতন, ইতিহাসের পাতায় এই রাজ্যের রাজা হিসাবে অনেকগুলি রাজবংশের নাম পাওয়া যায়। কদম্ব, হোয়সাস, গঙ্গা, চোল, পল্লব প্রভৃতি। মধ্যযুগে প্রসিদ্ধ বিজয়নগর রাজ্য এইখানেই ছিল। তুঙ্গভদ্রার তীরে হাম্পি গ্রামে ন' মাইল জুড়ে বিজয়নগরের ধ্বংস-শেষ এখনও পড়ে আছে। মহা-রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের প্রাসাদ, মন্দির ও কেল্লার ধ্বংসশেষের পাশে আজ একখানি ছোট গ্রাম ছাড়া আর কিছু নেই। সর্বশেষে ওড়েয়ার রাজবংশ এখানে রাজা হন। মাঝে কয়েক বছরের জন্য হায়দার আলি ও টিপু স্থলতান এঁদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। টিপুর মৃত্যুর পর ইংরেজরা আবার সেই পুরানো রাজবংশকেই রাজা করেন। পাঁচ বছরের ছেলে কৃষ্ণরাজ ওড়েয়ারকে ইংরেজরা সিংহাসনে বসান। এই বংশ কয়েকবার দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। আধুনিক মহীশূরের যা-কিছু উন্নতি তা মহারাজ রামরাজেন্দ্র ওড়েয়ারের কীর্তি। তিনিও ছিলেন দত্তক পুত্র। এক কৃষিজীবীর ঘরে তাঁর জন্ম। বর্তমান মহারাজ জয়চামরাজ ওড়েয়ার এখন এখানকার রাজপ্রমুখ অর্থাৎ রাজ্যপাল।

ভারতে বৃহত্তম সামন্ত রাজ্য ছিল হায়দরাবাদ, তার পরেই মহীশূর। ১৯৫৬ সালে এক-ভাষাভাষী জনসমাজ হিসাবে কানাড়ি যাদের মাতৃভাষা তাদের একত্র করে একটি প্রদেশ-রাজ্য গঠন করা হয়। তার ফলে বোম্বাইয়ের কিছু অংশ, হায়দরাবাদের খানিকটা ও কুর্গ যুক্ত হয়ে মহীশূরের সীমানা অনেক বেড়ে যায়। আগেকার মহীশূর রাজ্য ছিল প্রায় তেত্রিশ হাজার বর্গ মাইল, এখন হয়েছে প্রায় পঁচাত্তর হাজার বর্গ মাইল। এখনকার জনসংখ্যা এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ। সমস্ত প্রদেশটাই একটা মালভূমি, সাগর-সমতল

থেকে দু' হাজার ফুট উঁচু। কোথাও-বা সমতল, আবার কোন অঞ্চল পাহাড়-বহুল। কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণা, ভীমা প্রভৃতি ছোট-বড় একান্নটি নদী আছে এই অঞ্চলে, আর তারই সঙ্গে আছে বছরে দু'বার মরশুমী বর্ষা। ফসল উৎপন্ন হয় যথেষ্ট। খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যও উল্লেখযোগ্য—সোনা, লোহা, ম্যাংগানিজ, ম্যাগনেসাইট, কাইনাইট্, কোরাণ্ডাম, পাইরাইট্, এস্‌বেস্‌টস্ প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। এখানকার চন্দনবন ভারত প্রসিদ্ধ। রেশম চাষেরও খ্যাতি আছে। এই সব জড়িয়ে মহীশূর ভারতের একটি সম্পদ্‌সম্পন্ন রাজ্য। বর্ত্তমানে এই রাজ্যটিকে আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। কয়েকটি বড় বড় পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে—ভদ্রা পরিকল্পনা, তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা, হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফ্‌ট, টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রি, ভারত ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহীশূর রাজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় তার আবহাওয়া। মহীশূর চিরবসন্তের দেশ। কোন সময়েই বেশী শীত বা বেশী গরম এখানে দেখা দেয় না। কলিকাতায় যে শীত দেখে আমরা বেরিয়েছিলাম সে ঠাণ্ডা এখানে নেই। পাহাড়ী অঞ্চল, কিন্তু পৌষ মাসের হাওয়ায় হাড় কাঁপে না। সকালে দিব্যি ঠাণ্ডা জলে স্নান করা যায়, আবার দুপুরে রোদে ঘুরলেও ঘাম হয় না। রাতে আবার গায়ে একখানা চাদর ঢাকা না দিলে কেমন-যেন শির্ শির্ করে। সারা বছরই এখানকার বাগানে ফুল ফোটে। মনোরম প্রকৃতি।

সকাল সাতটায় বাস্।

ঘুম থেকে উঠে, স্নান করে, কিছু জলযোগ করে আমরা বাস্-স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছলাম সাড়ে ছ'টার মধ্যে। স্টেট-বাস্, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলে। পঞ্চাশ মাইল পথ পার করে শিবসমুদ্রম্‌এ আমাদের পৌঁছে দিল ন'টার সময়।

শিবসমুদ্রম্ মহীশূরের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র—পাওয়ার

হাউস। কিন্তু বাস্ থেকে যেখানে আমরা নামলাম সেখানে একটি বাগান আর একটি পুষ্করিণী ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লো না। বাগান পার হয়ে আরো কয়েকটি জলাধার ও আপিস-বাড়ী নজরে পড়লো। এবার মাথা-পিছু পনেরো নয়া-পয়সার টিকিট কিনতে হলো। তার পর একটি জলাধারের উপর দিয়ে একটি কাঠের পুল পার হয়ে এসে পড়লাম 'পাওয়ার হাউসের' সামনে। পাওয়ার স্টেশনটি ৬৩০ ফুট নীচে, ঢালু পাহাড়ের গায়ে। ইলেকট্রিক ট্রলি করে নামতে হয়। পাশাপাশি তু'টি লাইনে তু'খানি ট্রলি চলে। মোটা তার দিয়ে বাঁধা। বিদ্যুৎশক্তিতে একখানি ট্রলি যখন উপরে ওঠে, আর-একখানি ট্রলি তখন নীচে নামে। একদিকের তার টানে, আর-এক দিকের তার ছাড়ে,—যেন ওজন দাঁড়ির তু'ঠি পাল্লা। টিকিট দিয়ে আমরা ট্রলিতে উঠে বসলাম। খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এলাম নীচের উপত্যকায়। সামনেই প্রকাণ্ড কারখানা-ঘর। পর পর বারোটি 'জেনারেটার' চলছে। এদের চালাচ্ছে কাবেরীর জলস্রোত। উপরে যে জলাধার দেখেছিলাম, সেখান থেকে তীব্রবেগে জল নেমে আসছে নীচে। সেই জলের চাপে ঘুরছে জেনারেটারের চাকা। তার ফলে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। সেই বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হচ্ছে মহীশূর থেকে কোলারের স্বর্ণখনি পর্যন্ত। মহীশূর এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল, কোলার বিরানব্বই মাইল।

আমরা কারখানায় ঢুকতেই একজন ফোরম্যান একান্ত পরিচিতের মত এগিয়ে এলেন। আমাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন। রবি ও ক্ষিতীন বাবু বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানই তাঁদের জীবিকা। নানা প্রশ্ন তুলে তাঁরা অনেক তথ্য বুঝে নিলেন। ভবেশও তাঁদেরই মত। প্রভাস, সুধীন ও আমি শুধু শুনেই গেলাম, কিছু বুঝলাম, আর বাকিটা বুঝলাম না। ক্ষুদ্র মানুষের বিরাট কীর্তিকে বিস্ময়ে দেখলাম শুধু।

কারখানার বাইরে ফেনিল জলস্রোত। জেনারেটারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অধীর আবেগে নীচে নেমে যাচ্ছে। মানুষের দাসত্ব করার রুদ্ধ অসন্তোষে কাবেরী নদী বুঝি শত-সহস্র ফণিনী হয়ে জেগে উঠতে চাইছে। একটা খড়কুটো পেলেও বুঝি তাকে তখনই আছড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। প্রাকৃতিক শক্তি দমিত হলে কত ভীষণা—কত উদ্দাম হতে পারে এ তারই একটি খণ্ড-প্রকাশ।

শিবসমুদ্রম্ জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রটি তৈরী হতে সুরু হয় ১৯০২ সালে এবং তার শেষ জেনারেটারটি বসানো হয় ১৯৩৮ সালে। এই কারখানাটি সম্পূর্ণ করতে মোটামুটি খরচ পড়েছে এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। ১৯৪৪ সালে এখানে একবার আগুন লেগে ক্ষতি হয়। তার পর থেকে এখানে আগুন নেভানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারখানার সামনে যে বারান্দা আছে সেখান থেকে নীচের উপত্যকা বহু দূর অবধি দেখা যায়। বিক্ষুব্ধ জলধারা তীব্রবেগে নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের পর পাহাড়ের ধাক্কা খেতে খেতে। সেদিকে তাকিয়ে বার বার মনে পড়ে মানুষের বিজ্ঞান কি অসাধ্য সাধন করতে পারে!

দেখা শেষ করে ট্রলি চেপে আমরা উপরে উঠে এলাম। উপরে বাগানের এক প্রান্তে কাবেরী প্রপাত। ছ'শো ফুট উঁচু থেকে কাবেরীর জলধারা নীচে এসে পড়ছে। পাশাপাশি চারটি ধারা। বর্ষার দিনে নাকি ছ'টি ধারা থাকে, শীতে তার বিস্তার বিচ্ছিন্ন হয়ে চারটি হয়ে যায়। ধারা ছ'টির নাম গগন চাক্কি ও বড় চাক্কি। ধারার সামনে মুখোমুখি বসবার জন্য একটা চত্বর আছে। সেই চত্বরের সামনে প্রপাতের বিন্দু বিন্দু জলকণা মেঘ জাগিয়ে রেখেছে সারাক্ষণ। সেই মেঘের গায়ে রামধনুর একটা অস্ফুট আভাস।

চত্বরের পাশ দিয়েই পথ নেমে গেছে নীচে; সেখানে ধারার জল একটা প্রবহমান জলাশয় সৃষ্টি করেছে। ক্ষিতীন বাবু বললেন,—নেমে যাই, স্নান করবো।

নামার মুখেই একখানি সাইনবোর্ড আছে, দেখিয়ে দিলাম।—"নীচে নামবেন না, মৌমাছির উপদ্রব আছে।"

সত্যিই মৌমাছির ঝাঁক উড়ছিল চারিপাশে। মৌমাছি ফুল ভালবাসে জানি, কিন্তু মৌমাছি যে ঝর্ণাও ভালবাসে তা জানতাম না। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে আরো দু'-এক জায়গায় দেখেছি ঝর্ণার ধারে মৌমাছির বাসা ও মৌচাক। অজন্তার সপ্তধারার কথাটাই মনে ওঠে সবার আগে। সেখানেও ঝর্ণার পাশে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় মৌচাক ঝুলছে এক-একটি পাকা আনারসের মত।

আমরা চত্বরে বসে রইলাম। সুধীন ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছিল—কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন্ দৃশ্যটি স্থায়ীভাবে ধরে রাখা যায়। কুট্ কুট্ করে কয়েকটি ফটো তুলে সে বললো—চলুন, এবার ফেরা যাক, খিদে পেয়েছে।

আমরা উঠে পড়লাম। এবার চোখে পড়লো, চত্বরটির নাম দেওয়া হয়েছে—রাজেন্দ্র মঞ্চ। আমাদের রাষ্ট্রপতি কোন এক সময় এখানে এসেছিলেন, তখন এই চত্বরটি তৈরী হয়েছিল।

ফটকের পাশেই একটা সরাইখানা দেখেছিলাম, সেখানে এসে বললাম—ভাত খাব।

উত্তরে তারা কি যে বললো কিছুই বোঝা গেল না। তাদের ভাষা আমরা বুঝিনা, আমাদের কথা তারা বোঝে না,—ইংরেজীও না, হিন্দিও না। শেষে ভবেশকে তারা নিয়ে গেল রান্নাঘরে, সেখানে ভাত আর ডাল ছাড়া আর কিছুই নেই। কাছাকাছি আর কোথাও হোটেল নেই, কাজেই অনাহারে কাটানোর চেয়ে যা পাওয়া যায় তাই ভালো। আমরা বললাম,—ডাল-ভাতই খাব।

টেবিলে বসে গেলাম। চাউল, সম্বরম্ আর পকৌড়ি এলো। সম্বরম্ মশলা বিবর্জিত, বিস্বাদ; পকৌড়ি মাত্র গোটা আষ্টেক। কয়েক গ্রাস খেয়ে আর খাওয়া যায় না। তখন এলো পাঁপড়-ভাজা আর পেঁয়াজ। পাঁপড় আর পেঁয়াজ চিবিয়ে ব্যঞ্জনের অভাব

মেটানো হলো। সব শেষে এলো এক এক গ্লাস ঘোল। ঘোল খাওয়া ও ঘোল খাওয়ানোর যত রহস্যই থাক্, আজকের এই ঘোলটুকু সত্যিই শরীরকে স্নিগ্ধ করলো।

এই আহার্যের দক্ষিণা দিতে হলো দশ আনা করে। আহার যে কত বাহুল্য-বর্জিত হতে পারে তা এখানকার চেয়ে আর কোথাও এত ভাল ভাবে অনুভব করি নি। এই রকম আহার্য পরিবেশনের জন্য সরাইখানার মালিকও বোধ হয় কিছুটা 'কিন্তু' বোধ করছিলেন, দু'-চার কথা বোধ হয় বললেনও সে সম্পর্কে, কিন্তু সে ভাষা তো আমাদের কাছে হিব্রু! খেতে বসে আমাদের কে যেন একটু নুন চেয়েছিল। নুন, লবণ, নিমক্, সল্ট্—কোনো কথাই 'বয়কে' বোঝানো যায় নি। শেষে সে উঠে গিয়ে টেবিলের উপর নুনের বাটি দেখিয়ে দিতে, তবে 'বয়' নুন দেয়। ঘোলের সঙ্গে চিনি চেয়েও সেই একই সমস্যা দেখা দিল। তবে এবার 'বয়'টি বুদ্ধি করে নুন আর চিনির দু'টি বাটিই হাতে করে নিয়ে এলো—কোন্‌টি চাই? রামনাথ বিশ্বাসের ভ্রমণ-কাহিনীর কথা মনে পড়লো। ইউরোপ ও আফ্‌রিকা ভ্রমণকালে বহুবার এই ভাষা সম্পর্কে যে অসুবিধার সামনে তিনি পড়েছিলেন, আমাদের দেশে আমাদেরই ঘরের পাশে যে তার সম্ভাবনা আছে তা বোধ হয় তাঁর জানা ছিল না।

উদ্যানের সামনেই বাস-স্ট্যাণ্ড। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বাস এসে পড়লো। অনেকক্ষণ পরে পরে বাস। ভীড় আছে। তারই মধ্যে আমরা একটু জায়গা করে নিলাম।

মহীশূর এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যার আগেই।

হোটেলে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে, মশলাদার ধোসা ও এক কাপ্ করে কফি পান করে অবার বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যা তখন সমাগত।

এবার আমাদের গন্তব্য চামুণ্ডেশ্বরী-মন্দির। ট্যাক্সি করে যেতে

হবে। স্ট্যাণ্ডে খান দুয়েক ট্যাক্‌সি ছিল, যাওয়া-আসার ভাড়া চাইল—বারো টাকা। ছ'মাইল মাত্র পথ, ভাড়াটা বেশী বলে মনে হলো। অন্য গাড়ী দেখছি, এমন সময় একটি ছোকরা একখানি বড় গাড়ী নিয়ে এলো, বললো,—আমার গাড়ীতে যাবেন? আমার নিজের ট্যাক্‌সি, আট টাকা চাই।

তখনই তার গাড়ীতে উঠে পড়লাম। নতুন ঝক্‌ঝকে বড় গাড়ী, নিঃশব্দে দ্রুত এগিয়ে চললো। সহর ছাড়িয়ে এসে পড়লো ময়দানে। আমাদের গড়ের মাঠের মত ময়দান। পাশে ঘোড়দৌড়ের মত মাঠ, আগাগোড়া কাঁচ দিয়ে ঘেরা মহারাজার ক্লাব, তার পরেই ঠাণ্ডি-সড়ক। আধ মাইলের মত পথ লতাপাতার ছাদ দিয়ে ঘেরা। মনে হয় যেন একটা পুলের উপর দিয়ে চলেছি। দু'পাশে ও মাথার উপর লতাপাতার এমন ঘন সন্নিবেশ যে সে-পথে রোদের প্রবেশ কোন মতেই সম্ভব নয়।

মাঠ পার হয়েই আমরা এসে পড়লাম ললিতা মহলে। রাজ-প্রাসাদ। আমেরিকার হোয়াইট-হাউস-এর ধরণে গম্বুজওয়ালা সাদা বাড়ী। মাথার উপর নীল আলো জ্বলছে। অনেক দূর থেকে সেই আলো দেখা যায়। এখানে আগে বর্তমান মহারাজার কাকা থাকতেন। তিনি ছিলেন নাচ-গানের মস্ত সমঝদার, এখানে তাঁর নাচ-গানের আসর বসতো। নাচের সুবিধার জন্য সভাঘরের মেঝে তিনি স্প্রিং-ফ্লোরের করিয়েছিলেন। বর্তমানে মাননীয় অতিথিরা এলে এখানে তাঁদের থাকতে দেওয়া হয়। আমাদের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী এখানে থেকে গেছেন; তাঁদের থাকার ঘর, খাট-বিছানা দর্শকদের দেখানো হয়। আমরা যখন গেলাম তখন দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। বিকাল পাঁচটার পরে দর্শকদের আর ঢুকতে দেওয়া হয় না। অবশ্য খাট-বিছানা দেখার আগ্রহ আমাদের ছিল না, তবে স্প্রিং-ফ্লোরের কথা ভিন্ন।

গাড়ী এবার পাহাড়ে উঠতে সুরু করলো। চামুণ্ডেশ্বরী শৈল

সমূদ্র-সমতল থেকে ৩৪৩৮ ফুট উঁচু। সিঁড়ি আছে হাজার খানেক, পুণ্যকামী পদাতিকদের সেই পথে যেতে হয়। মোটরের পথ আলাদা, বৃত্তাকারে উঠে গেছে পাহাড়ের উপরে। মধ্যপথে একটি প্রশস্ত চত্বর আছে, সেখান থেকে সমগ্র মহীশূর নগরটিকে দেখা যায়। বোঞ্চ-পাতা, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মনোরম একটি জায়গা। মার্কিন ইন্‌জিনীয়ার ডগলাস সাহেব এই সড়কটি তৈরী করেছিলেন। নীরস পথের মাঝে এইখানে যাত্রীদের জন্য তিনি একটু বিরতির বৈচিত্র্য রেখে গেছেন। তাঁর এই রুচিবোধ এখানে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে 'ডগলাস-সার্কেল' নামে। এখান থেকে রাত্রির আলোকশোভিতা মহীশূর নগরী দীপালীর সমারোহে সমুজ্জল বলে মনে হয়।

আরো কিছুদূর গিয়ে একটি বেদী। বেদীর উপর এক বিরাট নন্দীমূর্তি। নন্দী শিবের ষাঁড়। দক্ষিণ ভারতে শিবমন্দির যেখানে যেখানে আছে সেখানে একটি বড় পাথরের নন্দী থাকবেই। এখানেও মূর্তিটি বিশাল।

তারই কাছাকাছি মহিষাসুরের মূর্তি। বিরাট এক দৈত্য কাঠের কি প্ল্যাস্টারের ঠিক বুঝলাম না। রঙীন বেশভূষা। কলিকাতায় বিয়ের শোভাযাত্রায় কাগজের যেমন রাক্ষস-মূর্তি বেরোয় অনেকটা সেই ধরণের, তবে সৌষ্ঠব আরো শিল্পসম্মত। আগে অসুরের চোখে দু'টি আলো জ্বলতো। একটি ছেলে সেই জ্বলন্ত চোখ দেখে ভয়ে মূর্চ্ছা যায়, সেই থেকে চোখে আর আলো নেই।

সব শেষে পাহাড়ের চূড়ায় চামুণ্ডেশ্বরী-মন্দির।

খানিকটা সমতল জমি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মাঝে মন্দির। এক পাশে দু'-তিনখানি দোকানও আছে। মন্দিরটি বড়। ছ'তলা সু-উচ্চ গোপুরম্ বা তোরণ। গোপুরমের গায়ে অজস্র কারুকাজ। ভিতরে ঢুকেই প্রথমে গণেশমূর্তি, তার পর হনুমানজী; সামনে গরুড়ধ্বজ। তার পর তিনটি আলোকমালা-শোভিত খিলান পার

হয়ে গর্ভগৃহ-মধ্যে দুর্গাপ্রতিমা। পাথরের মূর্তি,—অষ্টভুজা, সিংহবাহিনী। ইনি মহীশূর রাজবংশের কুলদেবী।

এই দেবী-প্রতিমার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনী জড়িয়ে আছে। সে কাহিনী মহিষাসুর বধের কাহিনী।

মহিষাসুরের অনাচারে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের সবাই অস্থির, দেবী চামুণ্ডা প্রস্তুত হলেন তাঁকে সংহার করতে। প্রতি দেবতা নিজ নিজ অস্ত্র তুলে দিলেন চামুণ্ডার হাতে। ত্রিশূল, চক্র, বজ্র প্রভৃতি নিয়ে অষ্টপাণি দেবী মহিষাসুরের সঙ্গে সংগ্রামে মাতলেন। প্রচণ্ড সংগ্রাম-শেষে মহিষাসুর নিহত হলেন। দেবীও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এই পাহাড়ের উপর বসে তিনি বিশ্রাম করলেন। সেই বিশ্রাম-স্থানেই এই মন্দিরটি তৈরী হয়েছে এবং সেই সংগ্রামকে স্মরণীয় করেই এই জনপদের নাম হয়েছে মহীশূর। হয়তো ছিল মহিষাসুর নিধন-পুর, পরে তার সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ হয়ে মহীশূর।

দেবীপূজা উপলক্ষ্যে মহীশূর রাজ্যে দশদিন ধরে মহা-উৎসব হয়। দশেরা। দশেরার দশ দিনের মধ্যে চারটি দিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ক'দিন বাড়ী-বাড়ী শুধু পুতুলের মেলা বসে। এক একখানি ঘরে পুতুল সাজানো হয়। এই পুতুল সাজিয়ে অনেকে আবার নানা দৃশ্য তৈরী করে। গ্রামের দৃশ্য, ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহের দৃশ্য, খেদায় বুনো হাতী ধরার দৃশ্য, জঙ্গলে বাঘ শিকারের দৃশ্য—এমনি নানা দৃশ্য থাকে পুতুল-খেলার মধ্যে।

একদিন যন্ত্রপাতি ও পশুপাখীর পূজা করা হয়। আমাদের বিশ্বকর্মা পূজার মত এই দিন কারিগরেরা তাদের যন্ত্রপাতির পূজা করে, চাষী তার গরু-লাঙ্গলের পূজা করে, গাড়োয়ান তার গাড়ী-ঘোড়াকে অর্ঘ্য দেয়। বাড়ীর পোষা পশুপাখীকেও এইদিন পূজা করা হয়। এইদিনকার পূজায় আবার বলি দেবারও রীতিও আছে, তবে সে কুমড়ো বলি।

আর একদিন বই-পূজা হয়। রামায়ণ মহাভারত গীতা প্রভৃতি

ধর্মগ্রন্থ সাজিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সেইগুলি পূজা করে। গ্রন্থকে বাগ্‌-দেবীর প্রতাক বলে ধরা হয়।

নবরাত্রির উৎসব-শেষে আসে বিজয়া দশমী। সেদিন ঘরে-ঘরে দীপালীর মত আলোকসজ্জা হয়। রাতে বাজী পোড়ানো হয়। এক বিরাট শোভাযাত্রা বেরোয়। মহারাজা ও প্রধানেরা হাতী-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সেই জৌলুষে বেরোন। রাজ্যের যত ছেলে-বুড়ো সবাই সেজেগুজে পথে বেরোয়।

মহাশূরের এই দশেরা উৎসব ভারতবিখ্যাত। এই উৎসবের বিশেষত্ব শুধু দেবতার পূজাই নয়, প্রকৃতি ও পরিবেশকে মহাশক্তির অংশ বলে শ্রদ্ধা জানানো। পুতুল-খেলা দিয়ে স্থরু করে জীবিকার যন্ত্রপাতি, আত্মরক্ষার হাতিয়ার, মনোবিকাশের উপকরণ গ্রন্থ—জীবনের সব উপকরণকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়, আর তারই সঙ্গে মানুষের সহচর পশুপাখী, গরু-ঘোড়াকেও বৃহত্তর জীবনধারার অংশীদার বলে গণ্য করা হয়। দেবত্বের এই সর্বব্যাপক উপলব্ধি হিন্দু চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শীতের রাত। আমরা ক'জন ঠাসাঠাসি করে বসে আছি ট্যাক্সির মধ্যে। পাহাড়ের মাথায় দম্‌কা হওয়ায় হঠাৎ যেন শীতের বিশেষ প্রাচুর্ভাব বলে মনে হলো। ইতিপূর্বে শীতকে এ রাজ্যে এমন ভাবে টের পাই নি। সামনেই চামুণ্ডা-মন্দির। আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। তোরণে ফুল আর মালা বিক্রী হচ্ছিল, আমরা সবাই এক একটি মালা নিয়ে পুরোহিতের হাতে দিলাম। তিনি দেবীর গলায় পরিয়ে দিলেন। তার পরেই স্থরু হলো সন্ধ্যারতি। পঞ্চপ্রদীপের শিখায় আরতি শেষ হতে দেরী হলো না। দীপশিখার স্পর্শ নিয়ে, চরণামৃত পান করে আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম।

ফেরার পথে মোটরে আসতে আসতে আলাপ হলো ড্রাইভার-

টির সঙ্গে। মুসলমান, ভাল উর্দু বলে, নাম মহম্মদ গায়েব। হেসে বলে,—গায়েব মানে ভাববেন না যে আমি তস্কর, যা পাই গায়েব করি। কাবেরী-প্রপাতের পাশে একটি ছোট গ্রাম আছে, সেখানে এক ফকিরের নামে একটা দরগা আছে—মরদানা গায়েব। ছেলেবেলায় বড় অসুখ-বিসুখে ভুগতাম, মা তাই মানত্ করেছিলেন দরগায় মাথার চুল দেবেন। অনেক দিন পর্যন্ত মেয়েদের মত আমার মাথায় চুল ছিল, তবে সেই মানসিকের পর অসুখ-বিসুখ আর হয় নি। বড় হয়ে সেই চুল আমি দরগায় দিই। দরগার সেই ফকিরের নামে মা আমার নাম রেখেছিলেন মহম্মদ গায়েব। পরে অনেকে বলেছে ওই গায়েব কথাটা নামের সঙ্গে রেখো না, নানাজন নানা কথা ভাব্বে। কিন্তু মায়ের রাখা নাম আমি বদলাই নি। মা ভগবানে বিশ্বাস করতেন, ওই নামটির সঙ্গে সেই বিশ্বাস মিশিয়ে আছে।

তার কথা শুনে মনে হলো এ তো মহীশূরের কোন মোটর-ড্রাইভারের কথা নয়, এ যে কলিকাতার কাছাকাছি কোন হিন্দুঘরের ছেলের কথা। ছেলেবেলায় ৺তারকেশ্বরের কাছে চুল মানসিক ছিল, মা নাম রেখেছেন—তারকনাথ। কত নির্মল, উৎপল, দীপক, তরুণকুমার তাকে নাম বদলাতে বলেছে, কিন্তু পুরানো তারকনাথ সে ছাড়ে নি, ছাড়তে পারে নি।

গায়েব বলে,—বাবুজী, গরীবের ছেলে, জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি। লেখাপড়া ভাল শিখতে পাই নি। তবে মোটর গাড়ীর সব কাজ আমি জানি, সেইজন্য দু'টি অন্ন আমার ঠিকই জোটে। কোনও ড্রাইভারের সঙ্গে আমি মিশি না। ওরা মদ খায়, জুয়া খেলে। আমার রোজগারের টাকা ওভাবে খরচ করলে তো আমার চলবে না। দু'টো ছেলে আছে, তাদের ইস্কুলে পড়াচ্ছি। ওদেরকে ড্রাইভার হতে দেব না, ড্রাইভারের জীবন বড় দুঃখের বাবুজী! এই দুঃখ ভোলার জন্য মাঝে মাঝে সিনেমা দেখি, মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে, আবার কাজে লেগে যাই।

সহসা গায়েব একটা কঠিন প্রশ্ন তোলে আমাদের কাছে, বলে, —আচ্ছা বাবুজী, এই যে সব ছবিতে দেখি গরীবের ভাল হয়, গরীব পরে সুখী হয়, এ কি সত্যি বাবুজী? চারিপাশে যা দেখি তাতে তো তা বিশ্বাস হয় না। দেশ স্বাধীন হবার আগে বড়-বড় নেতাদের কত ভাল-ভাল কথা শুনেছি, আজাদী তো হলো বাবুজী- কিন্তু আমাদের দুঃখ তো গেল না! যাদেরকে দেখতাম সাধারণ মানুষ, তারা এখন অনেক বড়-বড় গদী পেয়েছে, আমাদের কথা ভুলে গেছে। তখন যারা আমাকে চিনতো এখন আর তারা চিনতে পারে না। আচ্ছা বাবুজী, সত্যি কি আমাদের অবস্থা ভাল হবে কোন দিন? আপনারা তো অনেক লেখাপড়া শিখেছেন বাবুজী, আপনারা বলুন তো?

এ প্রশ্ন সারা ভারতের দরিদ্র সাধারণের প্রশ্ন। যত দিন যায় এই কথাটা তত বড় হয়ে দেখা দেয়। সাড়ে সাত শো বছরের পরাধীন জাতি স্বাধানতা পাবার পর এ কি হলো? গান্ধীজীর 'ধ্যানের ভারত' আসবে কবে? হয়তো-বা মহাত্মাজীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে স্বপ্নও অস্তমিত হয়েছে, অবার আর-এক মহামানবের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। স্বার্থবাদী, বিবেকহীন, মনুষ্যত্ববর্জিত অচলায়তনকে নাড়াতে হলে গিরি-গোবর্ধন ধারণে সক্ষম গিরিধারীকে চাই। অবতার ছাড়া এই অনড় জাতিকে কেউ নড়াতে পারবে না। সে-মানুষ কতদিনে আসবে কে জানে!

হতাশার মেঘ দিয়ে আশার আকাশকে ঢেকে দিতে ইচ্ছে করে না। বলি,—হবে হবে, ভাল দিন আসবে। পরাধীন থাকার সময় অনেক পাপ জমে ছিল, সে সব মুছে দিতে সময় লাগবে তো!

গায়ের বলে,—আগেকার চেয়ে পাপ তো এখন অনেক বেশী দেখি বাবুজী! যারা মিথ্যেবাদী, যারা জুয়াচোর—তারা এখন বেশ সুখে আছে বাবুজী! আগে তাদের একটা ভয় ছিল, এখন তা-ও নেই।

সত্য দিনের আলোর মত প্রকাশ পায়, কথা দিয়ে তাকে ঢাকা দেওয়া যায় না। চুপ করে থাকি।

গাড়ী এসে পড়লো সহরের চৌমাথায়। হোটেলের সামনে যখন নামলাম রাত তখন ন'টা।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো—নিরামিষ খাব না, মাংস-ভাত খাব। কিন্তু নিরামিষের রাজ্যে মাংস পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। আমার আর ঘোরাঘুরি করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু 'সৎসঙ্গে কাশীবাস' করতেই হবে। ঘুরতে ঘুরতে এক সাইনবোর্ড নজরে পড়লো—মিলিটারী হোটেল,—মাংস, ডিম, চপ, কাটলেট ইত্যাদি পাওয়া যায়। দোতলায় হোটেল,—সিঁড়ি দিয়ে সবাই উপরে উঠে গেলাম। কিন্তু ভিতরে গিয়ে যাদের খেতে দেখলাম, তাদের কাউকে দেখে শ্রদ্ধার উদ্রেক হ'ল না। এমন কি অনেককে ভদ্রলোক বলেও মনে হলো না। তবু বসলাম। মাংস-ভাত এলো। কিন্তু সেই মাংসের চেহারা দেখে কারো মুখে আর গ্রাস উঠলো না। কেউ অর্ধভুক্ত, কেউ বা অভুক্ত থেকেই উঠে পড়লাম। মাংস খাওয়ার সখ মিটলো। ফেরার পথে বাজার থেকে এক ছড়া কলা নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। দু'টো করে কলা, আর হোটেল থেকে এক-এক বাটি দই খেয়ে যে যার শুয়ে পড়লাম। রাত তখন প্রায় এগারোটা।

পরদিন ঠাসা প্রোগ্রাম।

প্রথমেই শিল্পপ্রদর্শনী। সহরের উপকণ্ঠে একখানি বড় দোতলা বাড়ীর আগাগোড়া নানা শিল্প-সম্ভারে সাজানো। মহীশূরের জিনিষই বেশী, তবে অন্য রাজ্যের জিনিষও আছে। সৌখীন শাড়ী, জামার ছিট, কাপড়, ফুলতোলা মাদুর, আলপনা-আঁকা পাত্র, ছবি-আঁকা থালা, নানা জাতের পাথর, খনিজ দ্রব্য, কিছু কিছু রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ও খেলার পুতুল সুন্দরভাবে সাজানো আছে। কোলার

স্বর্ণখনির একটা মডেল সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভবেশ কুটীর-শিল্পের একজন সংগঠক, দেখতে দেখতে সহসা সে প্রশ্ন তুললো,—এর পরেও এই সব শিল্পের অনেক উৎকর্ষ হয়েছে, সে সবও তো থাকা দরকার ছিল। এমন স্থন্দর একটা প্রদর্শনীতে পর পর ক্রমোন্নতির ধারা দেখানো দরকার, সাধারণ দর্শকদের তাতে বোঝার স্থবিধা হয়, শিল্পীরা উৎসাহ পায়।

যাঁকে কথাটা বলা হলো তিনি প্রদর্শনীর কর্মকর্তাদেরই একজন। তিনি হেসে বললেন,—আমরা সবই জানি, কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। যাঁরা কর্তা তাঁদের এদিকে কোন আগ্রহ নেই। কি হচ্ছে এবং কি হতে পারে তা একবার দেখতেও তাঁরা আসেন না। একে আরো ভাল করতে হলে যে টাকার দরকার তা খরচ করার অধিকার তো একমাত্র তাঁদেরই আছে। আমরা কি করতে পারি? মুখ বুঁজে চাকরি বজায় রেখে যাই।

এর পর আর বলার কিছু থাকে না। কোন সর্বাত্মক বিপ্লব বা ওলোট-পালোট করে স্বাধীনতা আমরা পাই নি। 'যেমন আছে তেমনি রাখবো'—বলে হাত পেতে স্বাধীনতা ভিক্ষা নিয়েছি। পুরানো ধারা তাই বদলায় নি। খদ্দর ও গান্ধী-টুপির চারিপাশে তাই আজ বিলিতি স্থুট আর টাইয়ের ছড়াছড়ি। উপরের তলায় মানুষ বদলায় নি, মনও বদলায় নি। বারো বছরেও স্বাধীনতার স্বাদ এরা নীচের স্তরে পৌঁছে দেয় নি, পৌঁছে দিতে চায় নি। সবার উপরে গান্ধী-টুপি শোভা পাচ্ছে সত্যি, কিন্তু গান্ধী-ভাব মাঝের এই 'কালো-সাহেবী' স্তর ছাপিয়ে নীচে নেমে আসতে অবিরাম ঠোক্কর খাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক নবভারত গঠনে এইটিই আজ বৃহত্তম সমস্যা। এর সমাধান করার মত ব্যক্তিত্ব আজ এ-দেশে নেই।

মহীশূরের 'আর্ট ও ক্র্যাফ্‌ট মিউজিয়ম'। সে-ও এক প্রকাণ্ড বাড়ী। এখানকার কুটিরশিল্পের সব-কিছু এখানে সাজানো আছে খেলা-পুতুল, ফুলদানী, বাসন, চেয়ার-টেবিল, আলমারী,

কাঠের মূর্তি, সব-কিছুতেই দাম লেখা আছে। পছন্দ হয় তো কিনে নিন।

সেখান থেকে বাসে চড়ে গেলাম রেশমের কারখানায়। মস্ত বাগান। বাগানের পাশেই কারখানা। এই কারখানায় তুঁতের চাষ হয়। তুঁতে-পাতা রেশমকীটের প্রধান খাদ্য। চারটি বড় বড় ঘর নিয়ে কারখানা। সেখানে গুটি থেকে রেশম বের করা হয়। সুতো কাটা হয়, রং করা হয় এবং তাঁতে কাপড় বোনা হয়। কল চলে বিদ্যুৎশক্তিতে, কারিগররা শুধু সজাগ থেকে কল চালিয়ে নেয়।

তাঁতঘরটি আমাদের ভাল লাগলো। নানা ধরণের নক্সার পাড় তোলা হচ্ছে। তাঁতীরা আমাদের অনেক-কিছু বুনন-কৌশল হাতে-কলমে দেখিয়ে, বুঝিয়ে দিলে। তাদের ভাষা না বুঝলেও কাজ দেখে বুঝলাম। আমরা বাইরের লোক, আমাদের দেখাবার জন্য কাজের ক্ষতি হতে পারে—এ ভাব তাদের মধ্যে দেখলাম না। আমাদেরকে হাতের কাজ দেখিয়ে তারা যেন খুসি হলো বলে মনে হলো। তাদের এই সৌজন্য আমাদেরও খুসি করলো।

সেখান থেকে চন্দন-শিল্প কেন্দ্র। ভারতে চন্দন-শিল্পের এইটাই বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। মহীশূরে চন্দন-গাছ জন্মে প্রচুর। ফ্যাক্টরিটিও মস্ত বড়। কিন্তু সে অনুপাতে লোকজন চোখে পড়লো না। কয়েকখানি টিনের শেডের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ হচ্ছে। সবই চন্দন কাঠ নিয়ে ব্যাপার। এক জায়গায় প্রচুর চন্দন কাঠ। আর এক জায়গায় বিদ্যুৎচালিত কুড়ুল দিয়ে বড় বড় কাঠগুলিকে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে, তার পর বিদ্যুৎচালিত করাতে টুকরোগুলিকে আরও ছোট করা হচ্ছে, শেষে বিদ্যুৎ-যাঁতায় সেই টুকরো গুঁড়ো হয়ে বেরিয়ে আসছে। তখন সেই গুঁড়োর সঙ্গে জল মিশিয়ে ফুটিয়ে সেই বাষ্পের সাহায্যে তা থেকে চন্দন-তেল বের করা হচ্ছে। চন্দন-তেল এসেন্স তৈরী করার পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। দুষ্ট ক্ষতে এই তেলের প্রলেপ দিলে দ্রুত আরোগ্য

হয়। এখানে নানা আকারে শিশি ও জারে ভরে তেল বিক্রী হয়। দেশবিদেশে চালানও যায়। চন্দন কাঠ ও চন্দনের গুঁড়োও এখানে প্যাকেটে ভরে বিক্রী করা হয়। সরকারী ছাপমারা খাঁটি জিনিস, সঠিক ওজন ও নির্দিষ্ট দাম। সমস্ত কারখানাটি চন্দনের গন্ধে ম' ম' করছে। বেরিয়ে আসার পরেও অনেকক্ষণ সেই গন্ধ যেন গায়ে থেকে যায়।

সেখান থেকে ফিরতে বেলা প্রায় একটা বাজলো। আহার ও ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

এবার জগমোহন প্রাসাদ। এই প্রাসাদে আগে মহীশূরের রাজারা থাকতেন। এখন তাঁরা থাকেন নতুন প্রাসাদে। এ বাড়ীতে ছুটি-মহল। পিছনের মহলে রাজকীয় চিত্রশালা। সাধারণের জন্য এই চিত্রশালা উন্মুক্ত, তবে মাথাপিছু তিন আনার টিকিট লাগে।

চিত্রশালা খোলে তিনটের সময়। তিনটার আগেই আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম।

তিনতলা বিরাট রাজ-অট্টালিকা। বহু শিল্পীর রং ও রুচি ধরা আছে এইখানে। শুধু কল্পনার বৈচিত্র্যই নয়, ঐতিহাসিক চিত্রও আছে, আর আছে নানা সখের জিনিস ও শিল্পসম্ভার। প্রথমেই চোখে পড়ে রাজবংশের বড় বড় প্রতিকৃতি ও দরবার-দৃশ্য। সেগুলি দেখার জন্য দর্শকদের ঔৎসুক্য থাক্ বা না থাক্, রাজকীয় শিল্পশালায় এ জিনিষ থাকবেই। আমাদের প্রথমেই আকর্ষণ করলো রবি বর্মার ছবিগুলি। আমাদের দেশে পৌরাণিক ছবি এঁকে যাঁরা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন রবি বর্মা তাঁদের মধ্যে প্রথম শিল্পী এবং পথিকৃৎ। একখানি বড় ঘরে তাঁর আঁকা কয়েকখানি ছবি টাঙানো আছে—জটায়ু বধ, সীতা ও সরমা, রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন, হরিশ্চন্দ্র, মৎস্যকন্যা ও শান্তনু, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি। ছবিগুলি যেন জীবন্ত বলে মনে হয়। তার পর সর্বভারতীয় শিল্পীদের আঁকা নানা ছবি। তার মধ্যে বাঙালী নামকরা শিল্পীরাও আছেন—গগনেন্দ্রনাথ

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদা উকিল, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকের ছবি আছে। বহু ধরণের, বহু রীতির ছবি। জাপানী শিল্পীর কাগজের টুকরো দিয়ে তৈরী ছবি, চন্দন কাঠের উপর সূক্ষ্ম খোদাই-করা ছবি, সোনা ও রূপার প্লেটের উপর অপূর্ব কারুকাজ-করা দেবীমূর্তি, হাতীর দাঁতের শিল্পকাজ,—সুদৃশ্য ও দর্শনীয় অনেক-কিছুই সংগ্রহ করা আছে এখানে। তিনতলার একখানি ঘরে মহারাজার সংগৃহীত নানা ধরণের বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহ আছে। নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল-তলোয়ারও সাজানো আছে। মাত্র দু'ঘণ্টা সময়—তিনটে থেকে পাঁচটা—তার মধ্যে সব-কিছু দেখে শেষ করা যায় না, চোখ বুলিয়ে একটা ভাসা-ভাসা ধারণা নিয়ে যাওয়া শুধু।

দেখতে দেখতে একটা কথাই শুধু মনে হলো, ভারতের শিল্প ও সাহিত্যে বাঙালীর দান তো কম নয়! তবু বাংলাদেশের রাজধানী কলিকাতাতে এই ধরণের একটা স্থায়ী চিত্রশালা ও একটা সুন্দর বড় শিল্পাগার নেই কেন? আমাদের আজকালকার নেতারা অনেক বড় বড় বক্তৃতা, ভালো ভালো কথা, সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেন, কিন্তু স্বাধীনতা পাবার বারো-বছরের মধ্যে বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতিকে জনগণের সামনে ধরে দেবার জন্য স্থায়ী কি করেছেন? কলিকাতা সহরের কোথায় গেলে বাংলার শিল্পের ধারাবাহিক পরিচয় পাব? জাতিগতভাবে বাঙালীর এইদিকে সজাগ হবার সময় কি এখনও হয় নি। সরকারী ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল্ মিউজিয়াম্ একটা আছে বটে, কিন্তু এ ধরণের জিনিষ কোথায় সেখানে?

তিনতলা থেকে যখন নেমে এলাম তখন পাঁচটা বাজতে আর দেরী নাই। এমন সময় ফট্ ফট্ করে একখানি মোটর সাইকেল এসে পড়লো, তার পিছনেই একখানি সুদৃশ্য টুরিস্ট-বাস্। বাস্ থেকে নামলেন দালাই লামা ও তাঁর সঙ্গী আরো ক'জন লামা। অত বড় আন্তর্জাতিক মানুষটির সঙ্গে মাত্র একজন মোটর-বাইকী

সার্জেন্ট দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। আমরা কলিকাতার মানুষ, সব ব্যাপারেই পুলিশের বাড়াবাড়ি দেখতে আমরা অভ্যস্ত। আমাদের রাজ্যের কর্ণধাররা কোন সময়েই আমাদের শান্তিপ্রিয়তা ও সৌজন্যবোধের উপর আস্থা রাখতে পারেন না। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য !

বিনা আড়ম্বরে আমাদের পাশ দিয়ে দালাই লামা চিত্রশালায় প্রবেশ করলেন। এতো কাছাকাছি এমন ভাবে দেখবার সুযোগ কখনো হয় নি। আমরা সবাই ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম মানুষটিকে। এই মানুষটি ঈশ্বরের প্রতিভূ ভেবে বিস্ময় লাগলো। ষড়ৈশ্বর্যবান্ ঈশ্বরের এই সাধারণ প্রতিভূর পানে তাকিয়ে ভগবানের উপরেও করুণা জাগলো।

দালাই লামার কথা উঠলেই তিব্বতের কথা ওঠে।

চীন ও ভারতের মাঝে একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল তিব্বত। ফ্রান্সের দ্বিগুণ এর আকার, কিন্তু হিমালয়ের তুষার-ঢাকা অঞ্চল বলে এর বাসিন্দার সংখ্যা খুব বেশী নয়, মাত্র পনেরো লাখের মত। তিব্বতীদের মধ্যে লামা বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সংখ্যা খুব বেশী। গড়ে প্রতি পাঁচজনে একজন লামা। সবার উপরে দালাই লামা, তিনিই আসলে এখানকার রাজা। সেই দিক থেকে তিব্বতকে পৃথিবীর একমাত্র ধর্মরাজ্য বলা চলে। (পোপের রাজ্যের গণ্ডী এর তুলনায় কিছুই নয়।)

দালাই লামা! দালাই কথাটির মানে হলো জ্ঞানসমুদ্র, আর লামার অর্থ গুরু। তিব্বতের রাজধানী লাসায় বিরাট প্রাসাদ 'পোতালা'য় ইনি থাকেন। তিব্বতীদের বিশ্বাস যে দালাই লামার মৃত্যু নেই, একটা দেহ জীর্ণ হলে দালাই লামার আত্মা সেই দেহ ত্যাগ করে নবকলেবর ধারণ করে। সেইজন্য এক দালাই লামার মৃত্যু হলে, নবদেহধারী দালাই লামার সন্ধান করা হয়। এখনকার যিনি দালাই লামা তাঁর পূর্ববর্তী দালাই লামার মৃত্যুহয় ১৯৩৩ সালে।

নবকলেবরে দালাই লামা আবার কোথা জন্মালেন, তিব্বতীরা তার সন্ধান করতে থাকে। পবিত্র 'চুকোরগাই' হ্রদের তীরে এসে সব লামারা সমবেত হন, এই হ্রদের জলে নাকি ভাবীকালের ছায়া দেখা যায়। সেই জলে দেখা গেল, এক সোনার চূড়োওয়ালা বৌদ্ধ মন্দির, তার পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ, সেই পথের পাশে এক চাষীর বাড়ী, সেখানে জন্মেছেন নতুন দালাই লামা। কিন্তু কোথায় সেই মন্দির আর কোথায় সে-বাড়ী কি করে জানা যাবে ?

লামারা জপতপ ও সাধনায় নিমগ্ন হলেন। শেষে লাসার প্রাচীনতম তিব্বতী মন্দিরের প্রবীণতম লামা একদিন ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন, ভাবের অবস্থায় তিনি নির্দেশ দিলেন—সিংহাই অঞ্চলে সন্ধান করতে হবে। সন্ধানীরা বেরিয়ে পড়লো। চীন দেশের সিংহাই অঞ্চলে অনেক তিব্বতীর বাস। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধানীরা চুকোরগাই হ্রদের জলে দেখা মন্দিরটি খুঁজে পেলেন, দেখতে পেলেন সেই আঁকাবাঁকা পথ আর সেই চাষীর বাড়ী। বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছতেই একটি দু' বছরের ছেলে ছুটে এসে তাঁদের সামনে দাঁড়ালো। দলে ছিল মৃত দালাই লামার ক'জন অন্তরঙ্গ অনুচর, ছেলেটি তাঁদেরকে নাম ধরে ডাকলো। সবাই তখন ছেলেটিকে নানা প্রশ্ন করলো, নানা ভাবে পরীক্ষা করলো। ছেলেটি এমন অনেক কথা বলে গেল যা সেই দালাই লামার কথা। দু' বছরের জাতিস্মর ছেলে। ছেলেটিকে তিব্বতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হলো। সিংহাইয়ের চীনা শাসক খবর পেয়ে বললেন— আমার প্রজাকে আমি ছাড়বো না, টাকা দিতে হবে।

লামারা দু' কোটি সাত লাখ টাকা দিয়ে অনুমতি নিলেন, এবং দু' বছরের সেই ছেলেটিকে নিয়ে এলেন তিব্বতে। ছেলেটির নাম লামো ধংতুপ। পোতালা প্রাসাদ হলো তাঁর বাসগৃহ। সুরু হলো শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান শিক্ষা। চৌদ্দ বছর বয়সেই পাঠ শেষ হলো। লাসার বিখ্যাত দু'টি বিহার ড্রিপুঙ ও সেরা, সেখানে

থাকেন দু'জন প্রবীণতম স্থবির। তাঁরা পরীক্ষা করলেন, ধর্মের যত দুরূহ প্রশ্ন ছেলেটি স্বচ্ছন্দে সমাধান করে দিল। এবার সুরু হলো পাশ্চাত্য শিক্ষা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান্ পণ্ডিত হেন্‌রিক হারের ভারতে বন্দী ছিলেন। বন্দীশালা থেকে তিনি পালিয়ে যান তিব্বতে। তাঁরই উপর ভার পড়লো নতুন দালাই লামাকে লেখাপড়া শেখানোর।

ইতিপূর্বে ১৯৪০ সালে লামো ধংড়ুপকে দালাই লামা বলে ঘোষণা করা হয়ে গেছে। ইনি হলেন চতুর্দশ দালাই লামা। লামোর বয়স তখন মাত্র চার বছর। অবশ্য তিব্বত নিয়ে তখন কেউ বেশী মাথা ঘামাতো না। প্রতিবেশী চীন দেশের রাষ্ট্রপতি তখন চিয়াং কাই সেক। দেশে ধনিকদের স্বার্থ বজায় রাখতে ও কম্যুনিষ্টদের ধ্বংস করতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তার উপর বিদেশী শত্রু জাপানীরা মংগোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া দখল করে সমগ্র চীন দখল করার জন্য উদ্যোগ করছিল। বরফের রাজ্য তিব্বতে কে দালাই লামা হলো তা নিয়ে চিন্তা করার সময় চিয়াংয়ের ছিল না।

তিব্বতীরা নিজের দেশে নিজেরা সুখেই ছিল, কিন্তু বিপদ ঘটলো চিয়াং কাই সেকের পতনের পরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলো, কম্যুনিষ্টরা চীন দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলো, চিয়াং কাই সেক ফরমোজায় পালিয়ে গেলেন। নতুন চানা সরকার প্রথমেই বললো—বৈদেশিক ব্যাপারে তিব্বতীদের কোন অধিকার নেই, সে-বিষয়ে চীনকে উপরওয়ালা বলে তাদের মানতে হবে।

দালাই লামার বয়স তখন মাত্র ষোল বছর। কোন হাঙ্গামায় না গিয়ে তিনি সেই কথা মেনে নিলেন।

কম্যুনিষ্টরা বললো—তিব্বতে ইস্কুল চাই, রাস্তাঘাট চাই, হাসপাতাল চাই, সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য ছোট ছোট কলকারখানা চাই।

দালাই লামা তিন হাজার তিব্বতী ছাত্রকে পাঠালেন চীনাদের

ইস্কুলে পড়াশুনা করতে। তিনি নিজেও গেলেন। ছ'মাস ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলেন নতুন রাষ্ট্রনায়ক মাও-সে-তুং নতুন চীন গড়ছেন কেমন করে।

এবার চীনদেশ থেকে কারিগর এলো। ছোট ছোট কলকারখানা গড়ে উঠলো। চীন থেকে লাসা অবধি মোটর চলাচলের পথ হলো। সমস্ত উর্বর জমি একত্র করে সমবায়-কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্তন হলো।

এই সমবায় নিয়েই বাধলো গোলযোগ। এক একটি মঠের ছিল এক একটি জমিদারী। সেই জমিদারী খুইয়ে মঠের সন্ন্যাসীরা অসন্তুষ্ট হলো। যাযাবর 'খাম্বারা' উর্বর ঘাসজমি ক্ষেতখামার হয়ে যাচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন হলো। শেষ অবধি সবাই প্রতিবাদ জানালো বন্দুকের গুলিতে। চীনারা তার জবাবে পাঠালো বোমারু প্লেন। কিন্তু খাম্বারা সহজে ভয় পাবার মানুষ নয়। দীর্ঘ ছ' ফুট দেহ, কোমরে ছ' হাত লম্বা তলোয়ার ও কাঁধে রাইফেল। চার বছর ধরে গেরিলা যুদ্ধে তারা চীনাদের নাজেহাল করে দিল। চীনা সরকার দালাই লামাকে বললো—সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করুন।

কিন্তু তিব্বতী প্রজাদের বিরুদ্ধে তিব্বতী ফৌজ পাঠাতে দালাই লামা রাজী হলেন না। খাম্বা-সর্দারের কাছে তিনি দূত পাঠালেন, বললেন—রক্তপাত বন্ধ কর।

চীনা-সরকার কিন্তু খুসি হলো না, বলে পাঠালো—লাসায় চীনাদের প্রধান কার্যালয়ে দালাই লামা এসে দেখা করবেন, এবং তিনি আসবেন একক।

তিব্বতী সন্ন্যাসীরা এই আদেশ শুনে বিস্মিত হলো।—বৌদ্ধ জগতের মহিমান্বিত ধর্মগুরু একা যাবেন চীনাদের সঙ্গে দেখা করতে? এ তো অপমান! এ কখনোই সম্ভব নয়। তারা এবার তৈরী হলো দেশ থেকে চীনাদের মেরে তাড়াবার জন্য। গোপনে অস্ত্রশস্ত্র এসে পড়লো। কি ভাবে কোন্ দেশ থেকে এলো, কে

জানে! সেই অস্ত্র নিয়ে তিব্বতীরা চীনাদের উপর চড়াও হলো। লড়াই বেধে গেল—চীনা বনাম তিব্বতী। তিব্বতীরা চিরদিন ধর্মকর্ম করে এসেছে, আধুনিক চীনা ফৌজের সঙ্গে তারা পারবে কেন? তিনদিন হাতাহাতি লড়াই আর কামানের গুলিতে শত শত নাগরিক ও সন্ন্যাসী মারা পড়লো। লাসার মঠ ও গৃহগুলি মানুষের রক্তে লাল হয়ে গেল, পথঘাট ঢাকা পড়ে গেল মৃতদেহে। তার পর চীনা ফৌজ তিব্বতের কর্তা হয়ে বসলো।

এই হাঙ্গামা সুরু হবার আগেই, ১৯৫৯ সালের ১৭ই মার্চ, দালাই লামা গোপনে লাসা থেকে চলে গেলেন সামান্য জন কয়েক বিশ্বস্ত অনুচর মাত্র সঙ্গে নিয়ে। দিনে আত্মগোপন করে আর রাতে পথ চলে, চীনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে, তিনি ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন।

তিব্বতে দালাই লামার পরেই পাঞ্চেন লামার মর্যাদা। এই পদটির সৃষ্টি করেন পঞ্চম দালাই লামা। এই পদে তিনি প্রথম অধিষ্ঠিত করেন তাঁর সম্মানিত শিক্ষককে। পাঞ্চেন শব্দটির অর্থই হলো শিক্ষক। দালাই লামার অবর্তমানে পাঞ্চেন লামাই হলেন তিব্বতের সর্বময় কর্তা

এখন এই পদটি চলে আসছে শিষ্য পরম্পরায়। বর্তমান পাঞ্চেন লামা বয়সে তরুণ,—মাত্র একুশ বছর। তিনিই এখন চীনাদের অধিকারভুক্ত তিব্বতের শাসক। দালাই লামা চলে আসবার পর তিনি বলেছেন—চীনারা তিব্বতীদের কল্যাণ চায়, তিব্বতীরা বিদ্রোহ করেছিল, তার শাস্তি তারা পেয়েছে।

একটি শক্তিমান্ রাষ্ট্র যখন একটি দুর্বল রাষ্ট্রের বহু প্রজাকে হত্যা করে তার কল্যাণ করতে আসে, তখন সে কল্যাণ যে সাধারণের কল্যাণ নয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

এদিকে ভারতবর্ষ বুদ্ধের জন্মভূমি ও কর্মভূমি, বৌদ্ধ জগতের ধর্মগুরু দালাই লামা এখানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে আশ্রয় পেয়েছেন। যত দিন ইচ্ছা তিনি এ দেশে থাকতে পারেন। শুধু

প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি করা তাঁর চলবে না, তাহলে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য চীনদেশের শত্রুতা সৃষ্টি হবে। আমরা বিরোধ এড়িয়ে চলতে চাই। তা বলে চীনারা কিন্তু ছাড়ে নি, ভারত সীমান্তের কিছুটা দখল করে রয়েছে তারা। অবশ্য, পরের দেশ গ্রাস করা কম্যুনিষ্ট নীতি নয়, অথচ চীনা সরকারকে আমরা কম্যুনিষ্ট সরকার বলেই মনে করি।

পৃথিবীর অদ্বিতীয় ধর্মগুরু দালাই লামাকে আজ অত্যন্ত কাছাকাছি দেখলাম। এই ভাবে দেখা তিব্বতে থাকলে মহা-সৌভাগ্য বলে গণ্য হতো। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের গৈরিকধারী এই মানুষটি একটি রাজ্যের সর্বজনমান্য শাসক ছিলেন, এবং পূর্বজন্মের সব কথা তাঁর স্মৃতিপথে স্বচ্ছ আছে, এ কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। মানুষটিকে ভালো করে একবার দেখে নেবার চেষ্টা করি। ধীর পদক্ষেপে তিনি আমাদের অতিক্রম করে যান। কয়েকজন লামা চলেন অনুগামী হয়ে।

এবার ওখানকার কেন্দ্রীয় খাদ্য-গবেষণা-পরিষদের কথা। চিত্রশালা দেখে আমরা গেলাম তারই উদ্দেশে।

বিরাট প্রাসাদ। চারিপাশে সুদৃশ্য বাগান। মনোরম পরিবেশ। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন পাঁচটা বাজে,—পরিষদ বন্ধ হবার সময়। শুনলাম আজ আর কোন দর্শকের পক্ষে ভিতরে যাওয়া সম্ভব নয়। কালই আমাদের চলে যেতে হবে, অথচ এটা দেখা হবে না? ক্ষিতীন বাবু খোঁজ নিলেন কোন বাঙালী অফিসার আছেন কিনা এবং খুঁজেও বার করলেন এখানকার এক কর্মকর্তাকে—ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর লাহিড়ীকে। ক্ষিতীন বাবু নিজের (যেহেতু তিনি বিজ্ঞানের অধ্যাপক) ও আমাদের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আজ কি আর কিছু দেখা সম্ভব নয়?

ডক্টর লাহিড়ী অতি অমায়িক ভদ্রলোক। বহু বছর আমেরিকায়

খাদ্য-গবেষণা করে কয়েক বছর হলো দেশে ফিরেছেন। আমাদের পরিচয় পেয়ে বললেন,—নিশ্চয়ই। আপনারা এসেছেন, না দেখে ফিরে যাবেন! আমি নিজে আপনাদের দেখাচ্ছি।

তিনি সানন্দে স্বয়ং আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে এটা-ওটা-সেটা দেখিতে বুঝিয়ে দিলেন।

খাদ্য-সম্পর্কিত গবেষণার নানা দিক আছে। আমরা মাছ-মাংসের সংরক্ষণ পদ্ধতি দেখলাম। মালাবার উপকূলে মাছের প্রাচুর্য খুব, সেই মাছ সাধারণতঃ শুঁট্‌কি মাছ করে চালান দেওয়া হয়। কিন্তু শুঁট্‌কি মাছ সর্বত্র চলে না, দীর্ঘকাল রাখাও যায় না। এখানে চিংড়িমাছের মুড়োটা বাদ দিয়ে এমন ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে খাদ্যমূল্যের কিছুমাত্র তারতম্য না হয়ে দু' বছর অবধি মাছ ঠিক থাকবে। এক রকম মাছের পাউডার তৈরী করা হয়েছে যাকে 'মাছের ছাতু' বলা যেতে পারে। রং ছাতুর মত, আটার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি করে খাওয়া চলে; কোন গন্ধ নেই, কিন্তু পুষ্টি আছে। মাংসের সার দিয়ে এক রকম ছোট ছোট বড়ি করা হয়েছে যা চায়ে বা গরম দুধে দিলে গলে যাবে, কিন্তু স্বাদের কোন ব্যতিক্রম হবে না। এক একটি ছোট বড়িতে এক-এক পোয়া খাদ্যরস সংরক্ষিত হয়েছে। এক একটি বড়ি এক-একজনের একদিনের কার্যক্ষমতা যোগান দেবার পক্ষে পর্যাপ্ত। যেখানে বহু লোকের পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান দেওয়া প্রয়োজন সেখানে অল্প পরিসরে কম বহন-খরচায় এতটা পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা কম কথা নয়! এক থলি বড়ি একহাজার মানুষকে দিব্যি পরিবেশন করা চলে। দুর্গম পথের যাত্রী বা বিপদ্‌সঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের পক্ষে সহজ-বহনযোগ্য এই খাদ্যটি একান্ত উপযোগী।

সেখানে আরেকটি জিনিষ দেখলাম—খাবারে পোকা-ধরা বন্ধ করার ঔষধ। গাছের কোন ক্ষতি না করে ক্ষেতের পোকা মারা যায়, সে ওষুধ এঁরা বের করেছেন। তার পর, ধান ও গমের আড়তে

বস্তায় পোকা লেগে অনেক ধান-চাল নষ্ট হয়। বস্তার মধ্যে যাতে পোকা ঢুকতে না পারে সেজন্য বস্তার উপর এক রকম বিশেষ প্রতিষেধকের আস্তরণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই আস্তরণ দেবার খরচও বেশি নয়।

এমনি আরো নানা জিনিষ দেখলাম। যত দেখি ততই আনন্দ হয়। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা তাহ'লে সত্যি কিছু করছেন! কলিকাতায় বসে আমরা এ সব খবর কিছুই তো পাই না। সেখানকার কাগজে শুধু সস্তাদরের রাজনীতির কাচাকাচি, আইন-আদালতের আজেবাজে মামলা আর সিনেমার আলোচনা দিয়েই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ও গবেষণার কথা খুবই কম। জনকল্যাণ ও মনোসমৃদ্ধির যে কোন অগ্রগতি হয়েছে আমাদের, এখানকার কোন খবরের কাগজ খুললে সে-কথা বোঝা যায় না।

কথায় কথায় ডক্টর লাহিড়ী বললেন—মহীশূরে বাঙালী আছেন মাত্র ছ'জন।

এই রাজ্যটির সর্বাঙ্গীন উন্নতির মূলে আছেন বাঙালী মনীষীরা। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন ১৯২০ সালে। ১৯২২ থেকে ১৯২৫ সাল অবধি তিনিই ছিলেন শিক্ষা বিষয়ে এখানকার সরকারের উপদেষ্টা। স্যর আলবিয়ান রাজকুমার ব্যানার্জি এই রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন ১৯২২ থেকে ১৯২৫ সাল অবধি। মাইনিং ইন্‌জিনীয়র অজিতমোহন সেন এখানকার ডিরেক্টর অব জিওলজির পদ গ্রহণ করেন ১৯২৫ সালে। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন ১৯১৭-১৮ সালে। দেওয়ান জে, সি, চক্রবর্তী সেক্রেটারী অফ ফিনান্স নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৯১৬ সালে। স্যর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ইণ্ডিয়ান ইনস্টটিউট অফ সায়ান্সের ডিরেক্টর ছিলেন ১৯৪০-৪৭ পর্যন্ত। এঁদের সঙ্গে এবং এঁদের পরেও আরো বহু কৃতী

বাঙালী এখানকার উচ্চপদে কাজ করেছেন ও করছেন। তাঁদের কৃতিত্ব বাঙালীর গৌরব। তবু এখানে বাঙালীর সংখ্যা এত কম কেন?

সহরের চৌমাথার মোড়ে যখন বাস থেকে নামলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সারা সহর আলোয় ঝলমল করছে। এখানকার আলোর ঝলমলানি খুব বেশি।

প্রথমেই কথা উঠলো—কফি খেতে হবে।

ভারতে কফির আদি জন্মভূমি এই মহীশূর। কফি আগে ভারতে জন্মাতো না। কোন এক সময় এখানকার এক মুসলমান মক্কায় হজ করতে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় তিনি সেখান থেকে কফি ফল নিয়ে আসেন। এখানে সে ফলের বীজ পুঁতে তিনি নিজের সামান্য একটু জমিতে কফির ক্ষেত তৈরী করেন। কফির স্বাদ পেয়ে ধীরে ধীরে আরো অনেকে কফির চাষ সুরু করে। তার পর স্কচ সাহেবরা এসে এখানে বড় বড় কফি-বাগান তৈরী করলেন। দেখতে দেখতে কফির আবাদ ছড়িয়ে পড়লো সারা দক্ষিণ ভারতে। চায়ের বদলে কফিরই চলন হলো। কেরল ও কর্ণাটের বহু কফি-বাগান এখনও সাহেবদের হাতেই আছে।

একটি বড় কাফে দেখে আমরা ঢুকে পড়লাম। ভীড় গিসগিস করছে। বয় সিঁড়ি দেখিয়ে দিল, দোতলায় গিয়ে উঠলাম। সেখানেও সেই ভীড়। আবার আর-এক বয় সিঁড়ি দেখিয়ে দিল, তিনতলায় উঠলাম। সেখানেও সেই অবস্থা। স্থানাভাব। অনেক দেখেশুনে অপেক্ষা করে এক কোণে পাঁচখানি চেয়ার পাওয়া গেল, কিন্তু আমরা যে ছ'জন! পাঁচজন বসলাম, ভবেশ দাঁড়িয়ে রইল। দু'টি করে মিঠাই অর্থাৎ ছোলার বরফি ও এক কাপ করে কফি খেয়ে সেখান থেকে বেরুতে আমাদের লাগলো প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা। কলিকাতার অনেক চৌমাথায় অনেক বড় রেস্তোরাঁ দেখেছি, কিন্তু একটি বাড়ীর তিনতলা অবধি রেস্তোরাঁ

এবং এমন ভীড়ের জমজমাট একটিও তো দেখি নি! সত্যিই কানাড়ীদের কাফে-প্রীতি আছে। শুধু কানাড়ী কেন, দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই চোখে পড়েছে, রেস্তোরাঁ ও কাফেতে সর্বদাই রীতিমত ভীড়।

এবার কেনা-কাটার পালা।

সবাই কিছু-না-কিছু কিনতে চায়। বাড়ী ফিরলেই তো পরিজনেরা ঘিরে ধরবে—আমার জন্য কি এনেছ?

আমরা প্রত্যেকেই বাঙালুরে কিছু কিছু রেশমী কাপড় ও ছিট কিনেছিলাম, এখানে কেনার ছিল ধূপ, চন্দন কাঠ ও কাঠের জিনিষ। চন্দন কাঠ এখানকার সরকারী মাল। কাঠের উপর ছাপ মেরে বাজারে বিক্রী হতে আসে, চার টাকা সের। চন্দনের গুঁড়োও প্যাকেট হয়ে আসে,—ওজন ও দাম লেখা। তবে ধূপ তা নয়। দোকানে যে ধূপের বাণ্ডিল দেখলাম ছ' আনা করে, পথে ফেরিওয়ালার কাছে তা-ই কিনলাম তিন প্যাকেট আট আনায়। চন্দন কাঠের নানা সৌখীন জিনিষও এখানে পাওয়া যায়, তবে দাম বেশ চড়া। সেদিকে আর কেউ হাত বাড়ালেন না। অল্প ব্যয়ে চন্দন কাঠের বোতাম, কৌটো ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিষ কিনলেন কেউ কেউ।

কেনাকাটা শেষ করতে করতে রাত ন'টা বেজে গেল। ছু'-একটা পছন্দসই জিনিষ কেনার ইচ্ছা সকলেরই ছিল, কিন্তু দাম দেখে অনেকেই পিছিয়ে এলেন।

নীচের সরাইখানায় আহার শেষ করে শোবার ঘরে যখন উঠে এলাম রাত তখন সাড়ে দশটা। স্নিগ্ধ বাসন্তী হাওয়া, মশা-মাছির কোন উপদ্রব নেই; এক ঘুমে রাত কেটে যায়।

পরদিন ভোর ছ'টার বাস।

মহীশূর থেকে শ্রাবণ-বেলগোলা। বাষট্টি মাইল, বাসে সময় লাগে ছু' ঘণ্টা। বাসই এই পথের একমাত্র পরিবাহন। জনপদ

বেশ দূরে দূরে, সেই জন্য বাসে ভীড় থাকে বেশ। তা ভীড় বেশি হলেও শীতের সকালে কষ্ট হয় না। তা ছাড়া কলিকাতার বাসে চড়া আমাদের অভ্যাস আছে। কত স্বল্প স্থানে দেহ-ধারণ করা যায় এবং 'র‍্যাশান্যাল এ্যানিম্যালের' 'র‍্যাশান্যাল'টুকু বাদ দিয়ে, গুঁতায়িত, চেপ্‌টিত ও ঝুলন্ত 'এ্যানিম্যাল' হবার চেষ্টা আমরা প্রতিদিন যে ভাবে প্রকাশ করে থাকি, তাতে কোন রকম ভীড়ই আমাদের ব্যাকুল করতে পারে না। এই বাসে বসে যাচ্ছি, দাঁড়িয়ে যেতে হয় নি,—এ আবার ভীড় কিসের?

চারিপাশে ঘন কুয়াশা। সূর্য উঠার পর ধীরে ধীরে সেই কুজ্‌ঝটি কেটে দেখা দিল তেপান্তরের মাঠ, আর কাছে ও দূরে পাহাড়ের সারি। মাঝে মাঝে একটু-আধটু পল্লী আর ক্ষেত চোখে পড়ে, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের স্পর্শ কোথাও নেই। বাঙালুর ও মহীশূরে সবটুকু সম্পদ্ নিঃশেষ করে দিয়ে এখানে ধরিত্রী যেন রিক্তা হয়ে বসে আছেন। এরই কয়েক মাইলের মধ্যে ললিতা মহল, জগমোহন প্রাসাদ ও বৃন্দাবন-বাগানের অস্তিত্ব আছে, তা এখানকার পানে তাকিয়ে ভাবা যায় না।

সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা এসে পড়লাম। বাস্ আমাদের নামিয়ে দিল চৌমাথার মোড়ে। একটি অতি-সাধারণ গ্রাম, সমৃদ্ধির কোন চিহ্ন কোথাও নেই। কাছেই একটি খাবারের দোকান ছিল, সেখানে লটবহর জমা রেখে কিছু জলযোগ সেরে আমরা পাহাড়ী পথ ধরলাম।

পাশাপাশি দু'টি পাহাড়—ইন্দ্রগিরি ও চন্দ্রগিরি। ইন্দ্রগিরির মাথায় গোমতেশ্বরের মূর্তি। পাহাড়টি সমুদ্র-সমতল থেকে ৩৩৪৭ ফুট উঁচু, কিন্তু এখানে এই গ্রামের সমতল থেকে পাহাড়ের উচ্চতা ৪৭০ ফুট মাত্র। উঠতে কোন কষ্ট হয় না। ঢালু পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য সিঁড়ি কাটা আছে। দু'শো সিঁড়ি পার হলেই একটি পাথরের তোরণ। আরো দেড়শো সিঁড়ি পার হ'লে আরেকটি

তোরণ। মোট পাঁচশো পঁচিশটি সিঁড়ি পার হ'য়ে আমরা এসে পড়লাম মন্দির-তোরণে। নীচে একপাশে একটি পুষ্করিণী। উপরে, তোরণ থেকে সুরু হয়েছে মন্দির-বেষ্টনী—উঁচু পাথরের পাঁচিল। এখানে সিঁড়িটা এমনভাবে ঘুরে-ফিরে উঠেছে যাতে মনে হয় কোন দুর্গে প্রবেশ করছি। হয়তো সে যুগে এই রকমই প্রয়োজন ছিল।

তোরণে পৌঁছেই প্রভাস বললো,—আমি একটু বসি।

চাতালের ছায়ায় সবাই বসে পড়লাম। এবার আমরা বুঝলাম আমরা সবাই ক্লান্ত।

সবাই তৃষ্ণার্ত। ভবেশ বললো,—জলের বোতল আমরা কেউ আনি নি। আনলে ভাল হতো।

সর্বত্রই জলের বোতল আমাদের সঙ্গী, আজ সব ক'টি বোতলই আমরা নীচে রেখে এসেছি। যাক্, সামনের পুকুরটায় নেমে গেলাম। জলটা খুবই নোংরা, হাত-পা ধুয়ে ভিজে হাতখানি কপালে ও চেখে বুলিয়ে নিলাম। সে জলে মুখ ধোয়া চলে না। মন্দির-রক্ষকেরা মন্দির রক্ষা করেন, তাতে অর্থাগম হয়; কিন্তু পুকুরের সংস্কার করলে সে পয়সাটা জলে যায়, তা থেকে উপার্জন হয় না। আমাদের দেশ বেদান্তের দেশ, সবই অনিত্য। সে-যুগে সেই অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্তু ছিল ব্রহ্মজ্ঞান, এ-যুগে হয়েছে অর্থজ্ঞান। যাতে অর্থ নেই তেমন কাজ কেউ আর সহজে করতে চায় না। যারা সর্বত্যাগী—দিগম্বর তীর্থঙ্করদের পূজা করে, পিঁপড়েকে চিনি ও গরুকে জিলিপি খাওয়ায়, সেই সব জৈন ব্যবসায়ীদেরও কেউ কেউ, দেখেছি, সারা দেশকে ভেজাল খাইয়ে আর চোরা-বাজার চালিয়ে, ছ'তলা বাড়ী ও মোটর গাড়ী ভোগ করার জন্য সদাই সচেষ্ট। এখনকার মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে লোভ ও হিংসা। ধর্মকথা ও ধর্মবোধ মনের একটা সৌখীন ভূষণমাত্র। না হলে চীন ও জাপান তো বৌদ্ধ দেশ, অহিংসা

সে-ধর্মের প্রথম নীতি, অথচ এরাই এ যুগে পরস্পরের মধ্যে যত বেশি দিন লড়াই করেছে এমনটি আর কোন দেশে হয় নি। যীশু বলেছিলেন, 'প্রতিবেশীকে ভালবাস', আর ক্রীশ্চানরা সুবিধা পেলেই প্রতিবেশী রাজ্যে দিনের পর দিন বোমাবর্ষণ করে, গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে—যুদ্ধে যেন জিততে পারি। ধর্মে ও কর্মে যখন কোনও মিল নেই, তখনই জোর গলায় বলা হয়—আমার ধর্ম এই বলেছে, আমার ধর্মে এই আছে। আসলে ধর্ম আছে পুঁথির পাতায়, কারও মনে নেই, কারও কাজে নেই।

ভবেশ চাতালের একপাশে শুয়ে পড়লো, বললো—কী হাওয়া!

সুধীন ও রবীন ততক্ষণে ক্যামেরা নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।

আমরা কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করে, আরো পঁচাত্তরটি সিঁড়ি উঠে একেবারে পাহাড়ের মাথায় মূল মন্দিরে এসে পড়লাম। আসলে কিন্তু এটি কোন মন্দির নয়, একটা উন্মুক্ত অঙ্গনের চারিপাশ ঘিরে একটা চতুষ্কোণ বারান্দা, অঙ্গনের মাঝে বিরাট গোমতেশ্বরের মূর্তি। সাতান্ন ফুট উঁচু গ্র্যানাইট পাথরের তৈরী দিগম্বর মূর্তি। সমস্ত মূর্তিটি একখানি পাথরের তৈরী। গোমতেশ্বর একটা উইয়ের ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে আছেন। ঢিবিটা প্রায় তাঁর হাঁটু অবধি উঁচু। ঢিবিটার গায় কয়েকটি গর্ত করা আছে, আর সেই গর্তের পাশে সাপ আঁকা আছে। সেই ঢিবির উপর থেকে উঠেছে দুটি মাধবীলতা, হাঁটু থেকে উরু অবধি বেষ্টন করে দুই বাহুকে ঘিরে উঠে গেছে বাহুসন্ধি পর্যন্ত। আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড মূর্তি। কোথাও কোন অসাম্য নেই। কঠিন পাষাণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও কমনীয়তা ফুটে উঠেছে। প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনের পানে, মুখে স্নিগ্ধ হাসির অস্ফুট প্রকাশ।

গোমতেশ্বর জৈন তীর্থঙ্কর।

অতীতের কোন এক বিস্মৃত দিনে উত্তরাপথের সম্রাট ছিলেন পুরুদেব। পুরুদেবের দুই পুত্র,—ভরত আর ভুজবলী। কেউ

কেউ বলেন ভুজবলী নয়, বাহুবলী। রাজার মৃত্যুর পর রাজত্ব নিয়ে বাধলো বিবাদ—কোন্ ভাই রাজা হবে? রাজ্য যদি দু' ভাগই হয় তাহ'লে কে নেবে কতখানি? শেষ অবধি একটা লড়াই বেধে যায় বুঝি! একজনের রাজ্য পাওয়ার জন্য বহুজনের দুঃখ সৃষ্টি হবে, কতজন মরবে, কত গৃহে শোকের ছায়া পড়বে, কত ছেলেমেয়ে অনাথ হবে। বাহুবলী ভাইকে বললেন,—আমি খুনোখুনি চাই না, রাজ্যও চাই না। তুমি একাই রাজা হও, আমি সন্ন্যাসী হয়ে চললাম।

বাহুবলী বিবাগী হয়ে চলে গেলেন।

লোকালয়ের বাইরে বহুদিন ধরে বহু সাধন-ভজন করে বাহুবলী সিদ্ধিলাভ করলেন। সিদ্ধপুরুষ হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো, তিনি হলেন তীর্থঙ্কর।

বাহুবলী যেখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সেইখানে, ভাইয়ের মহত্ব স্মরণীয় করে রাখবার জন্য, মহারাজ ভরত বিরাট এক পাথরের মূর্তি স্থাপনা করলেন। মূর্তিটি হ'লো ৫২৫ 'ধনু' উঁচু। দেখতে দেখতে স্থানটা একটা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হলো।

তার পর কত কাল কেটে গেল। ভরত রাজার রাজ্য ও রাজধানী হারিয়ে গেল। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, কত ওলোট-পালট ও কত দুর্যোগ কত জনপদকে মুছে দিল, আবার কত সমারোহ, কত গৌরব, কত মাহাত্ম্য ও কত ঔদ্ধত্য কত নতুন জনপদ সৃষ্টি করলো। বাহুবলীর পাথরের মূর্তির চারিপাশে জেগে উঠলো বন—ফণীমনসার জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলে হলো সাপের বাসা। জঙ্গল হলো মানুষের অগম্য। জঙ্গলের বাইরে থেকেও সে মূর্তি দেখা যেতো, লোকে বলতো—কুক্কুতেশ্বর! অর্থাৎ ফণিমনসা জঙ্গলের দেবতা। কুক্কুত মানে ফণিমনসা।

তার পর একদিন অত বড় মূর্তিটাকে আর দূর থেকেও দেখা গেল না। কি হলো, সাপের জঙ্গলে ঢুকে দেখতেও কারও সাহস হ'লো না, লোকে বললো—কুক্কুতেশ্বর অন্তর্ধান করেছেন।

তার পরে একেবারে আমরা এসে পড়লাম নবম শতকের শেষ দিকে। তখন এই অঞ্চলের রাজা গঙ্গাবংশের মহারাজা রাজমল্ল। তাঁর মন্ত্রী চামুণ্ড রায় ছিলেন জৈনধর্মী। লোকমুখে কিংবদন্তী শুনে তিনি বাহুবলীর মূর্তির সন্ধান করতে বেরুলেন। এই অঞ্চলে অনেক খোঁজখবর করেও সেই মূর্তির দেখা পাওয়া গেল না। তখন তিনি নিজেই একটি মূর্তি তৈয়ারী করালেন—আটত্রিশ হাত উঁচু, সেই মূর্তি স্থাপনা করলেন এখানকার এই ইন্দ্রগিরি পাহাড়ের মাথায়। এই মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছে ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। তার পর হাজার বছর ধরে ঝড়বৃষ্টি অবাধে বয়ে গেছে, কিন্তু মূর্তির গায়ে কোন দাগ রেখে যেতে পারে নি। দু'-চারটে ভূমিকম্পও যে না হয়েছে তা-ও নয়, কিন্তু এই বিশাল মূর্তি এতটুকু টলে নি। ধন্য সে যুগের সেই রাজ-স্থপতি—যিনি প্রায় এগারো-শো বছর আগে পাহাড়ের মাথায় এত বড় মূর্তিকে এ ভাবে স্থাপনা করতে পেরেছিলেন।

এই বিরাট মূর্তিটি একখানি পাথর কেটে তৈরী। উচ্চতা ৫৭ ফুট, চওড়াও সেই অনুপাতে। মাথার উপর দিয়ে এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত মাপলে ১৩ ফুট হবে। শুধু এ দেশেই নয়, পৃথিবীতে এত বড় মর্মরমূর্তি আজ অবধি তৈরী হয় নি। মিশর দেশে সম্রাট্ রামেশিশের এক মূর্তি আছে, তা-ও বিরাট, কিন্তু গোমতেশ্বরের এই মূর্তির তুলনায় অনেক ছোট। এই মূর্তি দেখে শিল্পরসিক ফার্গুসন সাহেব বলেছেন,—'এমন বিরাট ও ভাবোদ্দীপক মূর্তি মিশর ছাড়া আর কোথাও নেই। কিন্তু উচ্চতায় এটি সবার উপরে, এবং শিল্প-সৌকার্যেও সকলকে অতিক্রম করে গেছে।' এ কথা ভারতীয়ের কথা নয় যে আমাদের কাছে অচল ও পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হবে। ভারতীয় বিষয়কে বড় করে দেখতে শিক্ষিত ভারতবাসী সদাই সঙ্কোচ বোধ করে, সেই জন্য সাহেবের চোখ দিয়ে দেখতে হয় আমাদের সব-কিছু।

ফুল ও ফল পাওয়া গেল। আমরা কিনে দিলাম পুরোহিতের হাতে, পুরোহিত অর্ঘ দিলেন মূর্তির চরণে। হয়তো প্রশ্ন উঠবে, —ইনি তো দেবতা ন'ন, তবে এঁর চরণে অর্ঘ দেবার প্রয়োজন কি? দেবতা ইনি ন'ন সত্যি, কিন্তু দেবোপম। যাঁদের আমরা দেবতা বলে মূর্তি গড়ে পূজা করি তাঁদেরকে তো কেউ দেখি নি! কিন্তু আমাদের চোখে-দেখা মানুষ যখন দেব-গুণে দেবত্ব লাভ করেন তখন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। বাহুবলী সেই দেবত্বের অধিকারী ছিলেন। আর যে শিল্পী ও স্থপতি এই বিরাটকে রূপ দিয়েছেন ও স্থাপনা করেছেন, তাঁদের সেই কৃতিত্বকেও শ্রদ্ধা জানাই সেই সঙ্গে।

আমরা চারিপাশটা এবার ঘুরে দেখলাম। চারিপাশে চতুষ্কোণ মণ্ডপ। দক্ষিণে বারান্দার এক কোণে পর পর পাঁচটি তীর্থঙ্করের মূর্তি। পিছনের কয়েকটি ঘর তালাবন্ধ। মণ্ডপের সেই দিকটা দোতলা, কিন্তু সিঁড়ির দরজা বন্ধ। সেদিকে মণ্ডপের উপর মঞ্চ বাঁধা আছে, সেই মঞ্চে উঠে মূর্তির শীর্ষভাগ পরিষ্কার করা হচ্ছে, পাথরের শ্বেতাভা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে পরিচ্ছন্ন ভাবে।

মণ্ডপের বাইরে তোরণের সামনে ব্রহ্মদেব-স্তম্ভ। থামের মাথায় ব্রহ্মার একটি মূর্তি আছে, তার নীচে দাঁড়িয়ে আছে এক মাল্যবাহিনী নারীমূর্তি—গুল্লকয়াজ্জী।

এই গুল্লকয়াজ্জী সম্পর্কে একটি গল্প আছে।—

গোমতেশ্বরের বিশাল মূর্তি স্থাপিত হলো। স্নান করিয়ে যথারীতি শাস্ত্রসম্মত ভাবে অভিষেক করে তার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অত বড় মূর্তি পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করানো সহজ কথা নয়। চামুণ্ড রায় বহুপাত্র পঞ্চামৃত মূর্তির মাথায় ঢাললেন, তবু মূর্তির সবটুকু সিক্ত হলো না। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন,—এমন হলে কি করে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে?

এমন সময় এক রমণী এসে বললেন,—শুধু পঞ্চামৃতে তো

দেবমূর্তির স্নান হবে না, তার সঙ্গে পরিপূর্ণ ভক্তি থাকা চাই যে! আপনি অনুমতি করলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। যেদিন থেকে এই মূর্তি গড়া হচ্ছে সেদিন থেকে আমি একান্তভাবে কামনা করছি প্রথম দিনে এই মূর্তির মাথায় আমি জল দেব।

চামুণ্ড রায় বললেন,—বেশ, তাই দাও। কত কলসী পঞ্চামৃত তোমার চাই বল?

—বেশী চাই না, হবার হলে পাঁচ-সাত কলসীতেই হবে।

রমণী মঞ্চে উঠে গোমতেশ্বরের মাথায় জল ঢাললেন—ওঁ নমো গোমতেশ্বরায়!

পাঁচ কলসী পঞ্চামৃতেই গোমতেশ্বরের মূর্তি সিক্ত হয়ে গেল।

চামুণ্ড রায় যা পারেন নি, ঐকান্তিক ভক্তির নিবেদন সেই অসাধ্য সাধন করলো। সেই ঘটনা স্মরণে রাখার জন্যই এই নারীমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এখানে। তোরণের ডান পাশে পাথরের গায়ে আরও একটি নারীমূর্তি আছে, হাত জোড় করে রমণী বসে আছেন। এটিও ওই গুল্লকয়াজ্জীর মূর্তি।

মণ্ডপের প্রবেশ-তোরণটিও একখানি পাথরের তৈরী, এজন্য এটির নাম অখণ্ড তোরণ। খিলানের উপর একটি লক্ষ্মীমূর্তি খোদাই করা আছে, দু' পাশে দুটি হাতী শুঁড়ের জলে লক্ষ্মীকে স্নান করাচ্ছে।

তোরণের বাইরে এসে দাঁড়ালে ঢালু পাহাড়ের নীচে উপত্যকার সবটুকু চোখে পড়ে। নীচে একটি জনপদ, গোমতপুরা। এখন এ অঞ্চল শ্রাবণ-বেলগোলা নামে পরিচিত। এই জনপদ অতি প্রাচীন। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো কয়েকটি মন্দির। মন্দিরগুলি জৈন তীর্থঙ্করদের। এক কালে এটি জৈনদের একটি প্রধান ধর্মকেন্দ্র ছিল, জৈনপ্রধানেরা এখানে ধর্ম-চর্চা ও ধর্ম আলোচনার জন্য আসতেন। জৈনশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ এখানে ছিল। বিধর্মীদের আক্রমণ থেকে গ্রন্থগুলি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জৈনরা সেই সব শাস্ত্রগ্রন্থকে একটি ছোট মন্দিরের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। জৈনশাস্ত্র 'জৈন সিদ্ধান্ত'

নামে খ্যাত। জৈন সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য সেই মন্দিরের নাম হয় 'সিদ্ধান্ত-বস্তি'। কানাড়ি ভাষায় 'বস্তি' মানে মন্দির।

মহীশূরের বিখ্যাত শ্রাবণ-বেলগোলা। এক পাশে ইন্দ্রগিরি পাহাড়ের চূড়ায় গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্তি। উপত্যকাভূমির ওদিকে আরেকটি পাহাড়,—চন্দ্রগিরি। চন্দ্রগিরি আগের পাহাড়টির চেয়ে মাথায় কিছু ছোট। ওখানে পর পর অনেকগুলি জৈন মন্দির আছে। শান্তিনাথ, সুপার্শ্বনাথ, পার্শ্বনাথ, আদিনাথ, অনন্তনাথ, নেমিনাথ প্রভৃতি সাতজন তীর্থঙ্করের সাতটি মন্দির আছে ওখানে। আর সেই সঙ্গে আছে গোমতেশ্বরের ভাই মহারাজ ভরতেশ্বরের একটি পাথরের মূর্তি—ন' ফুট উঁচু। এ-পাহাড়ে সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ভাইএর মূর্তি ৫৭ ফুট উঁচু, আর ও-পাহাড়ে রাজ্যবিলাসী সংসারী ভাইএর মূর্তি ৯ ফুট উঁচু। এই দুইটির তুলনা করলেই বোঝা যায় হিন্দুর জীবন-দর্শনের ভাবধারা কি, তার আদর্শ কোন্ দিকে। রাজার উপরে ঋষির আসন, জ্ঞানের মর্যাদা সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি।

এখানকার ঐতিহাসিক মন্দির চন্দ্রগুপ্ত-বস্তি। মৌর্য সম্রাট্ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। ছোট মন্দির, ভিতরে পার্শ্বনাথের মূর্তি।

মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত অল্পবয়সেই গান্ধার থেকে মহীশূর অবধি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ মহামাত্য চাণক্যের ক্ষুরধার বুদ্ধির সুপ্রয়োগ করে সমগ্র ভারতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এতবড় সাম্রাজ্যের বোঝা তাঁকে ক্লান্ত করে ফেলেছিল। অতি প্রত্যূষ থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কাজ করতে করতে দেহে ও মনে অবসাদ জমে উঠলো। সাফল্য, সম্মান ও শান্তি সে অবসাদকে মুছে দিতে পারলো না।

এদিকে রাজ্যমধ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। অজন্মা ও খাদ্যাভাবে হাহাকার পড়ে গেল। শক্তি ও সম্পদ্ দিয়ে তো একমুঠো ফসল

ফলানো যায় না। সম্রাট্ বিচলিত হলেন, কানে এসে বাজলো পুরানো প্রবচন—রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, রাজার পাপেই প্রজার দুঃখ। রাজা আত্মপাপ স্খালনের পথ খুঁজতে লাগলেন। এমন সময় রাজসভায় এসে দাঁড়ালেন জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহু। সত্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসী, সম্রাটের মুখের পানে তাকিয়েই মনের কথাটি বুঝতে পারলেন। বললেন,—সম্রাট্, তীর্থদর্শন করুন, মনের চঞ্চলতা দূর হবে, পুণ্য হবে, প্রজার কল্যাণ হবে।

সম্রাট্ ভদ্রবাহুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। জৈন সন্ত ভদ্রবাহু তখন ভারতের সর্বজনমান্য জ্ঞানী পুরুষ। জৈন ধর্মের প্রভাব তখন সর্বত্র। চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জিন তখন সর্বভারতে পূজা পাচ্ছেন। তাঁদের নানা মন্দির, নানা সাধনক্ষেত্র। সেই সব তীর্থে তীর্থে ভদ্রবাহু ঘুরে বেড়ালেন সম্রাট্কে সঙ্গে নিয়ে। সবশেষে সম্রাট্ এলেন শ্রাবণ-বেলগোলায়। এখানে সম্রাট্ বহু নিষ্কাম সর্বত্যাগী সাধু-সন্তদের সংস্পর্শে এসে পড়লেন। তাঁদের শান্ত জীবনধারা ও অনাড়ম্বর সাধনার পথ সম্রাটের ভালো লাগলো। তিনি ভদ্রবাহুর কাছে দীক্ষা নিলেন। সসাগরা ভারতেশ্বর হলেন গৈরিকধারী জৈন সন্ন্যাসী, দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ হলেন নিঃসম্বল গুহাবাসী। চন্দ্রগিরির এক গুহায় ভদ্রবাহুর সঙ্গে তিনি থেকে গেলেন। মগধে আর ফিরে যাওয়া হলো না। যুবরাজ বিন্দুসারের উপর রাজ্যশাসনের ভার ছিল। পিতার নির্দেশে তিনিই এবার রাজ্যের প্রকৃত শাসক হয়ে বসলেন।

সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত আত্মপাপ স্খালনের জন্য ও প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ-কামনায় ব্রত-উপবাস সুরু করলেন। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে কৃচ্ছ্র সাধন করলে সর্বপাপ ক্ষয় হয়। চন্দ্রগুপ্তও কৃচ্ছ্র সাধনে প্রবৃত্ত হলেন। রাজ্যের দুর্ভিক্ষ-পাপকে দূর করার কামনায় শেষ অবধি সম্রাট্ অনশনে আত্মদান করলেন। সম্রাটের বয়স তখনও ষাটের কোঠায় পৌঁছায় নি।

যে গুহায় সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন সেই 'শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু গুহা' আজও আছে। ছোট, সাধারণ একটি গুহা। সেখানে ভদ্রবাহুর পদচিহ্ন আছে। ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্‌কে যিনি সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁর পদচিহ্ন সত্যপথের প্রদর্শক।

এদিকে জৈন মন্দিরই সব, তবে গ্রামের মাঝে একটি কালী-মন্দিরও আছে—কালাম্পা মন্দির। এটি অল্পদিনের মন্দির। এখানকার পুরোনো সংস্কৃতির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই।

পাহাড় থেকে নেমে এসে ছোট হোটেলটিতে আমরা আহারাদি করলাম। তার পর লাগেজ নিয়ে এসে দাঁড়ালাম পথের চৌমাথায়, বাস্-স্ট্যাণ্ডে। এখান থেকে এবার যেতে হবে হাসান, বত্রিশ মাইল। তার পর সেখান থেকে বাস্ বদলে যাব বেলুড়, চব্বিশ মাইল। সোজা পথে এই ছাপ্পান্ন মাইল যেতে ঘণ্টা চারেকের বেশী লাগবে না। সন্ধ্যার অনেক আগেই আমরা বেলুড় পৌঁছে যাব।

একখানি বাস্ এসে পড়লো। তারা বললো—আমাদের বাস্ বরাবর বেলুড় যাবে, পথে কোথাও নামতে হবে না। পথটা একটু ঘুরে গেছে সত্যি, কিন্তু সময় লাগবে একই।

তাদের সব কথা বুঝলাম না, দুর্বোধ্য কানাড়ীর মধ্যে টুকরো টুকরো হিন্দি যা পেলাম সেইটুকুর উপর ভরসা রেখে উঠে পড়লাম সেই বাসে। তখন বুঝি নি যে বাস্‌ওয়ালা আমাদের ধাপ্‌পা দিয়েছে। 'কালা আদ্‌মির' দেশে 'কালা বাজারটা' ব্যবসায়ের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। দুটো ধাপ্‌পা দিয়ে যদি ছ'জন যাত্রী পাওয়া যায় তো মন্দ কি! আগে মনে করতাম এটা বুঝি কলিকাতার ব্যবসায়ীদেরই একটা বিশেষ রোগ। কিন্তু তা নয়, স্বাধীন ভারতে এই রোগের ব্যাপকতা সর্বত্র।—কোন ব্যবসায়ীকে সরলভাবে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হবে।

সন্ধ্যার অনেক আগেই যেখানে পৌঁছানোর কথা, সেখানে গিয়ে পৌঁছালাম রাত সাড়ে সাতটায়।

বাসে স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হলো, সে মোটামুটি ইংরেজি জানে। আমাদের কথা শুনে সে হেসে বললো—এখানে কেউ কোন খবর রাখে না, কারও কথা শুনে চললেই ঠকে যাবেন। নিজেরা বুঝে, বিচার করে চলবেন। এখান থেকে সোজা পথে বেলুড় যাবার আলাদা বাস্ আছে—যা অনেক তাড়াতাড়ি যায়। এতগুলো যাত্রী হাতছাড়া না হয় সে জন্যেই ওরা সেটা চেপে গিয়ে এই চালাকি করেছে।

যুবক আরো বললো,—এখানকার হোটেলে থাকার চেয়ে ডাকবাংলোয় থাকাই ভালো, হোটেলে নানা অসুবিধা।

যুবকটি সঙ্গে করে আমোদের ডাকবাংলোয় পৌঁছে দিল।

সহসা ডাক-বাংলোয় জায়গা পাবার কথা নয়, অমরাও পেতাম না। তার উপর সেদিনই সেই ডাকবাংলোয় দালাই লামার আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসেন নি, কাজেই একপাশের একখানি ঘরে আমরা জায়গা পেয়ে গেলাম। পরিষ্কার, প্রশস্ত ঘর, সব রকম স্বাচ্ছন্দ্য বর্তমান। এক একখানি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সারাদিনের অবিশ্রান্ত ঘোরাঘুরির পর বেশ আরাম বোধ হলো। প্রভাস ও ক্ষিতীন বাবু তখনই দাড়ি কামাতে বসে গেলেন। ভবেশ ও রবীন গেল স্নান করতে। সুধীন জুতা-মোজা খুলে পায়ে হাত বুলাতে লাগলো, বললো—পায়ে ফোস্কা পড়েছে, আমি আর চলতে পারছি না।

ডাকবাংলোয় কাছেই হোটেল ছিল, খেয়ে এসে শুতে রাত দশটা বাজলো।

ঘুম ভাঙলো সকাল সাড়ে চারটায়। স্নানাদি সেরে সকলের তৈরী হতে লাগলো ছ'টা। কথা ছিল আগে হ্যালিবিদ যাব, সেখানকার মন্দির দেখে ফিরে আসবো বেলুড়ে। কিন্তু বাস্-স্ট্যাণ্ডে

এসে শুনলাম, সাড়ে আটটার আগে কোন বাস্ নেই। কাজেই, সূচির পরিবর্তন করে, বেলুড়টাই আগে দেখার ব্যবস্থা হলো।

মহীশূর রাজ্যের এই বেলুড়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম। বেলুড় বলতে আমরা বাংলাদেশের বেলুড় বুঝি। ভারতের ইতিহাসে এই অঞ্চলের নাম দোরসমুদ্র। পাঠান সুলতান কুতুব-উদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর দোরসমুদ্রের হোয়সাল রাজাদের পরাজিত করে তাঁদের রাজধানী লুঠে আনেন। থলি ভর্তি করে, ঘোড়া, উট, গাধার পিঠে বোঝাই করে অপর্যাপ্ত সোনা-রূপা-হীরে-জহরৎ নিয়ে আসেন দিল্লীতে। তারপর দোরসমুদ্রের কথা ভারতের ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেই দোরসমুদ্রের রাজধানী ছিল হ্যালিবিদ। মালিক কাফুরের লুণ্ঠনের পরে হোয়সাল রাজারা রাজধানী সরিয়ে আনেন বেলুড়ে।

তারপর এই অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো বিজয়নগর রাজ্য। বেলুড়ই হলো সে রাজ্যের রাজধানী। পাশে আরেক রাজ্য গড়ে উঠলো—ব্রাহ্মণী-রাজ্য। বিজয়নগরের হিন্দু রাজা ও ব্রাহ্মণী রাজ্যের মুসলমান সুলতানের মধ্যে বিরোধ চললো দিনের পর দিন—বছরের পর বছর ধরে। শেষে বিজয়নগরের দুর্বলতার সুযোগে ব্রাহ্মণীর সুলতান এ রাজ্যটি ধ্বংস করলেন। রাজা না থাকলে রাজধানীর প্রয়োজন থাকে না, অপ্রয়োজনে রাজধানীতে জনসমাগম হয় না। জনবিরল হলে অর্থাগম ও সমৃদ্ধিও লুপ্ত হয়। এখন বেলুড় একখানি গণ্ডগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন সেখানকার একমাত্র আকর্ষণ এই একটি মন্দির—চিন্ন কেশব-মন্দির।

সাড়ে আটশো বছর আগে এই মন্দিরটি তৈরী করিয়েছিলেন হোয়সাল রাজা মহারাজ বিষ্ণুবর্ধন, ১১১৭ খৃষ্টাব্দে। মন্দিরটির বিশেষত্ব এই যে মন্দিরের চূড়া বলে কিছু নেই। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরের মত নয়। যেন একখানি চতুষ্কোণ ঘর। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত চত্বরের মধ্যে একখানি পাথরের চতুষ্কোণ ঘর। তিন

দিকে তিনটি তোরণ, পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ। তিনটি তোরণের তিনটি নাম, পূর্ব তোরণ মহাদ্বার, উত্তর তোরণ স্বর্গদ্বার, দক্ষিণ তোরণ শুক্রদ্বার। মহাদ্বারই প্রধান তোরণ, সাততলা উঁচু গোপুরম্, ভিতরে ঢুকলেই সামনে গরুড়-স্তম্ভ। গরুড়-স্তম্ভের মাথায় ছোট একটি বিষ্ণুমূর্তি। তারপর প্রাঙ্গনটুকু পার হয়েই মন্দিরদ্বার। দ্বারের দু'পাশে দুটি ছোট মন্দির, তার একটির মধ্যে ভৈরব, অপরটির মধ্যে দুর্গামূর্তি। উত্তর ও দক্ষিণ দ্বারের দু'পাশেও এমনি দু'টি করে মন্দির আছে। উত্তর দ্বারের পাশে আছে বিষ্ণু ও মহিষমর্দিনীর মন্দির, দক্ষিণ দ্বারের দু'পাশে তাণ্ডবেশ্বর ও ব্রাহ্মণী-মন্দির।

মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করার আগে মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের কারুকাজের কথা বলতে হয়। দেয়ালের আগাগোড়া স্তরে স্তরে কারুকাজ। মোটামুটিভাবে আটটি স্তর, নীচে থেকে উপর অবধি চলে গেছে। কে যেন চিত্র-বিচিত্র করা আটটি চওড়া পাথুরে ফিতে দিয়ে মন্দিরটিকে মুড়ে দিয়েছে। প্রথম, নক্সার কাজ; দ্বিতীয়, মূর্তি; তৃতীয়, আবার নক্সা; চতুর্থ, ঝালরের কাজ; পঞ্চম, যষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সারিতে সবই মূর্তি—রামায়ণ-মহাভারতের অজস্র চিত্র, পৌরাণিক মূর্তি, রাজদরবারের ছবি, গান-বাজনার আসরের ছবি, নর্তকী ও নরনারীর ছবি, শিকারের ছবি, পশুপাখীর ছবি,—সব কিছু নিখুঁত ভাবে খোদাই করা আছে পাথরের গায়ে। তা ছাড়া এক সারি পাথরের গায়ে ঝালরের কাজ করা আছে, যা দিয়ে মান্দরের মধ্যে আলো যায়, কোন গবাক্ষের প্রয়োজন করে না।

তারপর মন্দিরের ভিতরের কথা। ভিতরে কয়েকটি থামের উপর ছাদ। থামের গায়ে নানা কারুকাজ। থামগুলি গঠনের ধরণ সাধারণ থামের মত নয়। মনে হয় যেন কয়েকখানি ছোটবড় পাথরের চাকা পর পর বসিয়ে থাম করা হয়েছে। নরসিংহ-স্তম্ভ নামে একটি থাম আছে যার চাকাগুলি ঘুরিয়ে দেওয়া চলে। সেই থামটির গায়ে একটি অতি ছোট—অতি সৌখীন বৃষমূর্তি খোদাই করা

আছে। সেটির আকার একটি সাধারণ ছোলার মত। আকারে অত ছোট হলেও কাজের কোন ত্রুটি নেই।

মূল গর্ভগৃহে বিষ্ণুর মূর্তি—বিজয় নারায়ণ। ছ' ফুট উঁচু, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কালো পাথরের নারায়ণ-মূর্তি। মাথার চারিপাশে চালচিত্রের মত দিব্য-প্রভা, তার মধ্যে দশ অবতারের চিত্র খোদাই করা।

দেব দর্শন করে আমরা মন্দিরের ভিতরটা আর বাইরেটা আর-একবার ভাল করে দেখে নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। কারু-কাজের এমন নিদর্শন ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

মন্দিরের ভিতরে আর বাইরে শুধু মূর্তি আর মূর্তি, কত যে মূর্তি দেখলাম তার সংখ্যা নেই, তবু তারই মধ্যে কয়েকটা মূর্তি মনে রাখার মত। দক্ষিণ দ্বারের পাশে প্রহ্লাদের উপর হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার ও নরসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুর বধ; পিছনের দেয়ালে হরিহর মূর্তি, কালীর তাণ্ডব নৃত্য, রাবণের কৈলাস উত্তোলন, মহিষাসুর-মর্দিনী, সপ্তাশ্ব-রথে সূর্য-নারায়ণ, বামন অবতার ও বরাহ অবতার; উত্তরের দেয়ালে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ, বিষ্ণুর অনন্তশয্যা; এই সব অপূর্ব শিল্পসৌকার্যসম্মত দেবদেবী ও পৌরাণিক মূর্তিগুলির আশেপাশে শিল্পী বহু নয়নাভিরাম মূর্তিও সৃষ্টি করে গেছেন। সেগুলির উল্লেখ না করলে এখানকার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। এগুলি সাধারণ নরনারীর মূর্তি। একটি মেয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে, একটি মেয়ে ছবি আঁকছে, একটি মেয়ে দর্পণে মুখ দেখছে, একটি মেয়ে পিচকারী দিয়ে দোল খেলছে, একটি মেয়ে চুল বাঁধছে, একটি মেয়ে ফুল কুড়ুচ্ছে, একটি মেয়েকে কাঁকড়া-বিছে কামড়েছে, একটি মেয়ের পায়ের আঙুলে একজন আংটি পরিয়ে দিচ্ছে, একটি মেয়ে হাতের আংটি নেড়েচেড়ে দেখছে, এক মেয়ে বীণা বাজিয়ে নাচছে, এক মেয়ে বাঁশী বাজিয়ে নাচছে ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্দিরমধ্যে খিলানের উপর একটি নারীমূর্তি। মেয়েটির বাঁ কাঁধের উপর একটি শুকপাখী বসে আছে, ঠোঁট দিয়ে ধরে আছে তার কণ্ঠহারটি। মেয়েটির ডান হাতে একটি কঙ্কন, সে কাঁকনটি ইচ্ছামত উপর-নীচে করা যায়। এই সব মূর্তির চোখে-মুখে জীবন্ত মানুষের ভাব-ব্যাকুল কমনীয়তা মাখানো।

মন্দিরমধ্যে চক্রাকার থামের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সেগুলি ছাড়া কোণ-তোলা থামও আছে—চার কোণ, আট কোণ, ষোলো কোণ, বত্রিশ কোণ থামও আছে। আর আছে পদ্মের মত পাপড়ি-কাটা থাম। এই সব থামের উপরে ও নীচে অপরূপ কারুকাজ, আল্‌পনা ও মূর্তি খোদাই করা আছে।

মন্দির-চত্বরে আরো তিনটি মন্দির আছে। একটি বীর নারায়ণের, দ্বিতীয়টি অণ্ডাল দেবীর, তৃতীয়টির নাম 'কাপ্পে চন্নিগারায়া'। এই তৃতীয় মন্দিরটির সঙ্গে সে যুগের স্বনামধন্য শিল্পাচার্য জনকাচার্যের জীবনের একটি করুণ কাহিনী জড়িয়ে আছে।

এই অঞ্চলের অধিকাংশ মন্দিরের শিল্পকর্মের পরিকল্পনা করেছিলেন সে যুগের রাজশিল্পী জনকাচার্য। মন্দির-মধ্যের বিগ্রহ জনকাচার্য নিজের হাতে তৈরী করতেন। কাপ্পে চন্নিগারায়া মন্দিরের বিষ্ণুমূর্তি তিনিই নিজের হাতে খোদাই করতে সুরু করলেন। মূর্তি সম্পূর্ণ হলো। মন্দির-মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আগে শিল্পীর পুত্র ওঙ্কনাচার্য ভাল করে মূর্তিটি দেখতে গিয়ে দেখতে পেল মূর্তির এক জায়গায় একটি ফাটল রয়েছে। একটু নাড়াচাড়া করতেই সেই ফাটলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি ব্যাঙ। ব্যাঙ তো আর পাথর কেটে গর্ত করে নি, ফাটলটা আগে থেকেই ছিল, কিন্তু এতো বড় একটা ত্রুটি জনকাচার্যের মত শিল্পীর নজরে পড়ে নি! দিনের পর দিন এই পাথর কেটে তিনি মূর্তি গড়েছেন, আর এটা দেখেন নি, তাঁর ছেলের এক দণ্ডে যা নজরে পড়লো? এ সব

তো হবার কথা নয়! ক্ষোভে দুঃখে শিল্পাচার্য ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝলেন, তাঁর অন্তরে অহঙ্কার দেখা দিয়েছে, বড় শিল্পী বলে জেগেছে আত্মাভিমান, সেই জন্যই বোধ হয় কেশব তাঁকে এই ভাবে আঘাত দিলেন। নারায়ণ বুঝিয়ে দিলেন 'অহং' বলে কিছু নেই, তাঁর করুণা ছাড়া মানুষ কিছুই করতে পারে না, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটি অবধি নড়ে না। জনকাচার্য স্থির করলেন—আর মূর্তি তিনি গড়বেন না, ছেদক ও হাতুড়ি আর ধরবেন না। কিন্তু কাজ করবো না বললেই তো মুক্তি মেলে না। নিজ গ্রামে 'কৈদালা'-এ এক কেশব মন্দির করার জন্য শিল্পাচার্যের ডাক পড়লো। কোন ওজর-আপত্তি কেউ শুনলো না,—মন্দির করতেই হবে। কিন্তু শিল্পাচার্য স্থিরসংকল্প, হাতুড়ি তিনি আর ধরবেন না। শেষ পর্যন্ত নিজের ডান হাতখানি তিনি কেটে ফেললেন। ভক্তির হোমাগ্নিতে শিল্প-শক্তি আহুতি পড়লো—শিল্পাচার্যের শিল্পসৃষ্টি চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল।

মন্দির দেখা শেষ করে যথাসময় আমরা বাস্‌স্ট্যাণ্ডে ফিরে এলাম। কিঞ্চিৎ জলযোগ সেরে নিয়েই এবার হ্যালিবিদ যাত্রা।

বেলুড় থেকে হ্যালিবিদ মাত্র দশ মাইল পথ। বাসে যেতে লাগে মাত্র আধ ঘণ্টা, ভাড়া মাত্র চার আনা।

হ্যালিবিদের প্রাচীন নাম দ্বারসমুদ্র। আরো পুরানো যুগের নাম দ্বারাবতীপুর। হোয়সাল রাজাদের এইটাই ছিল রাজধানী। তিনশো বছর ধরে এই রাজবংশ রাজত্ব করেছিলেন এবং এখানকার সমৃদ্ধি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সেই সমৃদ্ধি রক্ষা করার জন্য যে বীর্যবত্তার প্রয়োজন ছিল তা গড়ে ওঠে নি। খৃষ্টীয় ১৩১০ সালে অতি সহজেই পাঠান সেনাপতি মালিক কাফুর এই নগর আক্রমণ করে লুঠ করে, এবং যে সোনাদানা সে লুঠে নিয়ে যায় তাতে তার লোভ বেড়ে যায়। পনেরো বছর পরে ১৩২৬ সালে আবার

সে আসে লুঠ করতে। সেবারও এখানকার বাসিন্দারা আত্মরক্ষা করতে পারলো না। প্রথম বারের আক্রমণ সহে যদি-বা কোন মতে তারা টিঁকে ছিল, দ্বিতীয় বারের আক্রমণে তারা চিরদিনের মত বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এখন যা আছে তা শুধু একখানি গ্রাম মাত্র। রাজধানীর পূর্বসমৃদ্ধির কোন স্বাক্ষর নেই, শুধু সেই গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে পুরানো তুটি মন্দির।

ভারতের হিন্দু জাতির ইতিহাস সর্বকালেই এই একই রকম। শক্তিকে বাদ দিয়ে ভক্তিই শুধু বড় হয়ে উঠেছে, কোথাও-বা ভক্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি শুধু ধর্ম ও মনুষ্যত্বের কথাই বলেছেন, শক্তি ও মর্যাদাবোধের কথা বলেন নি। সেই অবসরে নিম্নস্তরের সুযোগসন্ধানীদের হীন স্বার্থবোধ জাতিকে অবনমিত করেছে। এই ধারা অবিচ্ছিন্ন এবং অত্যাবধি অব্যাহত।

বাস থেকে যেখানে আমরা নামলাম, মন্দির তার কাছেই। জনবিরল জনপদের এক পাশে ম্লান তুটি মন্দির। হোয়সালেশ্বর ও কেদারেশ্বর। মন্দির তুটি বেলুড়ের মন্দিরের চেয়ে বড়। কারুকাজ বেলুড়ের চেয়ে কম নয়, বরং সূক্ষ্ম কাজ আরও বেশী বলে মনে হয়।

হোয়সালেশ্বরের মন্দিরটি ধূসর রঙের নরম পাথরের তৈরী। এই পাথর এক জাতীয় 'সোপ স্টোন'। গোড়ায় নরম থাকে, শিল্পীর কাজের সুবিধা হয়। তার পর রোদ-হাওয়ায় কঠিন হয়ে যায়। কেউ বলেন—এই মন্দিরটি তৈরী করিয়েছিলেন মহারাজ বিষ্ণুবর্ধন। আবার কেউ বলেন—মহারাজ নরসিংহ এর নির্মাতা। অবশ্য তু'জনের রাজত্বকালের তফাৎ মাত্র কুড়ি বছরের। তু'জনেই দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে রাজত্ব করে গেছেন। তা সে যিনিই করুন, যে কোন কারণেই হোক মন্দিরটি তিনি সম্পূর্ণ করেন নি, হয়তো করার মত অবসর পান নি।

হোয়সালেশ্বর মন্দিরটির চারটি তোরণ,—পূর্বে তু'টি আর উত্তর দক্ষিণে এক একটি। শিবমন্দির। ভিতরে তু'টি শিবলিঙ্গ আছে।

বাইরের চত্বরে আছে ছু'টি বৃষমূর্তি। এই বৃষমূর্তিগুলি আকারে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় ছোট,—আট ফুট উঁচু আর তেরো ফুট লম্বা। কিন্তু কারুকাজের দিক থেকে কারও চেয়ে ন্যূন নয়।

আসল দর্শনীয় কারুশিল্প মন্দিরের দেয়ালে। তবকে তবকে কারুকাজ। এক একটি তবক যেন এক একটি ছবি-আঁকা ফিতে, ফিতের পর ফিতে দিয়ে মন্দিরটিকে বেষ্টন করা হয়েছে। সব চেয়ে নীচে প্রথম সারিতে শুধু হাতী,—নানা ধরণের নানা ভঙ্গীর হাতী। তার উপরের সারিতে শুধু সিংহ। তৃতীয় সারিতে নক্সার কাজ। চতুর্থ সারিতে ঘোড়-সওয়ার। পঞ্চম সারিতে আবার নক্সার কাজ। ষষ্ঠ সারিতে পৌরাণিক দৃশ্যাবলী। সপ্তম সারিতে মকর। অষ্টম সারিতে বলাকা। নবম সারিতে মূর্তি। দশম সারিতে একটি করে সিংহ ও একটি করে মানুষ পর পর সাজানো। তার উপর ঝালরের কাজ,—মোটা পাথর কেটে বহুছিদ্রযুক্ত পর্দা তৈরী করে দেয়ালে গাঁথা হয়েছে, যাতে সেই ছিদ্রপথে মন্দির মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারে। ঝালরের উপরেই কার্ণিশ। কার্ণিশের কোণে কোণে সুদৃশ্য মূর্তি বসানো আছে। কোন উৎসাহী দর্শক নবম সারি ও এই কার্ণিশের মূর্তিগুলি গণনা করেছিলেন,—মোট ২৮১টী মূর্তি আছে। তার মধ্যে কার্তিক, গণেশ, পার্বতী, উমা, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হরিহর, বরাহ অবতার, নৃসিংহ অবতার, বামন অবতার, বেণুগোপাল, ইন্দ্র, সূর্য, গরুড়, ভৈরব প্রভৃতির মূর্তি আছে। সরস্বতীর বসা ও দাঁড়ানো ছু' রকম মূর্তিই দেখা গেল।

দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও দেয়ালে রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক দৃশ্যও বহু আছে। রাম-রাবণের যুদ্ধ, কর্ণার্জুনের যুদ্ধ, ক্ষীরসমুদ্র মন্থন ও কৃষ্ণলীলার নানা দৃশ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ নরনারী ও সাধারণ জীবনের চিত্রও আছে। পুরুষ মূর্তির গায়ে রয়েছে কোট ও কোমরবন্ধ, ঘোড়সওয়ারের পায়ে রয়েছে বুট

জুতো, নর্তকীর পরনে রয়েছে ব্রিচেস্—সে যুগের এই উন্নত ধরণের বেশভূষা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হোয়সালেশ্বরের পাশে কেদারেশ্বরের মন্দির। এটি নির্মাণ করেন চালুক্য বংশের মহারাজ বীরবল্ল ও রাণী অভিনব-কেতলা দেবী। খৃষ্টীয় ১২১৯ সালে মন্দির সম্পূর্ণ হয়। মালিক কাফুর দ্বারসমুদ্র লুণ্ঠন করার ন' বছর পরে।

এই মন্দিরটির একটি বিশেষত্ব তার বাইরের কারুকাজে। যে চতুষ্কোণ চত্বরের উপর মন্দিরটির ভিত্তি, তার কোণে কোণে এমন ভাবে হাতীর মূর্তি বসানো আছে যেন হাতীর পিঠের উপরেই মন্দিরটি স্থাপিত। এই স্থাপত্য-রীতি ইলোরার কৈলাস-মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখানকার দেয়ালের কারুকাজ হোয়সালেশ্বর মন্দিরেরই অনুরূপ। তবে এখানকার মূর্তিগুলি আরো ছোট ও কারুকাজে আরো সূক্ষ্ম। আগের মন্দিরে আমরা যা-কিছু দেখেছি এখানেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এখানকার মূর্তিগুলিও উৎসাহী দর্শকেরা গুণে দেখেছেন—১৭৬টি। মাঝে মাঝে মূর্তির জায়গা ফাঁক রয়েছে, তাতে অনেক মূর্তি হারিয়ে গেছে বলে লোকে অনুমান করে।

মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে সেই চক্রাকার থাম ও ছাদে দেবদেবীর মূর্তি ও ফুলের নক্সা।

এই সব মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে কারুকাজের তারতম্য লক্ষ্য করলে একটা কথাই মনে হয়,—তখনকার শিল্পীরা মন্দিরের ভিতরের চেয়ে মন্দিরের বাইরেই মানুষকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন বেশী। কিন্তু কেন? ভিতরের স্বল্পালোকের চেয়ে বাইরের আলোকে কারুকাজ ভাল করে চোখে পড়বে বলে? অথবা ভারতের অন্তর্মুখী মন তখন বহির্মুখী হয়ে পড়েছিল, অন্তর্জগতের পরম আত্মজিজ্ঞাসা ছেড়ে ভারতবাসী কি তখন বাইরের বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছিল? না হ'লে দেবদেবীর পাশে মানুষের

বিলাসের বহু চিত্র এই সব মন্দিরের গায়ে স্থান পাবে কেন? এইখানেই হয়তো হিন্দুশক্তির বিনাশের মূল বীজ লুকিয়ে আছে।

মন্দিরের পাশেই এক বিরাট দীঘি,—বিষ্ণুসাগর। সাগরই বটে! কলিকাতার ঢাকুরিয়া লেকের চেয়ে বহুগুণ বড়। পুরানো পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি ও প্রশস্ত সুদৃশ্য চত্বরের ধ্বংসশেষ পূর্বগৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে। বর্তমান বিজ্ঞান-যুগে কলিকাতার মত নগরে বালিগঞ্জ ও বেলেঘাটায় দু'টি লেক কাটাতেই আমাদের জীবন কেটে গেল, সে-যুগে এই সাগর কাটাতে কত জীবনের কত বছর কেটেছিল কে জানে!

হ্যালিবিদের চারিপাশে শত শত জৈন মন্দির ছড়িয়ে আছে। এখানে আগে জৈনদের একটি প্রাধান ধর্মকেন্দ্র ছিল। এই মন্দিরগুলি হোয়সাল রাজাদের আমলের আগে তৈরী। তখনকার রাজারা ছিলেম জৈনধর্মী। হোয়সাল রাজারা জৈনধর্ম ছেড়ে বৈষ্ণব হন তারপর এখানকার বিষ্ণু ও শিবমন্দির তৈরী হয়। কাছাকাছি একটি পুরানো মন্দির আছে পার্শ্বনাথের। তার পাথরের থামগুলি এমন ভাবে পালিশ করা যে দর্পণ বলে ভুল হয়, কেউ সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তার মুখের ছায়া পড়ে আয়নার মত। এতদিনেও তা ম্লান হয়নি।

চারিপাশে অনেক স্তূপ, অনেক ঢিবি। পুরানো মন্দির ও অট্টালিকার এ সব ধ্বংসাবশেষ। এখানে এক সময় বড় বড় ধনী বণিক্ ও রাজকর্মচারীদের প্রসাদ ছিল; রঙ্গনাথ, বীরভদ্র, পঞ্চলিঙ্গ প্রভৃতি দেবমন্দির ছিল। বিধর্মীরা ভেঙেছে, লুঠ করেছে; স্বধর্মীরা শক্তি দিয়ে দেবতা, ধর্ম ও সম্পদ্ রক্ষা করতে পারে নি। একদল জিতেছে, একদল হেরেছে। এক দলের হতাশা, আর এক দলের উল্লাস। একদল পেলো, আর এক দল হারালো। কিন্তু কি পাওয়া গেল আর কি হারালো? এতো মারামারি কাটাকাটি

কিসের জন্য ? রাজ্য চাই, সম্পদ্ চাই। সব আমার চাই, আমার জন্য এই পৃথিবী। কিন্তু সেই পৃথিবী তো আজও আছে। সে-ই মাটি, সেদিনও যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সেই সোনা-রূপা, হীরে-জহরৎ এখনও পাওয়া যাবে, কিন্তু সেই মানুষগুলো আজ কোথায় গেল ? যারা এইসব চেয়েছিল ও পেয়েছিল, সে-ই মালিকানার হিসাব আজ কে নেবে ? মালিক কাফুর আজ কোথায় ? তার ধর্মবিশ্বাস, তার শক্তির ঔদ্ধত্য, তার সম্ভ্রমের অহংকার, তার সম্পদের তৃষ্ণা তাকে কী দিয়ে গেল ? আজ কোথায় তার সৈন্য ? কোথায় তার সম্পদ্? কোথায় তার সেনাপতির সম্মান ? একমুঠো সোনা, একখানি ঝক্ঝকে পাথর মানুষ এক হাত থেকে আর-এক হাতে টেনে নেবার জন্য উগ্র আবেগে মেতে ওঠে। যে কেড়ে নেয় সে-ও আবার সেটীকে ফেলে রেখেই নিঃশব্দে সরে পড়ে। সোনা ও পাথর দুই-ই রয়ে যায়। অবার পরের মানুষ মেতে ওঠে সেই সোনা দিয়ে পাথরের দাম কষতে। অনাদিকাল থেকে মানুষ এই খেলা দেখছে, তবু বোঝে না, বুঝতে চায় না,—জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সম্পদের এই খেলাতেই মেতে থাকে।

> "পৃথ্বীমমেয়ং সকলা মমৈষা মমান্বয়স্যাপি চ শাশ্বতেয়ম্।
> যো যো মৃতো হ্যত্র বভূব রাজা কুবুদ্ধিরাসীদিতি তস্য তস্য॥
> পৃথ্বীমমৈষাশু পরিত্যজৈনাং বদন্তি যে দূতমুখৈঃ স্বশত্রুম্।
> নরাধিপাস্তেষু মমাতিহাসঃ পুনশ্চ মূঢ়েষু দয়াভ্যুপৈতি॥"

[—বিষ্ণু পুরাণ

'এই পৃথিবী আমার, এর সব কিছুই আমার, আমি চিরদিন এই সব ভোগ করবো'—এই কথাটাই প্রতি রাজা ভেবেছেন, আজ তাঁরা সকলেই মৃত। কত রাজাই দূত পাঠিয়ে শত্রুকে জানিয়েছেন,—'এই রাজ্য আমাকে ছেড়ে দাও, এই পৃথিবী আমার।' বার বার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তাঁদের এই মূঢ়তা করুণার দাবী

করে। কিছুই তো স্থায়ী নয়, মানুষ চোখের উপর তা দেখে, তবু শেখে না ; বার বার একই ধারার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।

"তপ্তং তপো যৈঃ পুরুষপ্রবীরৈরুদ্বাহুভির্বর্ষগণাননেকান্।
ইষ্টাশ্চ যজ্ঞা বলিনোতিবীর্যাঃ কৃতাস্তু কালেন কথাবশেষাঃ॥
যে সাম্প্রতং যে চ নৃপা ভবিষ্যাঃ প্রোক্তা ময়া বিপ্রবরোগ্রবীর্যাঃ।
যে চে তথান্যে চ তথাভিধেয়াঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি যথৈব পূর্বে॥"

শুধু রাজা মহারাজাই নয়, মহাতপস্বী—উর্ধ্ববাহু হয়ে বহুবর্ষ যিনি তপস্যা করেছেন, মহাযাজ্ঞিক—কল্যাণ কামনায় যিনি বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন, এবং মহাশক্তিমান্ যোদ্ধা, কারও পরিণামে কোন পার্থক্য ঘটে নি। সকলেরই মৃত্যুশেষে আছে শুধু কথাবশেষ। যাঁরা বর্তমানে আছেন, ভবিষ্যতে যাঁরা হবেন, সেই সব সন্ন্যাসী ও শক্তিমান্‌রা অতীত ধারারই পুনরাবৃত্তি করে যাবেন। আগে যা ঘটেছে পরেও তাই ঘটবে। ধরিত্রীদেবী তাই জনসমাজকে আত্মচেতনা দিচ্ছেন—'কিছুই নিজের বলে মমতা ক'রো না। সন্তান পিতামাতা থেকেই জন্মগ্রহণ করে সত্য, কিন্তু পিতামাতার অনুভূতির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। পিতামাতার কাছ থেকে পেয়ে থাকলেও তাদের শরীর ও মন ভিন্ন। নিজের দেহটীও দেহধারীর নিজের নয়, এটাকে রেখেই একদিন চলে যেতে হয়। প্রকৃত জ্ঞানী সেই জন্য নিজের বলে কিছু মনে করেন না।'

"এতদ্বিদিত্বা ন নরেন কার্যং মমত্বমাত্মন্যাপি পণ্ডিতেন।
তিষ্ঠন্তু তাবৎ তনয়াত্মজাদ্যাঃ ক্ষেত্রাদয়ো যে তু শরীরতোঽন্যে॥"

সারা ভারত জুড়ে তার প্রাচীনতম ঐতিহ্য থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই একই ইতিহাস—'কৃতাস্তু কালেন কথাবশেষাঃ।'

এবার ফেরার পালা।

ইচ্ছা ছিল আর একটু এগিয়ে গিয়ে যোগ-প্রপাত দেখে যাব। এমন জৌলুষ আর কোন প্রপাতের নেই বলে শুনেছি। কিন্তু তা আর হলো না।

প্রভাস বললে,—ছুটী নেই।

সুধীন বললো,—আমি এখান থেকেই ফিরবো।

রবীন বললো,—আমি যাব পণ্ডিচেরি।

ক্ষিতীনবাবু অবশ্য বললেন,—আমি কলেজে ছুটীর ব্যবস্থা করে এসেছি, তবে 'মাসিক রামধনুর' কাজ জমে আছে। আপনারা যা খুসি ঠিক করুন, আমি সবেতেই রাজী।

বাকি আমরা দু'জন,—ভবেশ ও আমি। শেষ পর্যন্ত ফেরাই ঠিক হলো।

এবার কাহিনী বাঙালুর থেকে বেলুড়ের নয়—বেলুড় থেকে বাঙালুরের। (অবশ্য এ বেলুড় কলিকাতার পাশে রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড় নয়—মহীশূর রাজ্যের বেলুড়।) হ্যালিবিদ থেকে বেলুড়ে এসে বাস ধরা হলো—একেবারে সোজা বাঙালুর।

সরকারী বাস। বাঙালুর অবধি যাবে, কিন্তু টিকিট কিনতে হবে দু'বার। একবার হাসান অবধি, পরের বারে বাঙালুর অবধি। আমরা হাসান অবধি টিকিট কেটে বাসে উঠলাম।

কিন্তু হাসান অবধি যাবার আগেই বাসের মধ্যে একটা গোলযোগ ঘটে গেল। কণ্ডাক্টার কোন যাত্রীর কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে টিকিট দেয় নি, মাঝপথে চেকার এসে সেইটে ধরলেন। অনেক লেখা-পড়া ও বকাবকি হলো। ভাষা বুঝলাম না, তবে এটুকু বুঝলাম যে কণ্ডাক্টারের চাকরিটা যাবে। হাসানে এই নিয়ে অনেকখানি সময় নষ্ট হলো।

হাসান থেকে বাস ছাড়ার পর কণ্ডাক্টারকে বললাম,—নতুন টিকিট কেটে নাও।

কণ্ডাক্‌টার আমাদের কথায় কান দিলে না। চুপ করে বসে রইল এক কোণে।

তিন-চারবার ভবেশ ডাকলো, কিন্তু সে এলো না। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললো, আমরা বুঝলাম না।

সুধীন বললো,—যখন চাইবে তখন দেবো, এত তাড়া কিসের? নামবো তো সেই সন্ধ্যাবেলা।

আমরা চুপ করে গেলাম। বাস চললো।

সন্ধ্যাবেলা আর-একজন চেকার উঠলো, বললো,—আপনারা টিকিট করেন নি কেন?

বললাম,—ক'বার বলেছি, টিকিট নেয় নি। আপনি নেবার ব্যবস্থা করুন।

—টিকিট করে বাসে ওঠার নিয়ম, এখন তো আপনাদের টিকিট দেওয়া যাবে না। এতখানি পথ ফাঁকি দিয়ে এসেছেন বলে আমি ধরবো।

—ফাঁকি দিলাম কি করে? বেলুড় থেকে হাসান অবধি টিকিট নিয়েছি, হাসানে টিকিটের জন্য বলেছি, শোনে নি। আমাদের দোষ কোথায়?

—আপনাদের কথা ও বুঝতে পারে নি।

—যদি সে ইংরেজি বা হিন্দি না বোঝে, তা হ'লে আমরা কি করবো?

—রীতিমত লেখাপড়া শিখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে কেউ বাসের কণ্ডাক্‌টার হতে আসে না। নিজের মাতৃভাষা সে ভালভাবে বলতে পারে, বুঝতে পারে,—এই যথেষ্ট!

—তা হ'লে বাইরের যাত্রীরা কি করবে?

—সে ভাবনা আমার নয়। চলুন, আপনাদের থানায় যেতে হবে।

বাস থামলো। পুলিশ এসে পড়লো। চেকার এমন-একটা ভাব

দেখালো যেন আমরা মহা-অপরাধ করে ধরা পড়ে গেছি। বললো,—নেমে আসুন, চলুন থানায়।

আমরা হাসিমুখে কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললাম,—আমরা নামবো না। যা হয় বাঙালুরে গিয়ে হবে।

—আপনাদের নামতে হবে, না হ'লে বাস ছাড়বে না।

বাসশুদ্ধ যাত্রী আমাদের উপর মারমুখো হয়ে উঠলো—দু'-চারটে গালাগালিও যেন কানে এলো। হয়তো বললো,—এরা সব ঠকাতে এসেছে,—বাঙালী ঠক্, গবর্মেণ্টকে বাসভাড়া ঠকিয়েছে, …নেমে যাও,থানায় যাও,—ইত্যাদি।

পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। কিন্তু মাঝপথে সেই অচেনা জায়গায় আমরা বাস থেকে নামবো না, এ সম্পর্কে আমরা দৃঢ় রইলাম। এ বাস ছাড়লে আমরা ট্রেন ধরতে পারবো না, তা ছাড়া পাড়াগাঁয়ের থানা আর তার দারোগা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ভালো নয়,—তার উপর যে রাজ্য এই ক'দিন আগেও সামন্ত-রাজ্য ছিল সেখানকার পুলিশ সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে পড়লেন, বললেন,—ব্যাপার কি?

চেকার অনেক কথা বললো—মাতৃভাষায়, আমরা বললাম ইংরেজিতে। তাঁর পরণে খদ্দর ও গান্ধীটুপি দেখে বুঝলাম তিনি একজন পদস্থ সম্মানীয় ব্যক্তি। ভালো ইংরেজি জানেন। আমাদের সব কথা শুনে তিনি মধ্যস্থ হয়ে একটা রফা করে দিলেন—কয়েক মিনিটের মধ্যে সব মিটে গেল—ভাড়া জমা হয়ে গেল, বাস ছেড়ে দিল। মূর্খের মূঢ়তা অতি তুচ্ছ একটা ব্যাপারকে কী গুরুতর করেই তুলছিল!

পরে পরিচয় হলো, তিনি সেখানকার সমবায় প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা। হেসে বললাম—ভারতসরকার দেশভ্রমণের উৎসাহ

জাগাতে চান, কিন্তু এখানে যে ব্যাপার দেখলাম তাতে সে-উৎসাহ তো পাওয়া যায় না। ভারতের অন্যত্র কোথাও তো এমন ভাবে ঠেকতে হয় নি।

ভদ্রলোক হেসে বললেন,—কিন্তু এদের নিয়েই তো আমাদের এখন চলতে হবে। ধীরে ধীরে উন্নতি হবে।

বাঙালুরে এসে যখন পৌঁছলাম তখন হাতে সময় আছে মাত্র আধঘণ্টা। তখনই স্কুটার ছুটিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছলাম। তিনজন গেলাম ট্রেনে জায়গা করতে, আর তিনজন 'লেফ্‌ট্ লাগেজে' মাল ছাড়াতে।

কিন্তু ট্রেনের অবস্থা দেখে আমরা চমকে উঠলাম। কোথাও কোন স্থান নেই। তবুও ওরই মধ্যে একটা কামরায় কোন রকমে একটু দাঁড়াবার জায়গা করে নিলাম। ওরা যখন 'লেফ্‌ট্ লাগেজ' থেকে আমাদের স্যুটকেসগুলি নিয়ে এলো, তখন সেগুলি পেতে আমরা তার উপর বসলাম। ট্রেন ছাড়তে তখন আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। সেই সময় আশপাশের কামরা থেকে হৈ হৈ করতে করতে একদল ছোকরা এসে উঠলো আমাদের কামরায়। আমাদের অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠলো।

কিন্তু এদের এত হৈ-চৈ করার কারণটা কি? জিজ্ঞাসা করায় ছোকরা দলের একজন হি-হি করে হেসে বললো,—ফিল্ম-স্টার! ফিল্ম-স্টার!

তার নির্দেশে এবার আমাদের নজরে পড়লো—কামরার শেষ প্রান্তে তিনটি মেয়ে বসে আছে। তাদের সাজসজ্জার আড়ম্বর ও আদবকায়দা দৃষ্টিকটু। তাদের আশেপাশে ছোটবড় নানা বাক্‌স, ক্যামেরা, লাইটের সরঞ্জাম প্রভৃতি অর্ধেক কামরা দখল করেছে। সেই জন্যই কামরায় স্থানাভাব। তার উপর তাদের দর্শনার্থীর দল আছে। কিন্তু বিস্মিত হলাম এই ভেবে, যে, তৃতীয় শ্রেণীতে ফিল্মস্টার!

আমরা কলিকাতায় যে ধরণের ফিল্মস্টারদের সঙ্গে পরিচিত, সে রুচি ও ভব্যতা এই দলের মধ্যে দেখলাম না। কলিকাতায় পড়ায় পাড়ায় রোয়াকে বসে যেমন ছেলেরা সকাল-সন্ধ্যা আড্ডা দেয়, এদের চালচলন সেই পর্যায়ের। হাল্কা হাসিঠাট্টার মধ্যে তারা যে উদ্দামতার পরিচয় দিচ্ছিল তাতে তারা কি করে শিল্প-সৃষ্টি করতে পারে তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। অবশ্য তা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। যাদের যেমন সংস্কৃতি তাদের শিল্পীও সেই রুচির হবে। কিন্তু এই তৃতীয় শ্রেণীর ফিল্মস্টারদের ধাক্কা সামলাতে হলো সারারাত। কোন রকমে স্যুটকেসের উপর বসেই রাত কাটলো। হয়তো আর-একটু স্থান পাওয়া যেত, কিন্তু কথা বলার তো উপায় নেই! এখানে ইংরেজি ও হিন্দি তো কেউ বুঝবে না! এই কানাড়ী রাজ্যে বার বার বুঝেছি, একটা সর্বভারতীয় কথ্যভাষা থাকা কত প্রয়োজন। ইংরেজি সে-ভাষা হতে পারে না, কারণ তা সহজবোধ্য ও সহজশিক্ষা নয়। হিন্দুস্থানি ভাষার উপযোগিতা সেদিক থেকে সবচেয়ে বেশী। উত্তর ভারতে সে ভাষা সর্বত্র চলে, দক্ষিণের কোন কোন অংশে তা বোঝে, বাকি অংশটায় চলার ব্যবস্থা করলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হয়। সবাইকে যে দিগ্‌গজ পণ্ডিত করে তুলতে হবে এমন কোন কথা নেই, সাময়িক ভাবে দু'-চার মাস ক্লাস করে ভাষাটাকে চলনসই শিখিয়ে নিতে হবে—বোঝার মত ও বোঝাবার মত করে। তাতে অবশ্য ইংরেজির মূল্য কমবে, এবং ইংরেজি-শেখা মাতব্বরির মূল্যও কমবে। সেদিক থেকে সুবিধাবাদীরা বাধা দেবেই। কিন্তু সাধারণ ভারতীয়ের সুবিধার ব্যাপার মুষ্টিমেয়ের প্রতিবন্ধকতায় ব্যাহত হওয়া উচিত নয়।

হিন্দুস্থানি ভাষার প্রচলনে বাংলা ভাষাভাষীদের শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। কারণ বাঙালীরা বাংলাদেশেই নিজেদের ভাষা চালাতে চায় না। বাংলার ইস্কুলে বাঙালী হেড-মাস্টারের কাছে

বাঙালী অভিভাবক ইংরেজিতে চিঠি লেখেন। বাঙালী আপিসে বাঙালী উপরওয়ালার কাছে বাঙালী অধস্তনেরা ইংরেজিতে লেখাপড়া করেন। যাদের আমরা অনুকরণ করি, সেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা জার্মানীর ইস্কুল-আপিসে এমনি ভাবে বিদেশী ভাষার প্রয়োগ করা হয় কিনা, তাই প্রশ্ন করি। তা ছাড়া পশ্চিমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় বাঙালীরা হিন্দুস্থানিতে আলাপ করেন, আর পল্লীর বারোয়ারীতলায় যত গানের রেকর্ড বাজে তার বেশীর ভাগই বাংলা নয়। বাংলা দেশের খাস কলিকাতা শহরেই শিক্ষিত বাঙালী-মহলে বাংলা ভাষার কদর কম, কাজ-কারবারে কার্যকরী হিসাবে এই ভাষার প্রতি আমাদের দরদ কম। তবু হিন্দুস্থানির ব্যাপক প্রচলনে আমরা বিরোধিতা করি কেন? এ কি আমাদের শুধু একটা সৌখীন খেয়াল নয়?

যাক্, বসে বসে রাত তো কাটলো। প্রত্যূষে আড়ষ্ট দেহে নামলাম মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে। এবার ছ' জনের দল দু'ভাগ হয়ে গেল,—তিনজন যাবে দক্ষিণে, আর তিনজন উত্তরে। ভবেশ, সুধীন ও রবীন মহাবলীপুরম্ দেখে পণ্ডিচারী যাবে, ক্ষিতীনবাবু, প্রভাস ও আমি সোজা ফিরবো কলিকাতায়।

ওরা চলে গেল।

কলিকাতার ট্রেনের তখনও চার ঘণ্টা দেরী। স্টেশনেই স্নান সেরে আহার্যের ব্যাপারে আমরা তৎপর হয়ে উঠলাম।

সাড়ে দশটায় কলিকাতা-মেল ছাড়লো।

এবার দু'দিন দু'রাত বৈচিত্র্যহীন একটানা ট্রেনবাস,—দীর্ঘ পূর্ণচ্ছেদের দাঁড়ি। এই দাঁড়ির শেষে হাওড়া স্টেশন, কলিকাতা ও সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনধারা।

ট্রেন চলতে সুরু করলো। সবাই চুপচাপ। যা দেখে এলাম

তা সারা জীবনের সঞ্চয়। সেই স্নিগ্ধ স্মৃতি মনের মাঝে তোলাপাড়া হচ্ছে। কন্যাকুমারীর সমুদ্র-উপকূল, রামেশ্বরের বালিয়াড়ী-ঘেরা নারিকেলকুঞ্জ মনকে হাতছানি দিচ্ছে, চোখের সামনে ভেসে উঠছে সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে মহাবলীপুরমের মন্দির চত্বরে, গোমতেশ্বরের পাথরের মূর্তির স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার চোখের উপর এসে পড়ছে যেন। জনতার মাঝে দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততায় ফিরে যাবার আকর্ষণ নেই আর। তবু ফিরতে হবেই।

দু'দিন পরে কলিকাতায় ফিরলাম।

জানা-চেনা সবাই জিজ্ঞাসা করলো—কেমন দেখলে ?

জবাব দিতে পারি না, কি যে দেখে এলাম তা তো ঠিক মুখের কথায় বুঝিয়ে দেবার মত নয়, কথা দিয়ে তাকে তো প্রকাশ করা যায় না। দেখে এলাম, অসাধারণ নিষ্ঠা আর ঐকান্তিক ভক্তি তিলে-তিলে পাথরের গায় নির্মাল্য রচনা করে গেছে—যিনি যুগাতীত ও কালাতীত তাঁরই উদ্দেশ্যে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রতিভা ও ধর্মপ্রাণতা এসে মিলেছে এক জায়গায়। সংসারের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে উপেক্ষা করে মানুষ চিরন্তন সৌন্দর্যকে নিবেদন করে গেছে পরম-পুরুষের চরণে। মানুষের গড়া সেই শিল্প-নৈবেদ্যকে মহীয়ান্ করে তুলেছে তাল-নারিকেলকুঞ্জে ঘেরা পাহাড়ের কোলে দিগন্তবিস্তারী নীলাম্বুর বুকে উষা থেকে গোধুলি পর্যন্ত রঙের খেলা, ধূসর বালিয়াড়ীর বুকে দক্ষিণী বাতাসের উচ্ছ্বাস। সহরের জনারণ্যে সে সুর জাগে না, অনুভূতির পটে শুধু তার ছায়া ধরে রাখা যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, কোন এক সময় মনে হয়, রামেশ্বরের সাগরতটে বালিয়াড়ীর উপর দাঁড়িয়ে আছি, ঝড়ো হাওয়ার স্পর্শ পাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠি। কুমারিকার কলোচ্ছ্বাস কখন-কখন কানে এসে বাজে যেন! সন্ধ্যার নির্মেঘ আকাশের পানে তাকিয়ে মহাসাগরের রং খুঁজে পাই কোন-সময়। চম্‌কে উঠি, মনে হয় কি

যেন হারিয়ে গেছে, কি যেন ফেলে এসেছি দক্ষিণের সেই মন্দির পথে। যে আমি গিয়েছিলাম সে-আমি তো আর ফিরে আসে নি !—

"আজি কত কাল পরে
যাত্রা তব হল অবসান। হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ-লিখন,
আমারে আড়াল ক'রে আমারে করিবে অন্বেষণ ;
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে, সখা ! আমার প্রাঙ্গণদ্বারে
যে-পথ করিলে শুরু সে-পথের এখানেই শেষ।"

শেষ

এই লেখকের

আরেকখানি ভ্রমণকাহিনী

পশ্চিম দিগন্তে

কলিকাতা থেকে ওখাপোর্ট অবধি সমগ্র পশ্চিম ভারত ভ্রমণ-কথা ঃ সারনাথ, খাজুরাহো, জবলপুর, সাঁচী, বিদিশা, ভূপাল, পান্না, ঝাঁসী, ইলোরা, অজন্তা. ঔরঙ্গাবাদ, বোম্বাই, এলিফ্যান্টা, আমেদাবাদ, প্রভাস, জুনাগর, গিরনার, সোমনাথ, দ্বারকা, ভেট-দ্বারকা, দিলওয়ারা ও অচলগড় সম্পর্কে বহু তথ্যবহুল ভ্রমণ কাহিনী। বহুচিত্র শোভিত সুদৃশ্য বই।

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা মাত্র।

'যুগান্তর' সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

…"লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়েছেন নানা রেফ রন্স পুস্তকের সাহায্য যার জন্য তাঁর বর্ণনা নির্ভরশীল। তিনি নিছক গালগল্প রচনা করেননি; ইতিহাস এবং রসবোধ ও শিল্পবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন।… তিনি পশ্চিম দিগন্তের যে পরিচয় দিয়েছেন, আধুনিক ভ্রমণ-সাহিত্যের ইতিহাসে তা উল্লেখযোগ্য দান হিসাবে গৃহীত হবে।"…

'দেশ' লিখেছেন—"যারা ভারতভ্রমণে উৎসুক, এ বই তাঁদের নান ভাবে সাহায্য করবে। ভারত তীর্থের অন্তরাত্মা এই গ্রন্থে অপূর্বরূপে অভিব্যঞ্জিত হয়ে আছে।…বইটির ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিরাট একটি পরিসরের ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও আন্তরিক পরিচয় ফুটে উঠেছে।"…

'অমৃত' লিখেছেন—"একটি উল্লেখযোগ্য সুলিখিত ভ্রমণকাহিনী।… দ্রষ্টব্য স্থানগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব, কিংবদন্তী ও বিভিন্ন ঘটনা সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানমাহাত্ম্যগুলি এমন সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন গ্রন্থকার যে পাঠকের সমক্ষে প্রত্যক্ষদর্শনের আনন্দ বহন করে আনে।"…